বনে যদি ফুটলো কুসুম

প্রতিভা বসু

অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
প্রকাশন বিভাগ
কলিকাতা — ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৬৩

প্রকাশিকা : আরতি জানা

প্রচ্ছদ : বিজন কর্ম্মকার

বর্ণগ্রন্থন : পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স
২, চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন
কলিকাতা - ৭০০ ০১২

মুদ্রক : দেজ অফসেট
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

শ্রীঅশোক মিত্র
স্নেহাস্পদেষু

আমাদের প্রকাশিত লেখিকার অন্যান্য বই

মালতিদির উপাখ্যান

অতল জলের আহ্বান

মধ্যরাতের তারা

এক

পাড়ায় দারুকেশ্বরবাবুকে সবাই চেনে। অনেকদিন আছেন তিনি এ পাড়ায়। সেই যুদ্ধের আগে থেকে। এ পাড়া তখন এরকম ছিলো না, তখন এসব রাস্তায় আলো আসেনি, মাঠ ঘাট খানাখন্দ মন্দির মসজিদ বিলুপ্ত ক'রে পাকা রাস্তা গড়ে ওঠেনি, কাঁচা নর্দমা আণ্ডারড্রেণের তকমা আঁটেনি। তাঁর বাড়ির পাশে তখন মস্ত আম জাম কাঁঠালের বাগান ছিলো, উল্টোদিকে রাশি রাশি কাশফুল সাদা হ'য়ে থাকতো। সেই সময়ে একটা লাল রংয়ের গরু পুষেছিলেন তিনি, সেই গরু সেই সব বনে জঙ্গলে চরে বেড়াত ঘাস খাবার জন্য। সকাল বেলা দারুকেশ্বর কাজে যাবার আগে ভালো ভালো ঘাসজমি দেখে তাকে খুঁটি গেড়ে রেখে যেতেন; বিকেলবেলা গরুটা হাম্বা হাম্বা ডাক ছাড়লে তাঁর স্ত্রী এদিক ওদিক তাকিয়ে, মাথায় ঘোমটা টেনে নিজে এসে নিয়ে যেতেন। অনেক দুধ দিত গরুটা, সেই দুধ দারুকেশ্বর পাড়ার সব মিলিয়ে পাঁচ সাতখানা বাড়ির মধ্যেই বিক্রি করতেন। দুধে তিনি জল মেশাতেন না, তাই দামটা একটু বেশী নিতেন। দারুকেশ্বরবাবুর স্ত্রী গোবর দিয়ে ঘুঁটে দিতেন বাড়িসংলগ্ন গাব গাছের গায়ে। আশে পাশে বাজার ছিলো না তখন, শোনা যাচ্ছিলো লেক-মার্কেটের কাছে কোথায় একটা বসবে। সপ্তাহে একদিন কি দু'দিন দারুকেশ্বরবাবু ল্যান্সডাউন মার্কেটে গিয়ে তরি-তরকারী নিয়ে আসতেন তাইতেই চালিয়ে নিতে হ'তো সাতদিন। বেশী লাগলে, কি খরচ ক'রে ফেললে সেই অপচয় তিনি কখনো ক্ষমা করতেন না। গড়িয়া হাটার মোড়ের দু' পাশে বড়ো বড়ো মাঠ ছিলো, আর মজা ডোবার ভিড় ছিলো। সেই সব ডোবাতে কচুরিপানা আর কলমীলতার বন ছিলো। তীরে তীরে লকলকে সতেজ হিঞ্চেশাক জন্মাতো, কচুশাক জন্মাতো। ফেরিউলিরা তুলে নিয়ে বাড়ি বাড়ি বিক্রি করতো। সন্ধ্যা হ'লে লক্ষ লক্ষ মশা উড়ে আসতো সেখান থেকে, ছড়িয়ে পড়তো ঘরে ঘরে। মেয়েরা সাত তাড়াতাড়ি বেলা পড়তে না পড়তেই তাদের ভয়ে জানালা বন্ধ ক'রে ফেলতো। তবুও টিকতে পারতো না তাদের কামড়ে। ঝোপে ঝাড়ে জোনাকি জ্বলতো, বুনো ফুলের গন্ধ উঠতো, বর্ষাকালে জল জমতো রাস্তায়, ব্যাং ডাকতো কড়্ কড়্ ক'রে।

দারুকেশ্বরবাবুর ছোট্ট তিন কোঠার এক একতলা বাড়ির খোলা বারান্দা থেকে মাঠ পেরিয়ে সোজা লেক দেখা যেতো, সেই লেকের দিকে তাকিয়ে অনেক সময় চুপচাপ বসে থাকতেন তাঁর স্ত্রী, অন্যমনস্ক হ'য়ে যেতেন। ছেলেমেয়েরা হুটোপুটি করতো ঘরের মধ্যে, অসুস্থ শরীর নিয়ে সেই সময়ে তাঁর ধীরে ধীরে হেঁটে সেই টলটলে জলের তলায় গিয়ে শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করতো।

অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের রোগা ছোট্ট এইটুকু একটা মানুষ। কাটা কাটা নাক চোখ ঠোঁট, কিন্তু রং একেবারে অমাবস্যার অন্ধকারের মতো কালো। কিন্তু অত কালোর মধ্যেও মধুরতা ছিলো, লাবণ্য ছিলো। দারুকেশ্বরবাবুর চেহারা ছিলো একেবারে সম্পূর্ণ স্ত্রীর বিপরীত। তাঁর রং যেমন টকটকে ফর্সা মুখশ্রী তেমনি থ্যাবড়া। নাক ভোঁতা, চোখ ছোটো, ঠোঁট পুরু, গড়ন বেঁটে। কেশবিরল মাথাটি দেহের তুলনায় ছোট। শুধু এই আকৃতিগত বৈষম্যই নয়; দু'জনের চরিত্রেও কোনো মিল ছিলো না। দারুকেশ্বরবাবুর স্ত্রী যেমনি শান্ত দারুকেশ্বরবাবু তেমনি কোপনস্বভাব, স্ত্রী যেমনি মিষ্টভাষী তিনি তেমনি কটুবাক্যে পটু। দারুকেশ্বরবাবুর স্ত্রী লোকজন ভালোবাসতেন, কেউ এলে আতিথেয়তার ত্রুটি করতেন না, প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলতে চাইতেন। দারুকেশ্বরবাবুর আবার সে সবে ভীষণ অনীহা। কেউ এসে তাঁর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করবে, আর তিনি তাঁর শরীরের রক্ত-জল-করা অর্থ সামর্থ্য দিয়ে পাদ্যার্ঘ্য সাজাবেন এমন বাতুল কল্পনা মনেও ঠাঁই দিতেন না। সেই ভয়ে কারো সঙ্গে আলাপ সালাপই করতেন না তিনি। বলা যায় না, প্রশ্রয় পেয়ে কে কোথায় এসে হাজির হয়। আত্মীয় কুটুম্ব গ্রাম সুবাদে পরিচিত—এসব তো সভয়েই পরিহার করতেন, এমন কি প্রতিবেশীদের মধ্যেও যদি কেউ সহাস্যে তাকাতো কি কুশল প্রশ্ন করতো, তৎক্ষণাৎ রাগতভাবে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে তাকে স্পষ্ট বুঝতে দিতেন এসব গায়ে পড়া আলাপ তিনি পছন্দ করেন না।

প্রতিবেশী বলতে পাড়ায় কেই বা ছিলো তখন। সস্তায় জমি কিনে অনেক বুদ্ধিমানেরা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার পরিচয় দিয়েছিলো বটে, কিন্তু বাড়ি বানিয়েছিলো খুব কম লোক। বড় রাস্তা রাসবিহারী এভিনিউর দু'পাশেই প্রায় ফাঁকা জঙ্গল, ভিতরে ভিতরে তো আরো কম। একটা বাড়ি থেকে আর একটা বাড়ির মাঝখানে অনেকখানি জায়গা খালি পড়ে থাকতো, দূরে দূরে ছড়ানো ছিটোনো এ বাড়ির উঠোন থেকে সে বাড়ির ছাদ দেখা যেতো কি যেতো না। মোড়ের মাথায় বাঁধানো বটতলা ছিলো একটা। বটগাছটার সঙ্গে একটা পাকুড় গাছ জড়িয়ে উঠেছিলো। লোকেরা বলতো বট পাকুড়ে বিয়ে হ'য়েছে। আর বিয়েটা অমনিই হয়নি, নিশ্চয়ই কেউ দিয়েছে। আর দিয়েছে বলেই জায়গাটা এমন সুন্দর ক'রে বাঁধানো হ'য়েছে। কিন্তু কে দিয়েছে সে কথা জানতেও লোকেদের কৌতূহল হ'তো বৈ কি। সেই কৌতূহল নিবারণও হ'তো। একটু দূরেই গাঁয়ের মস্ত জমিদার জগদ্দল বাঁড়ুজ্যের পোড়োবাড়ি পড়ে আছে অতীতের সাক্ষী নিয়ে। সে বাড়ির ভেঙে পড়া ছাদের খিলানে খিলানে কবুতরের বাসা, নাটমঞ্চে গোখরো কেউটেদের পাকা আস্তানা, বাগানের জঙ্গলে দেউড়ির কাছে

রঘুডাকাতের কালীমন্দির। সেই মন্দিরে পূজো দিতো স্থানীয় লোকেরা, ভক্তি করতো, ভয় করতো, মানত করতো। গল্পও তারাই বানাতো। নতুন উপনিবেশের নতুন অধিবাসীদের কাছে সে সব বলে খুব বাহাদুরী নিতো। যার যেমন খুশি বানিয়ে বলবার বাধা ছিলো না কোনো। গল্প শুনতে কার না ভালো লাগে। আর তার মধ্যে যদি একটু সত্যের গন্ধ ভ'রে দেওয়া যায়, কে না রোমাঞ্চিত হয়।

কিন্তু দারুকেশ্বর হতেন না। এসব ভাবের বিকার থেকে তিনি মুক্ত, আলাদা, স্বতন্ত্র। তাই তিনি কখনো আর সকলের মতো বটতলার আসরে গিয়ে বসতেন না, দাঁড়াতেন না, তাকাতেন না, শুনতেন না। সকালে কাজে যেতেন মুখ বুজে কোনোদিকে না তাকিয়ে, বিকেলে ফিরতেন ঠিক সেই ভঙ্গিতে।

সেই কাঁকুলিয়া পাড়ার নির্জনে দুপুরের রোদ যখন থর থর ক'রে কাঁপতো, ফড়িং প্রজাপতি উড়ে উড়ে বেড়াতো, সকালের মিঠেগন্ধ ভাণ্ডিফুলগুলো নেতিয়ে যেতো আগুনের হল্‌কার মতো গরমে, সেই সময়ে একটি পুরুষও থাকতো না পাড়ায়। তখন খাওয়া দাওয়া কাজকর্ম সেরে ঘুমুতে না গিয়ে এ বাড়ির মেয়েরা ওবাড়ি বেড়াতে যেতো ওবাড়ির মেয়েরা সে বাড়ি। ছেলেমেয়েরা কেউ ঘুমুতো, কেউ মায়ের সঙ্গ ধরতো, কেউ কেউ মাকে এড়িয়ে লুকিয়ে পালিয়ে চলে যেতো মস্ত মাঠে ফড়িং ধরতে। আসলে বাড়ির গিন্নীদের একা একা ঘরে থাকতে ভয় করতো তখন, একসঙ্গে হ'য়েই চোখ বড়ো করে বলতো, 'বাব্বা, কী বিষম জায়গাতেই বাড়ি ভাই, এখন ডাকাত এসে কেটে-কুটে ঝোল বানিয়ে খেয়ে গেলেও রক্ষা করবার কেউ নেই।'

কথাটা মিথ্যে ছিলো না। বড় রাস্তা থেকে অনেকটা দক্ষিণের এই পাড়াটা তখন সত্যিই ভয়াবহ ছিলো। যারা নিজেরা বাড়ি করেছিলো তারাই বলতে গেলে প্রাণের দায়ে থাকতো সেখানে, ভাড়ার বাড়ি অতি অল্প। সে সব বাড়ি প্রায়ই খালি পড়ে থাকতো আর ভাড়া হ'লেও সস্তা হ'তো খুব। বলাই বাহুল্য সেই সস্তার জন্যই এসেছিলেন দারুকেশ্বর। নির্জনতার জন্য তাঁর মনে এতটুকুও শঙ্কা ছিলো না। শিশু সন্তানদের দিয়ে স্ত্রীকে একা রেখে যখন কাজে যেতেন, তখন তিনি চোর ডাকাতের কথা ভাবতেন না, ভাবতেন গায়ে-পড়া আলাপী প্রতিবেশীদের কথা। ভয় পেতেন তাঁর অবর্তমানে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে এসে যদি ভাব জমায়। সেই জন্য যাবার সময় তিনি বারে বারে সাবধান ক'রে দিতেন, যেন এক পা বাড়ি থেকে না বেরোয় তাঁর স্ত্রী, এবং ছেলেমেয়েদেরও বেরুতে না দেয়। তবুও সংশয় কাটতো না। কতদিন, হঠাৎ হঠাৎ এসে প'ড়ে দেখে যেতেন। ছেলেমেয়ে নিয়ে চুপ চাপ ঘরের মধ্যে স্ত্রীকে বসে শুয়ে থাকতে দেখে খুশি হ'তেন, নিশ্চিন্ত হ'তেন।

শুধু এই একটি বাড়ি, একটি পরিবারই এই রকম বিচ্ছিন্ন ছিলো পাড়ার মধ্যে। তা নইলে আর সকলের সঙ্গেই সকলের বন্ধুত্ব ছিলো, নিবিড়তা ছিলো, আত্মীয়তা-বোধ ছিলো। সকলেই সকলের বিপদে আপদে এসে বুক পেতে দাঁড়াতো, উচ্চারণ ক'রে না বললেও তার প্রতিশ্রুতি ছিলো।

অবিশ্যি পাড়া বেড়াবার মতো অবসরও ছিলো না দারুকেশ্বর বাবুর স্ত্রীর। বছর বছর সন্তান ধারণ এবং পালনেই তো তার আন্ধেক দম ফুরিয়ে গিয়েছিলো, তার উপরে সংসারের সমস্ত কাজ। তারও উপরে গরুর পরিচর্যা। বাড়ির পাশে অন্যের জমিতে বাখারির বেড়া ঘিরিয়ে ছোট্ট একটু সবজির খেতও করেছিলেন দারুকেশ্বর। দু' বেলা তাতে জল টেনে টেনে দেওয়ার পরিশ্রমও দারুকেশ্বরের স্ত্রীর কাছে কম কষ্টকর মনে হ'তো না। বুকের ওঠাপড়া তার এতোখানি বেড়ে যেতো।

তা আর কী হবে! ঘর-সংসার করতে গেলে খাটতে হয় একটু। এত অল্পেই যদি ক্লান্ত হবে, ভেঙে পড়বে তা হ'লে তার জীবনের অর্থ কী! রোজগারের জন্য দারুকেশ্বরই কি সোজা খাটছেন? টালিগঞ্জ, বালিগঞ্জ, ভবানীপুর করতে করতে তো দড়ি ছিঁড়ে ফেলছেন পায়ের, এক ফোঁটা লাভের ইঙ্গিত পেলে আর কোথায় কোথায় যে চলে যান হিসেব থাকে না কোনো। যেন একটা চরকি। রোদ, বৃষ্টি, শীত, গ্রীষ্ম কিছুই কি ভ্রুক্ষেপ করতে পারছেন এই কর্মের প্রহারে? সেটা কি দেখছে না তাঁর স্ত্রী!

সংসারে উপার্জনের জন্যও যেমন খাটতে হয় তাঁকে, সেই উপার্জন রক্ষা করার জন্যও তার চেয়ে কম খাটেন না। এক চক্ষুতে তিনি দশ চক্ষু ক'রে রেখেছেন। কোথায় এক ফোঁটা বেশী গলে যাচ্ছে আঙুলের ফাঁক বেয়ে, অমনি চেপে ধরেছেন তার টুঁটি, পরিশ্রমের অর্থ কি বিকিয়ে দেবার জন্য। আর পাঁচটা বাড়ির মতো বৌকে টাটে বসিয়ে কাজের জন্য ঝি রেখে দেবেন তেমন পুরুষত্বহীন পুরুষ তিনি নন। স্ত্রীলোকেরা তবে করবে কী? রান্না করা, বাসনমাজা, কাপড়কাচা, ছেলেপুলে মানুষ করা, গরুর সেবা এগুলো তো তাদের অবশ্য কর্তব্য। পারি না বললে শুনবেন কেন?

এই তো দুধ বিক্রি ক'রে সুন্দর লাভ হচ্ছে। একটা লোক রেখে দিলে থাকবে কী? আর অনর্থক আর একটা লোকের জন্য খরচই বা কেন করবেন? পয়সা কি সস্তা? পয়সা কি তার জন্য গঙ্গার জলে ভেসে এসেছে? না কি গাছের ফল, যে ঝাঁকি দিলেই পড়বে?

এ স্বভাব দারুকেশ্বরের পৈতৃক। আশৈশব তিনি এই রকম অমিশুক, অপ্রসন্ন, অনুদার, আত্মীয়বিমুখ এবং বদ্ধতায় শিথিল। তাঁর বাবা কেদারেশ্বর ঠিক এইরকম ছিলেন। তিনিও তাঁর কোনো আত্মীয় কুটুম্বের সঙ্গে সদ্ভাব রাখতেন না, কারো সঙ্গে মেলামেশা করতেন না, কারোকে ভালোবাসতেন না। তাই নিয়ে অনবরত ঝগড়া হ'তো স্ত্রীর সঙ্গে, অনবরত অশান্তি চলতো।

প্রকৃতপক্ষে এই পরিবারে এই অশান্তি শুধু এক পুরুষের নয়, কতদিন ধ'রে এই চলে এসেছে। কেদারেশ্বরের বাবা যজ্ঞেশ্বরও ঠিক এইরকম ছিলেন। হয়তো বা তাঁর বাবাও। বিশুদ্ধ রক্তের মধ্যে কবে যে কোন মাতা অথবা পিতা এই এক ফোঁটা বিষ ঢেলে গেছেন কে জানে। সে বিষ আর শোধন হচ্ছে না। পরিবারের প্রত্যেকটি পুরুষের এই চরিত্র। এই

চরিত্র নিয়েই জন্মায় তারা। বিভিন্ন বংশের মায়েরা এসেও এই রক্তকে পরিস্রুত করতে পারে না।

দারুকেশ্বর কেদারেশ্বরের একমাত্র ছেলে। কিন্তু মেয়ে আছে দু'টি। পরপর দুটি মেয়েকে প্রসব করবার অপরাধে মেয়েদের মাকে কেদারেশ্বর রীতিমতো নির্যাতন করতেন। একদিন না একদিন তারা পরের ঘরে চলে যাবেই আর পরের ঘরে গিয়ে আলাদা স্বার্থে আলাদা পরিবারে নিশ্চয়ই তারাও পর হ'য়ে যাবে, সুতরাং সেই পরেদের দঙ্গল বেঁধে সংসারে আনবার কী প্রয়োজন ছিলো এই কৈফিয়ৎটা স্ত্রীর কাছে অনেকবার তলব করেছেন কেদারেশ্বর। আর তারপর পরম পণ্ডিতের মতো দার্শনিক দৃষ্টিতে মেয়েদের দিকে তাকিয়েছেন তিনি, তাকিয়ে তাকিয়ে হা হুতাশ করেছেন। খারাপ ব্যবহার করেছেন তাদের সঙ্গে, পিতা হ'য়েও পিতার এতটুকু স্নেহ অনুভব করেন নি হৃদয়ের মধ্যে।

এই পরিবারের এটাও একটা রীতি, ছেলের চেয়ে মেয়ের সংখ্যা বেশী হয়। কেদারেশ্বর নিজেও তাঁর বাবার একমাত্র পুত্র ছিলেন, কিন্তু বোন সাতটি। তবু রক্ষে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে তাঁরও সাতটি হয় নি। সেটুকুই ভাগ্যের জোর।

অর্থ বিত্ত নিতান্ত মন্দ ছিলো না কেদরেশ্বরের। জমি জমা তো ছিলোই, তার উপরে একটি মস্ত পুকুর ছিলো, সেই পুকুরভরা মাছ ছিলো। সেখান থেকে একটি মাছও তিনি নিজে খেয়ে বা পরকে বিলিয়ে অপচয় করেন নি, সব বিক্রি করেছেন নিকিরীদের কাছে। নিজেরা নিতান্ত গরীবের মতো থেকেছেন। অথচ পরিবার ছোট, তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে যথেষ্ট সচ্ছল ভাবে থাকাই স্বাভাবিক ছিলো। লোকেরা বলেছে কেদারেশ্বর মাটির তলায় ঘড়া ঘড়া টাকা পুঁতে রেখেছে, মরে যখ দেবে সেই জমানো টাকার উপরে।

অনেক দিন পর্যন্ত দারুকেশ্বর কেদারেশ্বরের একমাত্র সন্তান হয়েই বিরাজ করছিলেন সংসারে। কেদারেশ্বর ভেবেছিলেন আর বুঝি কোনো মুখ এসে গ্রাসাচ্ছাদনের ভাগ বসাবে না, ভেবে উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন। ছেলের সাত বছর পরে আবার তাঁর স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা হ'লেন। তারপর তাঁর আশার মুখে ছাই দিয়ে ছ' বছরে পর পর দুই দুই কন্যা প্রসব ক'রে ক্ষান্ত দিলেন। কপাল চাপড়ালেন কেদারেশ্বর।

প্রথম মেয়েটির বয়স যখন এগারো হ'লো, আঠারোয় পা দেওয়া, এক মুখ দাড়িগোঁফ গজানো, একবুক লোমজমানো, দারুকেশ্বর মোটা গলায় বললেন, 'বড়ো খুকির সম্বন্ধ দ্যাখো বাবা।'

একটু অবাক হ'য়ে কেদারেশ্বর বললেন, 'বড় খুকির! এখুনি।'

দারুকেশ্বর বললেন, 'এগারো বছর কি কম? আমার পিসিদের তো সব ঐ বয়সেই বিয়ে হ'য়েছে।'

'কিন্তু—

'কিন্তু কিন্তু কোরো না। ও সব যত তাড়াতাড়ি পারো বিদায় দাও। সেই তো দিতেই হবে, তবু এখন দিলে কয়েক বছরের খাওয়া-পরার খরচটা বেঁচে যাবে।'

তাই তো! কেদারেশ্বর তো এতোদূর পর্যন্ত ভেবে দেখেন নি! ছেলের বুদ্ধি দেখে থ' হ'য়ে গেলেন। কথাটা তো দারুকেশ্বর খুব যুক্তিসঙ্গত বলেছে। এগারো বছরের মেয়েকে তেরো বছর বয়স অব্দি টানা মানেই আরো দু'বছর খরচ বাড়ানো। দু' বছরে বারো দুগুণে চব্বিশ মাসের খরচ! ওরে বাবা! সে কি কম!

'ঠিক। ঠিক বলেছিস।' ছেলের পিঠ চাপড়ে দিলেন তিনি। বিচলিত না হ'য়ে দারুকেশ্বর বললেন, 'ছোটো খুকির বিয়েও ঐ সঙ্গেই দিয়ে দাও।'

'ছোট খুকি!'

'তারও তো নয় পুরলো। কম কী? এক সঙ্গে হ'লে অনেক কম খরচায় হবে। বলবো না বলবো না ক'রেও দু'চার ঘর আত্মীয়কে তো নিমন্ত্রণ করতেই হবে, এক গোষ্ঠি বোন আছে তোমার, নিন্দার ভয়ে তাঁদেরও তো চিঠি পাঠাতে হবে। আর বলা যায় না, অমনিই হয়তো গন্ধে গন্ধে হাজির হবেন এসে। সে আর দু' দু'বার কেন একবারেই ল্যাঠা চুকুক।'

সব শুনে মা বললেন, 'তা হ'লে আঁতুড়ে থাকতেই গলা টিপে মেরে ফেললি না কেন? সব আপদ একেবারেই চুকে যেতো।'

মায়ের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দারুকেশ্বর বললেন, 'বিয়ে দেওয়া আর গলা টেপা বুঝি এক?'

কেদারেশ্বর বললেন, 'তোমার মা'র কথা যেতে দাও দারুক, তার তো আর রোজগার করতে হয় না। দিব্যি পরের পয়সায় খায় আর আঠেরো মাসে বছর যায়। যত্তো সব—'

মোটকথা ছেলের এই দ্বিতীয় প্রস্তাবটিও চমৎকার মনে ধরলো কেদারেশ্বরের। মনে মনে খুব গৌরববোধ করলেন তিনি ছেলেকে নিয়ে। তিনি মরে গেলে যে তাঁর টাকাকড়ি পাঁচ ভূতে লুটে খাবে না এ কথা ভেবে নিরুদ্বেগ হ'লেন।

স্ত্রীকে তিনি একটুও বিশ্বাস করেন না। স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। মেয়েমানুষের যুক্তি শুনতে গেলেই হ'য়েছে আর কি। তবু দারুকেশ্বরের মা'র সব কথাতেই নাক গলানো স্বভাব। সব কথাতেই আপত্তি করা স্বভাব। কোথায় এসব বুদ্ধি নিজে দেবে তা তো নয়ই, উপরন্তু ঐ একফোঁটা ছেলের উপরে চোপা। যা হোক, তবু তো ঐ ছেলেরই গর্ভধারিণী সে, সুতরাং তাকে তিনি ক্ষমা করলেন সেদিন। কোথায় একটু করুণাও বোধ করলেন।

আর তারপরে চললো সম্বন্ধ দেখার পালা। ঘটক তো বাঁধাই আছে। খবর পেয়েই সে ছুটে এলো, এক মাসের তিরিশ দিনে তিরিশটা পাত্রের খোঁজ দিল সে। পাত্রদের গুণবিচারের পালা নেই এখানে, বিচার্য বিষয় হচ্ছে টাকা। যে ছেলে যত কমে পাওয়া যাবে সে ছেলেই তত যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

গরু খোঁজা ক'রে শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল তাদের। দিন ক্ষণ দেখে দুই বয়স্ক অজ্ঞাতকুলশীলকে ধ'রে এনে একযোগে বিয়ে দেওয়া হ'লো দুই মেয়ের, দুই মেয়েই গলা ফাটিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল তাদের সঙ্গে। বাড়ি খালি হ'লো, হাল্‌কা হ'লো, খরচ কমলো।

দারুকেশ্বরের মা অবোধের মতো কেঁদেছিলেন তাই নিয়ে, কচি মেয়ে দু'টোকে বুক থেকে ছিঁড়ে দিতে মরে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু স্ত্রীলোকের চোখের জলে গলে যাবেন, এমন পাত্র পিতা-পুত্র কেউ-ই নন। অত দুর্বল হৃদয় নিয়ে তাঁরা সংসারে আসেন নি। সুতরাং কেঁদে কেঁদে নিজেই একদিন শান্ত হ'লেন তিনি।

দারুকেশ্বর গ্রামের স্কুলে তখন উঁচু ক্লাশের ছাত্র। ক্লাশ থেকে ক্লাশে সে উঠতে অনেকবার গড়িয়ে শেষ পর্যন্ত এণ্ট্রান্স পরীক্ষার প্রায় সম্মুখীন হয়েছেন, কেদারেশ্বর বললেন, 'থাক, আর তোর পড়ে কাজ নেই, যা হ'য়েছে ঐ যথেষ্ট। হিসাব নিকাশে মাথা আছে, বাজারের কালাচাঁদ বণিকের কাপড়ের দোকানে বসে যা। আমি কথা বলে এসেছি।'

পিতার এই প্রস্তাবে দারুকেশ্বর খুশিই হ'লেন। লেখাপড়া তাঁর ভালো লাগছিলো না। পিতার মতো তাঁরও অনর্থক মনে হচ্ছিলো ব্যাপারটা। কুড়ি টাকা মাইনেতে ঢুকে গেলেন কাজে। আর ঢুকেই মন লেগে গেল, আঁটি ঘাঁট সব বুঝে ফেললেন। কয়েক মাসের মধ্যেই মাইনে বাড়িয়ে নিলেন দু'টাকা। শুধু তাই নয়, হাত সাফাই ক'রে দু'চার জোড়া ধুতি শাড়ি লংক্লথও আনতে পারলেন ঘরে। আরো কিছুদিন পরে, কোথায় কোন হাটে গেলে কোন জিনিস সস্তায় এনে দামে ছাড়তে পারবেন তার একটা পরিষ্কার হিসাব ঠিক ক'রে নিজের পয়সায় কিনে এনে অবসর সময়ে বাড়ি বাড়ি বিক্রি করতে লাগলেন সে সব। বেশ দু'পয়সা আয় হ'তে লাগলো তাতে। এমন কি পিতাকে ফাঁকি দিয়ে কিছু সঞ্চয় করতেও বেশী কষ্ট হ'লো না। কী বুঝতে পেরে মা বললেন, 'লেখাপড়া না হয় ছাড়লিই, তাই বলে ফাঁকির কারবার করিস না। সৎপথে থাকিস।' ভুরু কুঁচকে দারুকেশ্বর বললেন, 'থামো, যা বোঝো না তা নিয়ে গ্যাজ গ্যাজ কোরো না।'

এর পরে বিবাহ। মেয়েদের বিদায় দিয়ে শূন্য বাড়িতে মন টি'কছিলো না দারুকেশ্বরের মায়ের। প্রস্তাবটা তিনিই করেছিলেন প্রথমে। প্রথমে কেদারেশ্বর আপত্তিও করেছিলেন যথারীতি। কেননা স্ত্রী কিছু বললেই তিনি মনে করেন এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো অপব্যয় লুকিয়ে আছে। আর থাকেও তাই। বছরের মধ্যে কতবার যে তিনি মেয়েদের আনতে বলেন, তার ঠিক নেই। কোনো উপলক্ষ্য হ'লেই জামাইদের কাপড় পাঠাতে বলেন। কোনো আত্মীয় আসবে শুনলে নেচে ওঠেন, এত দুর্মূল্যের বাজারেও তিনি রোজ মাছ আনবার পরামর্শ দেন। নিজেদের রান্নাঘরের পিছনের ছাইয়ের গাদায় যে কতো কুমড়া আর চালকুমড়া ধরেছে, তার ঠিক নেই, তবু রোজ বাজারে পাঠিয়ে আলুটা বেগুনটা না আনলে তাঁর মন ওঠে না। সুতরাং ছেলের বিয়ে দিয়ে মানুষ বাড়িয়ে খরচ বাড়াতে যে তাঁর খুব সুখ এতো জানা কথাই। তাই অনেকদিন পর্যন্ত কর্ণপাত করেন নি। কিন্তু তারপরে নিজেই বিবেচনা করতে লাগলেন কথাটা। কিছু টাকা কড়ি দরকার। বেশ কিছু নগদ টাকা। উদ্দেশ্য কালাচাঁদ বণিকের প্রতিযোগী হ'য়ে আর একখানা বড় দোকান খোলা। দিনকাল বদলে যাচ্ছে, লোকেদের সাধ-আহ্লাদ বেড়ে গেছে অনেক, সখ বেড়েছে। সখের ঠেলায় ঘরের পয়সা পরের পেটে দিয়ে বোকাগুলো অপ্রয়োজনে কেবলি কিনছে, আনছে, ছিঁড়ছে

আর ভাঙছে। আর তার সব মজা গ্রামের ঐ একটা লোক লুটছে, গ্রামের ঐ একখানা দোকান বলে।

বাবুগিরির সবচেয়ে খারাপ দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ চৌধুরীবাড়ি। যেমনি মেয়েরা তেমনি পুরুষেরা। দু'টো ছেলেকে আবার বুড়ো চৌধুরী কলকাতার কলেজে পড়তে পাঠিয়েছেন। কেদারেশ্বর স্বচক্ষে দেখেছেন তারা চিনেমাটির বাসনে ভাত খায়, কাচের গ্লাসে জল খায়, খুটখুট ক'রে ইংরিজি বুলি ছাড়ে। অসভ্য। ম্লেচ্ছ। খরচে! ভাগ্যিস তার ছেলেটা সে রকম না।

ছেলেটা নাই বা হ'লো, তাঁর গর্ভধারিণীটির তাই পছন্দ। মেয়েমানুষের বুদ্ধিই আলাদা। তিনি নিতান্ত কড়া মানুষ বলে, নইলে লোকের সংসার বারো ভূতে খায়, তাঁর সংসার তাঁর একটা স্ত্রীতেই চেটেপুটে খেয়ে নিতে পারতো।

তবু শেষ পর্যন্ত বেশ ভালো ক'রে ভাবলেন কথাটা। তারপর ঘটক লাগালেন। সেই সঙ্গে বাজারের সবচেয়ে ভালো জায়গায় একটি দোকানঘরও খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। টাকাটা হাতে পেলেই যাতে শুভদিন দেখে আরম্ভ ক'রে দিতে পারেন ব্যবসাটা।

সব শুনে দারুকেশ্বরের মা বললেন, 'তুমি কেবল টাকাটার কথাই ভাবছো। একটা ছেলে, তার বৌ সুন্দরী না হ'লে আমি আনবো না।'

'কী!' লাল চক্ষু ক'রে কটমটিয়ে স্ত্রীর দিকে এমন ক'রে তাকালেন কেদারেশ্বর যে তারপর আর কথা বেশী এগোলো না। এগিয়ে এলো বিয়ের দিন। ভাগ্যক্রমে হঠাৎ সবদিকে মনোমতো পাত্রী পাওয়া গেল একটি। দোষের মধ্যে রংটা ভীষণ কালো। কেদারেশ্বর দেখে এসে একটু বিমনা হ'লেন। অত কালো বৌ আনতে একটু তাঁর দ্বিধা হলো। নিজের জন্য নয়, ভাবলেন ছেলের কথা। ছেলে বড় হ'য়েছে, যোগ্য হ'য়েছে, বলা যায় না শেষে রুষ্ট না হয়। নিজের অল্পবয়সের কথা মনে পড়লো তাঁর। বৌ ভাবতেই একটি আলতা-পরা ঘোমটা-টানা টুক্‌টুকে মেয়েকে ভাবতেন তিনি। তা টুক্‌টুকে বৌ-ই এনে দিয়েছিলেন তাঁর মা তাঁকে। সাত গ্রাম তোলপাড় ক'রে কাঁচা সোনার মতো রংয়ের বৌ এনেছিলেন তিনি। ধুম ধাড়াক্কা করেছিলেন খুব। তা আর করবেন না কেন, মেয়েমানুষ মাত্রই উড়ণচণ্ডী। স্বামী দু'চোখ বুজলো তো খুঁটি ছাড়া গরু। সব মুড়ে খেয়ে তবে নিশ্চিন্ত। পৈতৃক বিত্তের মধ্যে শেষ পর্যন্ত এই জীর্ণ বাড়িটি, মজা পুকুরটি আর সোনার বরণ স্ত্রীটি—এই তো জুটেছিলো কপালে।

সুন্দরী বৌয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রথম প্রথম অবিশ্যি ভালোই লেগেছিলো। এতকাল পরেও মনে মনে সেটা স্বীকার না ক'রে পারলেন না কেদারেশ্বর। কিন্তু তার মেয়াদ ক'দিন। দু'দিনেই পুরোনো কাঁথা। ব্যবহারে কোনো জিনিসের আর দাম থাকে না। এ তো স্ত্রী-ই, চাইলেই যাকে পাওয়া যায়। তিন ছেলের মা হ'য়ে আর কী বা অবশিষ্ট রইলো। আর কী বা লাভ হ'লো ফর্সা বৌ জুটিয়ে। মেয়ে দু'টো বংশের মতো কালো, ছেলেটা ফর্সা। ছেলের আবার ফর্সা আর কালো। না, হিসেব ক'রে দেখলে এই সুন্দরী

বৌ দিয়ে বিশেষ কিছুই লাভ হয়নি তাঁর। খাটতে পিটতেও যে মানুষটা খুব ওস্তাদ তা-ও নয়! কেবল বায়নায় রাজা।

ভেবে ভেবে একদিন ছেলেকেই ডেকে জিজ্ঞেস করলেন কালো মেয়ে বলে দারুকেশ্বরের কোনো আপত্তি আছে কি না। দারুকেশ্বর অনেকক্ষণ লজ্জায় অধোবদন থেকে মৃদুস্বরে বললেন, 'দেবে থোবে কী রকম?'

খুশি হয়ে গোঁফের ফাঁকে হাসলেন কেদারেশ্বর। এরই নাম বাপ্‌কা ব্যাটা। ভরা গলায় বললেন, 'কালো রং ঢেকে দিতে যতো লাগে!'

দারুকেশ্বর তখুনি নত দৃষ্টিতে সম্মতি জানালেন। মনে মনে বললেন রাত্রিবেলা নিয়ে শুতে সব মেয়েই এক রকম, সে কালাই হোক আর ধলাই হোক। সারাদিন কাজকর্ম ছেড়ে কোন্ পুরুষ বৌয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে পড়ে থাকে। কাজই আসল, আর কাজের বিনিময়ে টাকা। কালাচাঁদ বণিকের কাপড়ের দোকানের পাশে তাঁর দোকান যদি একদিন ঝল্‌মলিয়ে ওঠে, সেটাই হবে সবচেয়ে বড় সার্থকতা। সেটাই এখন দারুকেশ্বরের একমাত্র স্বপ্ন। বৌ যেমন চেহারারই হোক, সেই স্বপ্ন সার্থক করার মতো সম্পদ যদি নিয়ে আসতে পারে তা হ'লেই হয়।

কেদারেশ্বর নিশ্চিন্ত মনে সব ঠিক ক'রে ফেললেন আর কেদারেশ্বরের স্ত্রী অন্য আরও অনেকবারের মতো আরও একবার মন খারাপ ক'রে চোখের জল মুছলেন।

শেষ পর্যন্ত বৌ দেখে কিন্তু খুব হতাশ হ'লেন না দারুকেশ্বরের মা। রং যতোই কালো হোক, মেয়েটির মুখে বেশ লালিত্য আছে, চেহারাটা ছিপছিপে। দারুকেশ্বরের মতো বেঢপ চেহারার ছেলের এইরকম ছিপছিপে বৌ-ই দরকার ছিলো। এর উপরে বৌ-ও যদি মোটা হ'তো তা হ'লে ছেলেপুলে সব তেলের পিঁপে হ'তো। দারুকেশ্বরের বয়স মাত্র তেইশ। এরই মধ্যে দাড়িতে গোঁফেতে আর বুকের লোমে মনে হয় যেন ছেচল্লিশ বছরের ভদ্রলোক। কেবল রংয়েরই জৌলুষ।

মোট কথা, বৌ খুব পছন্দ হ'লো দারুকেশ্বরের মায়ের। শান্তশিষ্ট ভদ্র মেয়ে। মনটা সরল উদার। দু'দিনেই তিনি তাকে মেয়ের মতো বুকে টেনে নিলেন। এতদিনে তাঁর শূন্য শুষ্ক সংসারটাতে একজন মনের মতো মানুষ পেয়ে, বন্ধু পেয়ে কথঞ্চিৎ শান্তি পেলেন তিনি। শাশুড়ির মতো বৌ-ও তাঁকে মা বলে মেনে নিতে দেরি করলো না। স্বামীকে আর শ্বশুরকেও ঠিক বুঝতে পেরে গেল। বুঝতে পারলো সংসারটা স্ত্রীলোকের অধীন নয়, একান্তভাবেই পুরুষশাসিত। এ সংসারে তাঁর শাশুড়ি দাসী ছাড়া কিছু নয়, আর সে-ও তাই। সুতরাং সমদুঃখী দু'টি স্ত্রীলোক সহজেই দু'জনের কাছে দু'জনে প্রিয় থেকে প্রিয়তর হয়ে উঠলো।

এদিকে শাশুড়ি বৌয়ে যত ঘনিষ্ঠতা বাড়লো, দোকান ক'রে বাপে ছেলেতে ততোই বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়তে লাগলো। টাকাকড়ি নিয়ে ঘন ঘন তাঁদের খিটিমিটি বাধতে লাগলো। টাকার প্রতি আসক্তি দু'জনেরই যেখানে সমান, লুব্ধতায় দু'জনেই যেখানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আছেন সব সময়ে, সেখানে এই সংঘর্ষ অনিবার্য। তার উপরে বিয়ে ক'রে থেকেই দারুকেশ্বরের একটা আলাদা আলাদা ভাব আরম্ভ হ'য়ে গেছে। কোনোদিনই তিনি কারোকে একাত্ম ভাবেন নি তবু যতদিন বিয়ে করেন নি, স্বার্থটা অন্তত এক ছিলো। বিয়ের পরে বাহ্যত না হ'লেও মনের ভিতরে তাঁর দুটো সংসার আলাদা হ'য়ে গেল।

দারুকেশ্বরের সংসার শুধু তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে, কিন্তু কেদারেশ্বরের সংসারে তাঁর স্ত্রী ব্যতীত দু'ঘর কুটুম্বও আছে। স্বামীর হাজারো নিষেধ শাসন অবহেলা ক'রে তাঁর স্ত্রী, অর্থাৎ দারুকেশ্বরের মা বছরে অন্তত দু'বার কেঁদেকেটে মেয়েদের আনাবেনই আনাবেন। পুজোয় ষষ্ঠীতে কাপড় দেবেন, নাতি-নাতনির জন্য লাড়ু মোয়া আচার আমসত্ত্ব বানিয়ে জলের মতো পয়সা নষ্ট করবেন। এগুলোর ভাগ দিতে যাবেন কেন দারুকেশ্বর? ওরা কি তাঁর মেয়ে? তাঁর নাতি-নাতনি? এটাই দারুকেশ্বরের আসল আপত্তি।

ধোঁয়াতে ধোঁয়াতে শেষে আগুন লাগলো একদিন। একদিন প্রায় লাঠালাঠি ক'রে বাপ ব্যাটা আলাদা হ'য়ে গেল। হিসাবে একটা মস্ত গোলমাল করেছিলেন দারুকেশ্বর। কেদারেশ্বর কেন সেটা সহ্য করবেন। দাঁত কিড়মিড় করলেন তিনি, যা তা বলে গাল দিলেন ছেলেকে, এরকম করলে দোকান থেকে তাড়িয়ে দেবেন বলেও শাসালেন।

চোখ পাকিয়ে ঘাড় তেরচা ক'রে দারুকেশ্বরও জবাব দিতে ছাড়লেন না। দোকান খুলবার মূলধনটা যে কেদারেশ্বরের নয়, দারুকেশ্বরেরই বিবাহের যৌতুক, এ কথাটা অনেকবার মনে করিয়ে দিলেন।

কেদারেশ্বর বললেন, 'কক্ষনো না।'

দারুকেশ্বর বললেন, 'নিশ্চয়ই।'

কেদারেশ্বর বললেন, 'মিথ্যাবাদী।'

দারুকেশ্বর বললেন, 'চোর।'

কথার পৃষ্ঠে কথা। বলতে বলতে আর মুখের লাগাম রইলো না কারো। সংযমেরও প্রশ্ন উঠলো না কোনো। এর পরে কেদারেশ্বর ঘাড় ধ'রে বাড়ি থেকে বার ক'রে দিলেন ছেলেকে। দারুকেশ্বরের মা বৌকে বুকে জড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। সাত মাসের পোয়াতি বৌ ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। দারুকেশ্বর এক হ্যাঁচকা টানে তাকে ছিনিয়ে নিলেন মায়ের কাছ থেকে, এক জ্ঞাতি কাকার বাড়িতে গিয়ে উঠলেন সেই রাত্রির জন্য। পরের দিন সকালে কেদারেশ্বর দোকান খুলতে গেলে, বাড়িতে এসে নিজের জিনিসপত্র সব বুঝেসুঝে নিয়ে চলে গেল। মা কিছু বললেন না, দেখলেন না, রান্নাঘরে বসে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগলেন অঝোরে।

সেই দিনই দুপুরে বৌ নিয়ে দারুকেশ্বর গ্রাম-ছেড়ে চলে গেলেন কোথায়। আর তার

কয়েকদিনের মধ্যেই কেদারেশ্বর মাথায় হাত দিয়ে বসে, দুই চোখে অন্ধকার দেখলেন। দেখা গেল তাঁর অতি গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখা টাকার থলেটি নেই।

আসলে দারুকেশ্বরের মা দুঃখে-কষ্টে অভিভূত হ'য়ে যতক্ষণ কাঁদছিলেন রান্নাঘরে বসে, ততক্ষণে দারুকেশ্বর ভালোভাবেই গুছিয়ে নিয়েছেন সব। শুধু যে বাবার টাকার থলিটি নিয়েই তিনি অন্তর্হিত হয়েছেন তা নয়, মায়ের যৎসামান্য সোনাদানাটুকুও ছেড়ে যাননি। নিজের স্ত্রীর তো নিয়েইছেন। কেদারেশ্বর উথাল-পাতাল করতে লাগলেন। টাকার শোকে পাগলের মতো হ'য়ে খাওয়া-দাওয়া ছাড়লেন, একটা রাম-দা নিয়ে হা রে রে রে বলে টহল দিতে লাগলেন বাড়ির চারদিক। আর তাঁর স্ত্রী শুকনো ফুলের মতো নেতিয়ে পড়লেন বিছানায়।

পাড়ার লোকেরা, জ্ঞাতি-গুষ্ঠিরা, কাছে এসে সহানুভূতির ছুতোয় দুঃখের আগুনে ইন্ধন জোগাতে লাগলো, আড়ালে খুশি হ'য়ে বলতে লাগলো, 'বেশ হ'য়েছে, খুব হ'য়েছে।'

সবচেয়ে বেশী খুশি হ'লো কালাচাঁদ বণিক, বারোয়ারী কালীতলা গিয়ে সে পাঁচ সিকের পূজো দিয়ে এলো।

আর দোকান করবে কে? দোকানে আছে কী? থাকলেও দেখবার মতো অবস্থা কোথায় আধ-পাগলা কেদারেশ্বরের? সারাগ্রাম ঘুরে ঘুরে এর ওর কাছে তিনি ছেলের কুৎসা গাইতেই ব্যস্ত হ'য়ে রইলেন আর চোখ পাকিয়ে ঘুষি বাগিয়ে অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে লাগলেন প্রাণপণে। তারপর সারাদিন পরিশ্রমের পর ক্লান্ত হ'য়ে বাড়ি ফিরে এসে দেয়ালের শূন্য ফোঁকরে মাথা খুঁড়ে কাঁদতে লাগলেন টাকার থলিটির জন্য।

এই গুপ্ত ফোঁকরটি তাঁর বুদ্ধিতে নিজের তৈরী ছিলো। দেখতে কুলুঙ্গির মতো, সামনের দিকে তেল সিঁদুরে চিটচিটে ক'রে লক্ষ্মীর পট বসানো, পিছনে মাটির রং-এ কাঠ দিয়ে অদ্ভুতভাবে মিশিয়ে ভিতরে ফাঁপা রেখে এক ছোট্ট খুপরি। কেদারেশ্বরের স্ত্রীও জানতেন না এই কুলুঙ্গিটির রহস্য। দারুকেশ্বর যে কী ক'রে জানলেন কে জানে। দারুকেশ্বরের জন্মের আগে থেকে এইখানে তিনি টাকা লুকিয়ে রাখেন। তা ছাড়া কোথায় রাখবেন? যেখানেই রাখুন স্ত্রী তো জানবেনই? বলা কি যায়, একদিন বা' ভাঙতে কতক্ষণ। মেয়ে মানুষকে বিশ্বাস নেই।

লোকেরা বলতো কেদারেশ্বরের টাকা মাটিতে পোঁতা আছে। কোনখানে পোঁতা আছে কে জানে, যদি খুঁজতে হয় খোঁজো। ভাঙো সারা বাড়ি। তিনি নিজে ছাড়া আর কেউ বার করতে পারবে না। মরবার আগে প্রাণেধরে নিশ্চয়ই বলে যাবেন না কাউকে, ছেলেকেও নয়, ঐ টাকা ঐ মাটির তলাতেই চাপা পড়ে থাকবে।

কিন্তু কুলুঙ্গির কল্পনা কারো মনে আসেনি। তিনি নিজে থাকেন সে-ঘরে প্রহরী হয়ে।

সেটা তাঁর শোবার ঘর। দারুকেশ্বর কী ক'রে টের পেলেন? তবে কি শৈশবের কোনো স্মৃতি তাঁকে নিয়ে গেছে সেখানে?

ঠিক। তাই ঠিক! হয়তো শিশু বলে গ্রাহ্য না ক'রে কোনো একদিন দারুকেশ্বরের সামনে দাঁড়িয়েই তিনি লক্ষ্মীর পটটি সরিয়েছিলেন, বসে বসে দেখেছিলো সে। সেই পটটি। কিন্তু সে কবে? কবে? কবে এই পাপ করেছিলেন কেদারেশ্বর? সেই কুলাঙ্গারটাকে কবে তিনি এই স্বর্গের সিঁড়ি দেখিয়েছিলেন? ভাবতে ভাবতে কেদারেশ্বর চুল ছেঁড়েন। আর তাঁর স্ত্রী, যার রং তপ্তকাঞ্চনের মতো, যিনি দুর্বল, নরম, ভীরু, তিনি এক পলকে তাকিয়ে থাকেন স্বামীর দিকে, তাকিয়ে থাকতে থাকতে স্বামীর বদলে ছেলের মুখটা ভেসে ওঠে চোখে, কতক্ষণ পরে স্বামী আর ছেলে একটা মানুষ হ'য়ে যায়। একটা দেহ, একটা আত্মা। বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে তাঁর। ধড়ফড়িয়ে শুয়ে পড়েন! পৃথিবী থেকে বাতাসটা কমে যায়।

এই ক'রে ক'রেই কাটতে লাগলো দিন। তারপর মাস তিনেকের মাথায় কোনো এক রাত্রে ঘুমের মধ্যেই মারা গেলেন দারুকেশ্বরের মা। নিঃসঙ্গ কেদারেশ্বর টাকার শোক ভুলে স্ত্রীর শোকে অভিভূত হ'লেন। জীবনে এই প্রথম অনুভব করলেন স্ত্রীকে তিনি টাকার চেয়েও বেশী ভালোবাসতেন।

দুই

এদিকে দারুকেশ্বর তাঁর মাতৃভূমি নন্দন গ্রাম থেকে বেরিয়ে সোজা ট্রেনে চেপে কলকাতা চলে এলেন। পথে নালতা গ্রামে শ্বশুর বাড়িতে এক বেলার জন্য উঠে বৌকে রেখে এলেন সেখানে। কথা থাকলো তিন মাস পরে বাচ্চা হ'য়ে গেলে, বাসাবাড়ি ঠিক ক'রে নিজের কাছে নিয়ে যাবেন।

কলকাতা দারুকেশ্বরের অচেনা শহর নয়, ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে অনেকবার তাঁকে আসতে হ'য়েছে এখানে, দোকানের জিনিসপত্র কিনে কেটে নিয়ে যেতে হ'য়েছে। কেদারেশ্বরের সঙ্গে টুকটাক ঝগড়া-ঝাঁটির শুরু থেকে আরো বেশী এসেছেন। বড়বাজারের গদিতে থেকেও গেছেন দু' চার রাত। খোঁজ খবর নিয়েছেন এখানে এলে তাঁর কী রকম সুবিধে হ'তে পারে। এই বড় ঝগড়ার দু' সপ্তাহ আগে এসে একেবারে আঁট ঘাট বেঁধে গিয়েছিলেন। সুতরাং গুছিয়ে বসতে অসুবিধে হ'লো না কিছু। আপাতত অন্যের দোকানেই কর্মচারী হ'লেন, ইচ্ছে রইলো সুবিধে মতো একটি ভালো ঘর পেলেই একা হ'য়ে আলাদা দোকান দেবেন।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলেন নন্দন গ্রামে ব্যবসা জমানো আর কলকাতা এসে ব্যবসা জমানো সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। গ্রাম আর শহর দুই বিপরীতগামী স্থান। একটার সঙ্গে আর একটার কোনো মিল নেই। এখানকার দুর্বাঘাস মাটি যেমন সিমেণ্ট কংক্রীটে

চাপা পড়ে গেছে, মানুষের হৃদয়ও তেমন আন্তরিকতার অভাবে শুষ্ক। আকাশ-বাতাস, জল-জঙ্গলে গ্রামের মতো এটা ভিজে জায়গা নয়। এখানে গ্রাম সুবাদে জ্যাঠা কাকা খুড়ি জ্যেঠির আব্দার চলে না। এখানে সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত। লজ্জার দায়ে আত্মীয়তার দায়ে মনোমলিন্যের দায়ে কেউ এসে তার দোকানে ভিড় জমাবে না। দশ দোকান আছে, ঘুরবে, ফিরবে, দেখবে, শুনবে, বাছবে, তবে কিনবে। পয়সা দিয়ে জিনিস নেবে তার আবার মুখ চেনাচেনি কী? খাতির পিরীত কী?

বেশ হতাশ হ'লেন দারুকেশ্বর। ভেবেছিলেন কলকাতা এসেই রাজা হ'য়ে যাবেন। গদির ব্যবসায়ীরা তাঁকে তেমনিই বুঝিয়েছিলো। আর তাই তিনি আরো কিছুদিন বাপের ভাত না খেয়ে তাড়াতাড়িই ঝগড়া লাগিয়ে ছুতো ধ'রে চলে এলেন। হয়তো ঠিকই বুঝিয়েছিলো, তারা সব পুরোনো ঘাঘু লোক, কতদিন ধ'রে এসে বসেছে, জমিয়ে নিয়েছে, হাজার হাজার টাকার লেন দেন করছে এই কাপড় বেচে। কিন্তু একজন গ্রাম্য নতুন ব্যবসায়ীর পক্ষে উজিয়ে ওঠা যে কত কঠিন ব্যাপার সে কথা ভাবেনি তারা। কী আর করা যায়! এসে যখন পড়েইছেন, লেগে থাকতেই হবে, 'মন্ত্রের সাধন কি শরীর পাতন' এই বীজ মন্ত্রটি জপ করতে করতেই এগুতে হবে আলোর দিকে।

সুতরাং টাকার থলিটি বালিশের খোলে তুলোর মধ্যে ভ'রে রেখে, সিদ্ধিদাতা গণেশের ছবিতে খুব কষে মাথা ঠুকতে থাকলেন ভক্তিভরে। সকালবেলা যারা পিতলের সাজিতে ফুল বেলপাতা চন্দন নিয়ে দোকানে দোকানে ফোঁটা দিয়ে যায়, তাদের পায়ের ধুলো নিতে লাগলেন প্রত্যেকদিন।

ততদিনে দাদার বাড়িতে শুয়ে শুয়ে তাঁর স্ত্রী মন্দাকিনী অতি সন্তর্পণে একটি কন্যাসন্তান প্রসব করলেন। এত নিঃশব্দে একটি মানবশিশুকে তিনি পৃথিবীতে এনে ফেললেন যে, বলতে গেলে কেউ প্রায় টেরই পেলো না, দাই আনবার পর্যন্ত তর সইলো না। ননদের দিকে তাকিয়ে তার বৌদি অবাক হ'য়ে গালে হাত দিয়ে বললেন, 'এ কেমন বিয়োনী গো। একটু শব্দ করলে না?'

দেখা গেল মেয়েটি তার বাপের মতোই ফর্সা হ'য়েছে। সবাই খুব খুশি হ'লো। শুধু মন্দাকিনী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে ভাবলেন চেহারাটা যেমন তেমন, স্বভাবটা যেন বাপের মতো না হ'য়ে ওর ঠাকুমার মতো হয়। আর ঠাকুমার কথা ভেবে মন্দাকিনীর দুই চোখ জলে ভ'রে গেল। কানের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে বালিশটা ভিজে গেল।

টেলিগ্রাম গেলো দারুকেশ্বরের কাছে।

খবর পেয়ে দশদিনের দিন মেয়ে দেখতে এলেন দারুকেশ্বর। ভাগ্যটা তার সবরকমেই খারাপ চলছে। নইলে ছেলে না হ'য়ে একটা মেয়ে হবে কেন? এই বংশে মেয়েই বেশী হয়, কিন্তু সর্বদাই প্রথমটি হয় ছেলে। কী জানি তার ভাগ্যে কী আছে। হয়তো মেয়েই হ'তে থাকবে ক্রমাগত, ছেলে আর হবেই না। এই মেয়ে হ'য়েছে জেনেই আসবার ইচ্ছে ছিলো না তাঁর। কিন্তু এখান থেকে আসবার জন্য যে রকম তাগাদা দিচ্ছিলেন এঁরা,

কর্তব্যের দায়ে রেলভাড়া খরচ ক'রে আসতেই হ'লো। কে জানে না এলে আবার রাগ ক'রে ভাইগুলো হয়তো রাখতেই চাইবে না বোনকে। বিধবা মা, তাঁর আর কতটুকু জোর। আর না রাখতে চাইলে মহা বিপদে পড়ে যাবেন। আবার একটা ট্যাঁ ভ্যাঁ হ'য়েছে, তাকে শুদ্ধ তখন কোথায় নিয়ে তুলবেন?

কিন্তু এসে ভালোই হ'লো দারুকেশ্বরের। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'য়ে তিনি নতুন আশার আলো দেখতে পেলেন। কলকাতা শহর তখন ধাঁ ধাঁ ক'রে বাড়ছে, দক্ষিণের দিকে বেড়ে বেড়ে ওদিকে ভবানীপুর ছাড়িয়ে প্রায় টালিগঞ্জের পুল পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে আর এদিকে বালিগঞ্জ। ভদ্রলোক কনট্রাকটার, প্রচুর উপার্জন করছেন, প্রচুর কাজ হাতে পেয়েছেন। একজন বিশ্বস্ত লোক খুঁজছেন, যিনি তাঁর সব কাজেই সহায় হ'তে পারেন। এবং সেটা কী ধরনের কাজ হবে তা-ও তিনি দারুকেশ্বরকে বুঝিয়ে দিলেন। দারুকেশ্বর কাজটাও বুঝলেন, সেই সঙ্গে কনট্রাকটারের মনোগত বাসনাটিও বুঝে নিলেন। আসলে দারুকেশ্বরের মতো একজনকেই তিনি চান। সমস্ত বিষয়টা মনোযোগ সহকারে অনুধাবন ক'রে ভালোভাবে এক রাত চিন্তা করলেন দারুকেশ্বর। এক পেশা থেকে অন্য পেশায় বদলে আসা মানেই সেই ব্যবসাতে ইতি দেওয়া। অল্প বয়স থেকে কাপড়ের বাণিজ্যেই তিনি পারদর্শী হ'য়েছেন, এখন ইট চুন সুরকি বালির রহস্য কতটা উদঘাটন করতে পারবেন কে জানে। শুনে অন্তত কিছু গুরুতর বলে মনে হলো না। তা ছাড়া কথা বলে কনট্রাকটারটিকে তাঁর ভালোমানুষ বলেই ধারণা হ'লো। সেই ভালোমানুষের সহকারী হওয়া মানে ধীরে ধীরে তাঁকেই সহকারী করা। দারুকেশ্বরের এক দাঁতের বুদ্ধিও মানুষটির আছে বলে মনে হয় না তাঁর। তবু আরো ভালো ক'রে যাচাই ক'রে নেবার জন্যে দু'দিন বেশী রইলেন তিনি শ্বশুরবাড়িতে, সেই দু'দিনেই তাঁর দিব্যদৃষ্টি তাঁকে বুঝিয়ে দিল বালি সিমেন্ট লোহা লক্কড়ের মধ্যে তাঁর জন্য অনেক রস নিহিত আছে এবং সেই রস তিনি অতি সত্বরই নিংড়ে নিতে পারবেন। এর পরে এক ব্যবসা ছেড়ে অন্য ব্যবসায় যোগদান বিষয়ে মনের মধ্যে তিনি এক তিল দ্বিধা না রেখে মনস্থির ক'রে কলকাতা ফিরে এলেন।

বড়বাজার অঞ্চলে, বড় রাস্তা থেকে কিছু অলিগলি পেরিয়ে তবে দারুকেশ্বরের আস্তানা। ছোট্ট একটি ঘর ভাড়া নিয়ে একা থাকেন দারুকেশ্বর। যার দোকানে কাজ করেন, তাঁর বাড়ি অবিশ্যি কিছুটা দূরে, আরো ভিতরে। একবার ভাবলেন প্রথমে সেখানে গিয়ে কাজে ইস্তফা দিয়ে ফিরে এসে গোছগাছ ক'রে সোজা চলে যাবেন ভবানীপুরে। আবার ভাবলেন, কাজে যখন লেগেছিলেন, দোকানে তখন কোনো লোকের দরকার ছিলো না। বলতে গেলে তাঁর কথাবার্তা শুনে, অসহায় অবস্থা ভেবে, পুরোনো পরিচিত খদ্দেরের উপর নিতান্ত দয়াপরবশ হ'য়েই তাঁকে বহাল করেছিলো দোকানের বুড়ো মালিক। আর

বহাল হ'য়েই দারুকেশ্বর ভেবেছিলেন সূচ হ'য়ে ঢুকে এবার কখন ফাল হ'য়ে বেরোবেন। তারপর মাসখানেকের মধ্যেই এক কর্মচারীর বিরুদ্ধে কান ভারি ক'রে তাকে তাড়িয়ে পাকা হ'লেন। মনিব এখন তাঁকেই বিশ্বাস করে, নির্ভর করে, বলা যায় না হঠাৎ যেতে চাইলে সে কী ব্যবহার করবে। এসব লোককে বিশ্বাস নেই, হয়তো আটকে দেবে, ছাড়তে চাইবে না। বুড়ো তো চালাক কম নয়। মুখে যতো ভালো ব্যবহারই করুক তলায় তলায় ঠিক নিজের স্বার্থে হুঁসিয়ার। আসলে টের পেয়েছে, কিছু রসদ আছে দারুকেশ্বরের হাতে। এখন কি আর সহজে ছাড়বে? তার চেয়ে আগে নিজের ঘরে গিয়ে জিনিসপত্র গোছগাছ ক'রে আসা যাক তারপর দোকানে গিয়ে মালিকের সঙ্গে দেখা ক'রে তার হালচাল বুঝে ব্যবস্থা করলেই চলবে।

মনস্থির করবার পরে পথের দোকান থেকে কিছু পুরি হালুয়া কিনে ঘরের দরজার ডবল তালা খুলে ভিতরে ঢুকলেন দারুকেশ্বর। ঘুটঘুট্টি অন্ধকার, জানালাগুলো সব বন্ধ ক'রে গিয়েছিলেন যাবার সময়ে। চৌকাঠে হুঁচোট খেলেন একটা। আবার বাধা। নিজের ঘরে নিজে ঢুকবেন তাতে আবার বাধা কী? তবু সংস্কারবশত দাঁড়ালেন একটু।

দরজা জানালা বন্ধ থাকলে কী হবে, সারাঘরে ধুলো পড়েছে পাৎলা সরের মতো। এখন আলো পেয়ে, হাওয়া পেয়ে, মানুষের সাড়া পেয়ে, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হ'য়ে উড়তে শুরু করলো। চারমাসের বসবাস করা ঘর। দারুকেশ্বর তীক্ষ্ন চোখে সব দেখে নিলেন এক নজর। জানালার তাক থেকে খাড়া ক'রে রাখা কলাই করা থালাটা টেনে এনে ফুঁ দিয়ে ধুলো ঝেড়ে, কাপড়ের কোঁচা দিয়ে মুছে, খাবারের ঠোঙাটা রাখলেন। তারপর ঘরের কোণ থেকে জলের কুঁজোটা আর মগটা নিয়ে চলে এলেন উঠোনের বারোয়ারী কলতলায়। সকাল আটটা। ভিড় লেগেছে খুব। তারি মধ্যে এগিয়ে গেলেন তিনি, ক'দিন পরে আজ এসেছেন দেখে প্রত্যহের পরিচিত মুখে সম্ভাষণের হাসি ফুটলো, তারা সবাই সরে দাঁড়িয়ে পথশ্রমে কাতর মানুষটিকে সবার আগে জল নিতে দিল। ঘরে এসে দারুকেশ্বর আবার দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলেন। দেয়ালের কোণে দড়ির খাটিয়ায় বসে ভেজা-মুখ গামছা দিয়ে মুছলেন, খাবারের থালাটা টেনে নিলেন কোলের উপর। ঘরটা খুব ছোট। কিন্তু বেশ এক কোণে, একা। দারুকেশ্বর নিজের বাড়ি থেকে যা যা জিনিস পত্র সরিয়ে আনতে পেরেছেন তা সবই শ্বশুরবাড়িতে স্ত্রীর হেপাজতে। এখানে একটি মাত্র ছোট্ট স্টীলট্রাঙ্ক আর সতরঞ্জি-মোড়া দড়ি-বাঁধা বিছানা, এই তাঁর সম্পত্তি। চার মাসের মধ্যে ঘর ছেড়ে রাত কাটাতে এই প্রথম তিনি বেরিয়েছিলেন। গিয়েছিলেন দু'দিন আর এক রাত্রির জন্য, কনট্রাকটারের পাল্লায় পড়ে পুরো তিনদিন তিনরাত কাটিয়ে এই ফিরছেন।

এখানেও দোকানের মালিকটিকে প্রশংসা না ক'রে পারলেন না দারুকেশ্বর। যেতে চাওয়া মাত্রই একবাক্যে রাজি হ'য়ে ছিলো। বরং উৎসাহ দিয়েছিলো। বলেছিলো, যেখানে বৌ আছে সেখানে তো প্রত্যেক মাসে তোমার যাওয়া উচিত, তার ওপর নতুন মেয়ে

হ'য়েছে। যাবে বৈ কি। নিশ্চয়ই যাবে। মাত্র একদিনের জন্য কেন চাও তো এক সপ্তাহের ছুটিও দিয়ে দিতে পারি আমি।

কিন্তু—কিন্তু—হঠাৎ দারুকেশ্বরের দৃষ্টিটা দেয়ালের কোণে গিয়ে থমকে গেল। ট্রাঙ্কটা কেমন বাঁকা হ'য়ে আছে না? ঠিক ঐখানে তো রেখে যাননি তিনি। বিছানাটা রাখলেন উপরে আর ট্রাঙ্কটা রাখলেন নিচে একেবারে দেয়াল ঘেঁষে সোজা ক'রে। তবে ট্রাঙ্কটা ওখানে বেঁকে গেল কেমন ক'রে? তড়াক্ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন, বাতাসের বেগে কাছে গিয়ে কড়া টেনে পরীক্ষা করলেন, ঠিক চাবি বন্ধ আছে কিনা। সর্বনাশ ট্রাঙ্কটা যে খোলা! কে খুললে? কে ঢুকলো ঘরে? ঠিক মনে আছে যাবার সময় বাক্সটা খুললেন, ভিতরে বালিশটা ঢুকোলেন, ওপরকার খোপকাটা ট্রেটা আবার ঠিক মতো পেতে দিলেন তার ওপরে তারপর ডালা বন্ধ ক'রে চাবি লাগালেন। তিনবার চারবার টেনে দেখলেন ঠিক মতো লেগেছে কিনা। কেন দেখবেন না! ট্রাঙ্কটা কি শুধু একটা ট্রাঙ্ক? শুধু কতগুলো ইস্পাত! প্রাণহীন কতগুলো মৃত ধাতুর স্তুপ! না কক্ষণো না। ট্রাঙ্কের বুকের মধ্যে রীতিমত তাঁর কলিজা আছে, সেই কলিজার স্পন্দন আছে, থেমে গেলে মৃত্যু আছে। জীবন না থাকলে মৃত্যু আসে কোথা থেকে?

ক্ষিপ্রহাতে বাক্সের ডালাটা তুলে দারুকেশ্বর সেই জীবনের সন্ধানেই বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তার শুন্য গহ্বরের দিকে। যে বালিশটার মধ্যে তাঁর প্রাণভোমরা লুক্কায়িত ছিলো সে বালিশটাকে কে যেন ফেঁড়ে দু'ফাঁক ক'রে রেখেছে।

যখন থেকে দারুকেশ্বর বাক্সটাকে সোজা বসানো না দেখে বাঁকা দেখেছেন তখন থেকে তাঁর বুকটার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড দুরন্ত ইঞ্জিন ধ্বক ধ্বক ক'রে চলতে আরম্ভ করেছে, এখন হঠাৎ ব্রেক না কষেই সেটা দপ ক'রে থেমে গেল। কয়েক মুহূর্তের জন্য আর নিঃশ্বাস নিতে পারলেন না, নড়তে পারলেন না, চোখের পলক ফেলতে পারলেন না। তারপর দৌড়ে এসে দড়িদড়া খুলে বিছানাটাকে হাঁটকাতে লাগলেন। ছোটো ছোটো দু'টো বালিশ মাথায় দিয়ে ঘুমোন দারুকেশ্বর! তার মধ্যে একটি রেখে গিয়েছিলেন বিছানার ভিতরে, অন্যটি ট্রাঙ্কে। বালিশটাকে ট্রাঙ্কে ঢুকোবার জন্য ট্রাঙ্ক থেকে অনেক জিনিস বার ক'রে বিছানায় বেঁধেছেন। যেমন, একটা সবুজ রংয়ের আলোয়ান, একটা গরম পাঞ্জাবী, তিনখানা ধুতি, মোটা বাঁধানো খাতা দু'খানা, কাঠের ছোট আয়না, একপয়সা দামের একখানা কাকুই, এইরকম টুকিটাকি সব। সেই সবের জঞ্জাল সরিয়ে অন্য বালিশটা তিনি টেনে বার করলেন। ফেঁড়ে ফেললেন এক নিমিষে, তুলোগুলো ছড়িয়ে পড়লো। তারপর আবার ছুটে গেলেন ট্রাঙ্কের কাছে, আবার দেখলেন আবার খুঁজলেন শেষে মাথা চাপড়ে, বুক চাপড়ে প্রায় উচ্চস্বরে হাহাকার ক'রে কেঁদে উঠলেন।

শুধু কি টাকা! সোনা! ছোটো ছোটো ইঁটই ছিলো কুড়িখানা। একেকখানার ওজন

অন্তত পাঁচ ভরি। তুলোর পরতে পরতে বালিশের পাঁজরে লুকিয়ে শুয়ে থাকতো তারা। নিশ্চিন্ত। নির্ভয়। কেদারেশ্বর বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তিনি জানতেন টাকার কোনো মূল্য নেই, মূল্য জিনিসের। এবং সব জিনিসের মধ্যে সোনাই শ্রেষ্ঠ। এক টাকা ভেঙে কোনোদিন দু'টাকা হবে না, কিন্তু আজকের দু'টাকার সোনা কাল হয়তো দু'শো টাকা হ'য়ে যেতে পারে। আরো ছিলো কেদারেশ্বরের থলিতে। বড় বড় হীরে ছিলো তিনখানা, বেড়ালের চোখের মতো, একখানা পাথর, আর একখানা লাল প্রবাল ছিলো, সময় সুবিধে মতো অথবা কারো দুঃসময়ের সুযোগে এই সব কিনে রেখেছিলেন তিনি। প্রায়ই ছেলেবেলাকার একটা ছবি ভেসে উঠতো দারুকেশ্বরের চোখে। তিনি তখন খুব ছোট, কতো ছোট তাও মনে নেই। তাঁর জ্বর হ'য়েছিলো, বার্লি খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে মা রান্নঘরে গিয়েছিলেন। বেলা তখন দশটা কি এগারোটা, এমন সময় জানালার বাইরে কে যেন ডাকলো কেদারেশ্বরের নাম ধরে। আর ডাকটা শুনেই অদ্ভুতভাবে ঘুমটা ভেঙে গেল বালক দারুকেশ্বরের। কিন্তু জেগে থাকা আর ঘুমিয়ে থাকার মাঝখানকার একটা তন্দ্রা অনেকক্ষণ তাকে জড়িয়ে রইলো সারা শরীরে। জেগে উঠতে চেয়েও সম্পূর্ণ জেগে উঠতে পারলেন না। আস্তে আস্তে যখন চোখ খুললেন, দেখলেন জানালার বাইরে চৌধুরী-বাড়ির বড় ছেলে, যার চেহারা দেবদূতের মত, যিনি একসময়ে দারুকেশ্বরের বাবার সহপাঠী ছিলেন, যিনি তাঁর পরবর্তী জীবনে বিলেত গিয়ে মস্ত ডাক্তার হ'য়ে ফিরেছিলেন, যাঁকে গ্রামের লোক সেই কারণে ম্লেচ্ছ বলে সমাজে পতিত করেছিলো, তিনি জানালার শিক গলিয়ে বাবার হাতে কী একটা দিলেন; মৃদুগলায় বললেন, এর অনেক দাম। এসব জিনিস কেনবার মতো ধনী খুব বেশী নেই দেশে। এ আমার মুখেভাতে আমার বড়লোক দাদামশাই দিয়েছিলেন।' দারুকেশ্বর চুপচাপ পড়ে থেকে বড় বড় চোখে দেখতে লাগলেন সেই রহস্যময় দৃশ্য। কেদারেশ্বর ফিসফিসিয়ে বললেন, 'সাচ্চা তো?'

চৌধুরীবাবু বললেন, 'সে বিষয়ে কি তোমার সন্দেহ হয়?'

'না, না। তোমাকে আমি কখনোই সন্দেহ করি না। তা হ'লে সত্যি তুমি জাত খোয়াবে?'

'এ কথা বোলো না কেদারেশ্বর। সেটা গুণীজ্ঞানীর দেশ। সকল বাধা বিপত্তি এড়িয়ে আমি যাবোই সেখানে।'

'এভাবে তুমি কতো টাকা সংগ্রহ করবে?'

'যা পারি, যতটা পারি। এ ছাড়া আমার আরো কিছু নিজস্ব সম্পত্তি আছে, ভাইদের ভাগে একফোঁটা কম না ফেলে—' বলতে বলতে চৌধুরীবাবু পিছন ফিরে তাকিয়ে থামলেন। আস্তে বললেন, 'আমি তোমাদের ধানের মরাইয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি, তুমি টাকাটা নিয়ে এসো। আজ কলকাতা যাবো।'

উনি চলে গেলে কেদারেশ্বর জানালাটা বন্ধ ক'রে দিলেন, এদিকে এসে ভিতর দিকের দরজাটাও বন্ধ করলেন। বিছানায় শায়িত রুগ্ন পুত্রের কথা বোধহয় ভুলে গিয়েছিলেন, তাই

তাকে খেয়াল না ক'রেই সেই বন্ধ ঘরের আবছা অন্ধকারে সন্তর্পণে কুলুঙ্গিটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। থরো থরো হয়ে দেখতে লাগলেন দারুকেশ্বর এরপরে কী হয়। সত্যি সত্যি কী যে হ'লো তা অবিশ্যি আর তিনি বুঝতে পারলেন না। শুধু মনে হ'লো লক্ষ্মীর পটের পিছনে যেন আরো কী আছে। যেন কোনো ভীষণ ষড়যন্ত্র। তাঁর ভয় করতে লাগলো। তিনি চোখ বুজলেন।

তারপরে কতদিন তিনি সেই ছেলেমানুষী কৌতুহলে কতবার সেই কুলুঙ্গির তলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর মাথার থেকে এক হাত উঁচু কুলুঙ্গির দিকে তাকিয়ে কতবার ভেবেছেন কবে বড় হ'য়ে সেখানকার সব রহস্য উদ্‌ঘাটন করবেন। তারপর সত্যি সত্যি বড় হ'তে হ'তে কখন ভুলে গিয়েছেন সেই বিস্মৃতির বয়সের খেলাধূলা।

সবচেয়ে আশ্চর্য এই, ঝগড়া লাগবার দু'দিন আগে হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেই ছবিটা। সন্ধ্যাবেলা, নির্জন ঘরে কী জানি কী কারণে বাবার শোবার ঘরে ঢুকেছিলেন, দেখলেন কেদারেশ্বর লক্ষ্মীর-পটের দিকে মুখ ক'রে ভক্তিভরে প্রণাম করছেন। বিষয়টা কিছুই না। এই সময়ে সব গৃহস্থই শাঁখ বাজিয়ে সন্ধ্যাপ্রদীপ দিয়েছে, তাঁদের লক্ষ্মীর তাকেও ধূপধুনোর গন্ধ। বাড়ির কর্তা সেই সন্ধিক্ষণে প্রণাম করছেন তাঁর গৃহলক্ষ্মীকে। খুব সাধারণ ঘটনা, স্বাভাবিক দৃশ্য। তবু চমকে গেলেন দারুকেশ্বর। হঠাৎ সেই ছেলেবেলাকার বুক ঢিপ ঢিপ করা আতঙ্কটা তাঁকে জড়িয়ে ধরলো। নিঃশব্দে ফিরে গেলেন তিনি। কিন্তু ভুলতে পারলেন না। শুধু যে সেই সন্ধ্যা আর সেই রাতই ভুললেন না তা নয়। পরের দিনও অন্যমনস্ক হ'য়ে সেই একই কথা ভাবলেন। আর তারপর— তারপর—

তারপর কী? অত কাণ্ড ক'রে সব রহস্য ফাঁক করে আলাদীনের যে আশ্চর্য প্রদীপ তিনি একান্ত আগ্রহে সংগ্রহ করলেন, কোথায় গেল সে প্রদীপ? কোথায়? কোথায়? কেমন ক'রে গেল! কে দেখলো সেই প্রদীপের গোপন ভাণ্ডার! কেমন ক'রে দেখলো! কে আসে তাঁর ঘরে? না, কেউ না, কেউ না। কাউকে তিনি ঘরে ঢুকতে দেন না, দরকার পড়লে দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বলেন, কিন্তু চৌকাঠের এপিঠে নয়। শুধু দোকানের বুড়ো মালিক, বুড়ো মালিক ঝুনঝুনওয়ালা —হ্যাঁ, সে আসে। ভালোবাসা দেখাতে আসে, ভালোমন্দ খবর নিতে আসে। অকারণে গল্প করতে আসে। কেন আসে?

তবে—তবে কি—নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই সে। নিশ্চয়ই সে টের পেয়েছিলো, নিশ্চয়ই সে বালিশটার ওজন জেনে ফেলেছিলো। আর সেই জন্যই তাকে এত ভালোবাসার ঘটা, ছুটি দেওয়ার ঘটা। ঘর খালি পাবার জন্যই এই ব্যাকুলতা। দারুকেশ্বর ঠক ঠক করে দেয়ালে মাথা ঠুকলেন, থাবা থাবা হাতে বুক চাপড়ালেন, কুৎসিৎ ভাষায় গালাগাল করতে লাগলেন। এই ঘরখানা ঝুনঝুনওয়ালাই তাঁকে জোগাড় ক'রে দিয়েছিলো, ঘরের তালাটা পর্যন্ত তার। হায়! হায়! একথা দারুকেশ্বরের কেন মনে হ'লো না যে, যার তালা তার কাছে তার একাধিক চাবি থাকাও স্বাভাবিক। খরচ ক'রে কিনতে হ'লো না, অথচ দু' দু'টো দামি বিলিতি তালার মালিক হয়ে গেলেন, এই আনন্দেই তিনি ভুলে গেলেন সব।

কিন্তু তিনিও ছাড়াবেন না সেই শূকরের সন্তানকে। যাবেন, এখুনি যাবেন, এখুনি দোকানে গিয়ে সক্কলের সামনে তাকে নাস্তানাবুদ করবেন, কাছা টেনে ধরবেন, গলায় গামছা দেবেন। টেনে জিব খসিয়ে দেবেন।

খাবেন বলে হালুয়াটা কেবলমাত্র ডেলা পাকিয়ে মুখের কাছে তুলেছিলেন, ফেলে দিলেন ছুঁড়ে, উঠে দাঁড়াবার বেগে কলাইকরা প্লেটটা কোল থেকে ছিটকে পড়ে ঐখানে চলে গিয়ে কেঁপে কেঁপে নিশ্চল হ'লো, কানার কাছের এনামেল চটে গেল খানিকটা। নিজের প্রত্যেকটা জিনিস দারুকেশ্বরের প্রাণতুল্য। সে এক পয়সার ছুঁচই হোক আর আট আনার কলাই-করা থালাই হোক। আজ সে সব মনে রইলো না, উদ্‌গত আবেগে হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে দরজা খুলে পাগলের মতো বেরিয়ে গেলেন তিনি। গেলেন দোকানে। দোকান বন্ধ। কেন বন্ধ? কিসের বন্ধ? সেখান থেকে আবার দৌড়ালেন তিনি মালিকের বাড়িতে। একটা গরু দাঁড়ালে এ-দেয়াল ও -দেয়াল জুড়ে যায়, এমন এক অন্ধ গলিতে ঝুনঝুনওয়ালার নিজের বাড়ি। দু' পাশের অগভীরে ঢালু নর্দমায় নোংরা গন্ধ, দু'পাশে দোকানে দোকানে ঠাসা। তৈজসপত্রের দোকান, সোনার দোকান, রূপোর দোকান, তামা কাঁসা পিতলের দোকান, ছাপা কাপড়ের দোকান—সার বেঁধে আছে সব। এক দৌড়ে সে গলি পার হ'লেন দারুকেশ্বর, তারপর নির্দিষ্ট বাড়ির দরজায় এসে থমকে দাঁড়ালেন। বিশাল তালা ঝুলছে। পাশের লোকেরা বললো, এক মাসের জন্য আপন দেশে গেছে মুকুলচাঁদ ঝুনঝুনওয়ালা, দেশে তার বুড়ি মা মারা গেছে। দরজার কাছে হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়লেন দারুকেশ্বর।

এ নিয়ে দারুকেশ্বর অনেক হাঙ্গামা করেছিলেন। পুলিশের বাড়ি দৌড়েছিলেন, উকিলের বাড়ি দৌড়েছিলেন, দোকানে গিয়ে হামলা করেছিলেন, প্রায় সাতদিন ধ'রে একটা অমানুষিক অবস্থার মধ্যে কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত বুঝলেন যে আর কোনো মীমাংসা হবার নেই। উপরন্তু প্রায় কপর্দকহীন হ'য়ে পড়ছেন দিন দিন। সুতরাং হতাশ হৃদয়ে বিছানা বালিশ গুটিয়ে, ভাঙা ট্রাঙ্ক নিয়ে সেই আস্তানা ছাড়লেন তিনি। উত্তর দিক থেকে সোজা দক্ষিণ প্রান্তে এসে কালীঘাটের মা কালীকে সভক্তি প্রণাম ঠুকে সমস্ত রকম মনোবাসনা নির্গত করলেন। প্রথমেই মুলুকচাঁদকে রক্ত অতিসার রোগে তিনদিনের মধ্যে মেরে ফেলতে অনুরোধ জানালেন, তারপর কোনো দৈব উপায়ে সমস্ত টাকাটা যেন তিনি আবার ফিরে পান তার জন্য পাঁঠা মানসিক করলেন, শেষে বর্তমান কাজে যাতে সফল হন, যাতে এই কাজ থেকেই যা গেছে তা আবার চারগুণ ক'রে ফিরে পান এই প্রার্থনা জানিয়ে চার আনার ডালি দিলেন।

তাঁর সব প্রার্থনা মা কালী হয়তো শুনতে পেলেন না, কিন্তু শেষেরটা নিশ্চয়ই কানে গেল তাঁর। কনট্রাকটার ভদ্রলোক খুশি হ'লেন তাঁকে দেখে, আদর অভ্যর্থনা জানিয়ে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন, এবং বেশ বেশী মাইনেতে সকল কাজের সহকারী

ক'রে নিলেন। একাদিক্রমে চোদ্দ বছর যে ভদ্রলোক কনট্রাকটরের ডান হাত বাঁ হাত হ'য়ে কাজ করছিলেন কিছুদিন আগে মারা গেছেন তিনি, তারপর থেকেই কনট্রাকটরের নিজস্ব ব্যবসা চ্যাটার্জি কোম্পানির অত্যন্ত অসুবিধে চলছে। দারুকেশ্বর যে কর্মঠ হবেন, বিচক্ষণ হবেন এটা তাঁর সঙ্গে কথা বলা মাত্রই বুঝে নিয়েছিলেন কনট্রাকটর। বিশ্বস্ত হবেন কি না এ বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ জাগে নি মনে। এ বিষয়ে তিনি কিছু ভাবেন নি। তাঁর নিজের শরীর নিয়ে ভুগছিলেন একটু। স্নান খাওয়ার অনিয়ম আর সইছিলো না। বয়েস হয়েছে, ক্লান্তি বেড়েছে, আগের মতো হুড়োহুড়ি করবার শক্তি ক্ষয়ে এসেছে, মনে প্রাণে এই রকম, এই দারুকেশ্বরের মতো ভরা বয়সের যোয়ান অথচ পাকাপোক্ত ব্যবসায়ীবুদ্ধিসম্পন্ন একটি মানুষকেই খুঁজছিলেন, তা ছাড়া তিনি চেনা জানা লোক, কুটুম্ব-স্থানীয়, সব দিক দিয়েই গ্রহণযোগ্য। খুশি না হবার কারণ ছিলো না।

হরিশ মুখার্জী রোডে তাঁর নিজের বাড়িতেই একখানা ঘর ছেড়ে দিলেন তিনি, তাঁর স্ত্রী গাঁয়ের জামাই হিসেবে খাতির যত্নও করতে লাগলেন খুব। আর দারুকেশ্বরও তার প্রতিদান দিলেন বই কি। বিনীত হ'য়ে, নম্র হ'য়ে, বাধ্য হ'য়ে প্রতি পদক্ষেপে কনট্রাকটারের মন যুগিয়ে নিজেকে একেবারে অপরিহার্য ক'রে তুললেন কয়েক মাসের মধ্যে।

প্রথম প্রথম জিনিসপত্রের তদারক করা, কুলি খাটানো, ফিতে মেপে লরিভর্তি চুণ সুরকির ওজন দেখে নেওয়া, মালের অর্ডার দিতে যাওয়া এ কাজগুলোই করতেন। আস্তে আস্তে দরজা জানালার কাঠ কেনা, লোহা লক্কড়ের দোকানে দোকানে ঘোরা, দরকার মতো ঘুষ দিয়ে কালোবাজারী জিনিস ফুঁসলে বার ক'রে আনা এগুলোও তাঁর কাজের অন্তর্গত হ'লো। আর তারও পরে পেমেণ্ট করার ভারটাও চলে এলো হাতে। চোখ বুজে কনট্রাকটার সমস্ত কাজের গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দিলেন তাঁর কাঁধে। তারপর এমন একটা সময় এলো যখন প্রায় ছ' মাস বিছানায় পড়ে থাকতে হ'লো কনট্রাকটারকে। দারুকেশ্বরকে সর্বতোভাবে অবলম্বন করা ছাড়া উপায় রইলো না কোনো।

সেই সময়ে এবং সেই সুযোগে টালিগঞ্জ ব্রীজের এপিঠে প্রায় গঙ্গার কাছে সরে এসে ছোট্ট একটি চুন-সুরকির দোকান খুললেন দারুকেশ্বর। মাল কেনার হাজার হাজার টাকা থেকে কিছু টাকা বাকী রেখে ক্রেডিটে জিনিস নিয়ে সেই টাকায় নিজের নামে ঐ দোকানের সঙ্গেই কিস্তিবন্দীতে অতি সস্তায় কয়েক বিঘা জমি লীজ নিয়ে বসলেন। এটা করলেন অতি গোপনে, অতি নিঃশব্দে। কনট্রাকটার ভদ্রলোক কিছুই টের পেলেন না। তারপর শালাদের তাগাদায় টিকতে না পেরে, একখানা মাটির ঘর বানিয়ে নিয়ে এলেন স্ত্রীকে। কিছুদিন বাদে তাঁর দোকানটি আরো একটু বড় হ'লো, তাঁদের নিজেদের চ্যাটার্জি কোম্পানীর মাল যুগিয়েই বেশ ভালোভাবে চলতে লাগলো। আরো পরে দরজা জানালার কাঠ, স্ক্রু বল্টু, লোহা সব কিছুরই আমদানী করতে লাগলেন তিনি।

দোকানের গোড়াপত্তন করতে কিন্তু এক পয়সাও মূলধন লাগলো না তাঁর। কোম্পানীর মণ মণ লরি ভর্ত্তি চুন-সুরকি প্রতিদিন তাঁর হাত দিয়ে মাপা হচ্ছে, অর্ডার

যাচ্ছে তাঁর মারফৎ তিনি ইচ্ছে করলে কী না পারেন। পঞ্চাশ হাজার মণের জায়গায় লরি যদি চল্লিশ হাজার মণ মাল দিয়ে দারুকেশ্বরকে দিয়ে পঞ্চাশ হাজার সই করিয়ে নিয়ে বাকী দশহাজার মণ টালিগঞ্জের দোকানে ফেলে দিয়ে আসে ; কার কি বলবার থাকতে পারে? শুধু চুন-সুরকি বালিই নয়, বস্তা বস্তা সিমেণ্টও এ ভাবেই বণ্টন হ'তে লাগলো। লিণ্টেলের টন টন লোহা, বিশাল বিশাল সেগুন কাঠের গুঁড়ি —তা-ও বাদ গেলো না।

চ্যাটার্জি কোম্পানীর কনট্রাকটার চ্যাটার্জী যতদিন ভুগলেন, ততদিনে এই সব গুছিয়ে নিলেন দারুকেশ্বর। আর তারপর সেই ভদ্রলোক সুস্থ হ'য়ে কাজে আসা মাত্রই হঠাৎ একটা সাংঘাতিক চুরি হ'য়ে গেল গুদোমে। হাঁউ মাউ ক'রে কেঁদে কেটে হাট বাধালেন দারুকেশ্বর। ব্যস্ত হ'য়ে কনট্রাকটার বললেন, 'কী হয়েছে। কী ব্যাপার!'

আর কী ব্যাপার! বিশাল এক ফ্ল্যাট উঠছে আশুতোষ মুখার্জি রোডে, প্রায় চল্লিশ হাজার টাকার মাল মজুত করা ছিলো সেখানে। গভীর রাত্রে দুর্বৃত্তরা এসে দারোয়ানের হাত পা বেঁধে লরি ভর্তি ক'রে প্রায় আদ্ধেক মাল সরিয়ে ফেলেছে। সরকারী অনুমতিপত্র নিয়ে কন্ট্রোল দরে লোহা কেনা হ'য়েছিলো সব গেছে। এখন যদি কালোবাজারে বেশী দাম দিয়ে আবার সেই লোহা কিনে আনতে হয় তা হ'লে চ্যাটার্জি কোম্পানীর আর ফেল পড়তে বাকী থাকবে না কিছু।

শুনে হাত পা ঠাণ্ডা হ'য়ে হার্টফেল করবার দশা হ'লো চ্যাটার্জির। বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল কপালে পিঠে, তিনি এলিয়ে পড়লেন বিছানায়।

ইদানীং এমনিতেই তিনি একটু উদ্‌ভ্রান্ত বোধ করছিলেন কাজ-কর্মের ব্যাপারে। ব্যবসাটা হঠাৎ তাঁকে এমন একটা জায়গায় এনে পৌঁছে দিয়েছিলো যেখান থেকে হিসাব মিলাতে হিম্‌সিম্ খেয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। কত স্কোয়ার ফুট জমি ঢাকতে কতখানি ইঁট চুন-সুরকি বালি আর সিমেণ্টের দরকার হয় এ হিসেব এতদিন তাঁর নখদর্পনে ছিলো। হঠাৎ মনে হচ্ছিলো সেই মাপ যেন তাঁর কেথায়ও মিলছে না। অনেকদিন এ নিয়ে তিনি কথা বলেছেন দারুকেশ্বরের সঙ্গে, শুয়ে শুয়ে অঙ্ক কষে দেখিয়ে দিয়েছেন এর বেশী লাগতেই পারে না, তবে কেন মালে কম পড়ে। হাঁ ক'রে সরল চোখে তাকিয়ে থেকেছেন দারুকেশ্বর, বোকার মতো প্রশ্ন করেছেন, 'তবে কি স্যার আমার কোনো অনভিজ্ঞতার দরুণই এরকম হচ্ছে?'

'তা কেমন ক'রে হবে—' বিশ্বস্ত দৃষ্টিতে দারুকেশ্বরের মুখের উপর চোখ রেখেছেন কনট্রাকটার, বলেছেন, 'মালটা যখন ফেলে তখন তো তুমি নিজে দাঁড়িয়েই মেপে নাও। আর মাপতে তো তুমি নিশ্চয়ই ভালো ক'রে জেনে নিয়েছ।'

'তা নিয়েছি'।

'তবে?'

'সেই তো ভাবি।' তারপর সত্যিই ভেবে ভেবে সারা হ'য়ে লাফিয়ে উঠেছেন দারুকেশ্বর—'বুঝেছি, বুঝেছি।'

'কী বুঝেছ?' আশান্বিত হ'য়েছেন কনট্রাকটার। দারুকেশ্বর বলেছেন, 'আমার মনে হয় কোনো অবিশ্বাসী লোকের জন্যই এই অনিষ্টটা হচ্ছে।'

'কার জন্য হচ্ছে ব'লে তোমার ধারণা?'

দারুকেশ্বর চোখ নিচু করেছেন—'থাক, স্যার সে সব ব'লে আর ইয়ে করবো না।'

চোখ কুঁচকে কনট্রাকটার বলেছেন, 'দ্যাখো দারুকেশ্বর, আমার এই কোম্পানী আজকের নয়। আমার বয়েস হ'য়েছে পঞ্চাশ, কাজ করছি আমি তিরিশ বছর ধ'রে। নিতান্ত দরিদ্র ছিলাম, অতি কষ্টে আই.এ পর্যন্ত পড়েছিলাম। ইচ্ছে ছিলো লেখাপড়ার দিকেই থাকি। কিন্তু আই. এ-র পরে আর বি.এ তে ভর্তি হবার সাধ্য হ'লো না। মামাবাড়িতে থাকতুম, মামা এনে তাঁর এক বন্ধুর কাছে এই কাজে ঢুকিয়ে দিলেন। ঠিক তোমার মতো করেই ঢুকেছিলাম। চমৎকার লোক ছিলেন তিনি। হাতেকলমে সব কাজ শিখিয়ে দিয়ে গেছেন আমাকে। আর সেই কাজ থেকেই আজ আমার এই অবস্থা। বাড়ি করেছি, ঘর করেছি, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাচ্ছি—কিন্তু ঠকিনি কোনোদিন। কেউ আমাকে ঠকায়নি। আমার তো সবই পুরোনো লোক, এ ধরনের কোনো গোলমাল করবে ব'লে তো আমার মনে হয় না।'

এ কথার পরে গম্ভীর হ'য়ে গেছেন দারুকেশ্বর, মুখ ভার ক'রে বলেছেন, 'তা হ'লে নতুন লোকের উপরই আপনার অবিশ্বাস হচ্ছে বোধ হয়?'

'না, না, না—' কনট্রাকটার লজ্জায় অস্থির হ'য়ে উঠেছেন—'এ তুমি কী বলছো, কী ভাবছো। আমি মোটেই সে কথা ভাবিনি। কারো উপরই আমার কোনো অবিশ্বাস নেই। শুধু বলতে চেয়েছি যে আমাদের আর একটু হুঁসিয়ার হ'তে হবে। আর দারোয়ানটাকে বেশ ভালোভাবে ওয়াচ্ করতে হবে।'

'ঠিক'। দারুকেশ্বর খুশি হ'য়ে উঠেছেন, 'আমিও আপনাকে সে কথাটাই বলবো ভাবছিলাম। দেখুন, আমি তো আর মাল নিয়ে বসে থাকি না। মেপে দিয়েই খালাস। তারপর তো সব ঐ দারোয়ানের জিম্মায়। ইচ্ছে করলে সে কী না পারে?'

'তাই তো'।

'ঠিক আছে। আমি এবার খুব সাবধান হ'য়ে যাবো।' বলতে বলতে সব সমস্যার সমাধান ক'রে উঠে দাঁড়িয়েছেন দারুকেশ্বর।

কিন্তু তাই বলে এই ব্যাপার? এত বড় চুরি। কনট্রাকটার স্তব্ধ হ'য়ে গেলেন। হন্ত দন্ত হ'য়ে দারুকেশ্বর বললেন, 'আপনি উঠুন স্যার, শক্ত হোন, এর একটা হেস্ত নেস্ত আমরা করবোই করবো। আমি এখনি গিয়ে পুলিশে খবর দিয়ে আসছি।'

হাত তুলে বারণ করলেন কনট্রাকটার। অবসন্ন গলায় বললেন, 'লাভ নেই।'

তবু দারুকেশ্বর অনেক লম্ফঝম্প ক'রে শেষে বিদায় নিলেন।

এর কিছুকালের মধ্যেই সেখানকার কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন দারুকেশ্বর। কেন দিয়েছিলেন, আবার নতুন কি ঘটেছিলো, অত বড় একটা ক্ষতির ধাক্কা সামলাতে চ্যাটার্জি কোম্পানী কোথায় তলিয়ে গিয়েছিলো তার সঠিক ব্যাখ্যা কেউ জানে না। কিন্তু দারুকেশ্বর সেই সময়ে নিজের ব্যবসা বেশ ভালোভাবেই চালাতে সক্ষম হ'লেন। রীতিমতো বড় ব্যবসা। যে ব্যবসায় তখন চুন-সুরকিটা গৌণ হ'য়ে লোহা লক্কড়ই মুখ্য হ'য়ে উঠেছে। দারুকেশ্বরের নজর বরাবর লোহা লক্কড়েই আবদ্ধ ছিলো, এখন দেখা গেল, ঐটুকু দোকানে তার আমদানী বড় কম করেন নি। সরকারী পারমিটের কণ্ট্রোল দরের লোহা বেসরকারীভাবে কালোবাজারে বিক্রি ক'রে সে বছর তিনি প্রচুর লাভ করলেন।

ততদিন তাঁর মেয়ের বয়স চার হ'লো এবং আর একটি পুত্রসন্তানের পিতা হ'য়ে ভাগ্যের দরজায় কপাল ঠুকলেন। মায়ের মৃত্যু আগেই জানতেন, কিন্তু শ্রাদ্ধ করা হয়নি। এবার পিতার খবর পেলেন আর সঙ্গে সঙ্গেই চলে গেলেন দেশে। সেখানে গিয়ে সকলকে দেখিয়ে অনেক কাঁদলেন, তারপর রাত হ'লে, একলা হয়ে আঁতিপাঁতি ক'রে ট্রাঙ্ক বাক্স ঘাঁটতে বসলেন। ছাই—কিচ্ছু নেই। কুলুঙ্গিটাই হাতড়াতে লাগলেন একশোবার। নেই—কিচ্ছু নেই। শেষে একটা শাবল দিয়ে আন্দাজ ক'রে ক'রে বাড়ির আনাচে-কানাচে উঠোনে, খুঁড়ে খুঁড়ে গর্ত ক'রে ফেললেন। পরিশ্রমে ঘাম ছুটলো, যোয়ান শরীর ক্লান্তিতে ভেঙে এলো, তবু তিনি ছাড়লেন না। ভোর রাত্রের দিকে, যখন প্রায় ফর্সা হ'য়ে এলো তখন এসে শুলেন। পরের দিন ঘুম ভাঙলো বেলায়, আবার খানিকটা লোকদেখানো কান্না কেঁদে, ঘরের সব জিনিস উঠোনে এনে টাল করলেন। তিনটে তক্তপোষ একটা খাট, একটা বেঞ্চি, চারটে জলচৌকি, আরো সব কি কি আসবাবপত্র। নীলেম ডেকে বিক্রি করলেন দু'দিন ধ'রে। তারপর বাসন-কোসন, পূজোর কোষাকুষি, সতরঞ্চি, মাদুর, পাটি, বালিশ, ট্রাঙ্ক, বাক্স—সব, সব বিক্রি করলেন একে একে। এই সমস্ত করতে পুরো দশদিন লাগলো তাঁর। হাতের মুঠো মন্দ ভরলো না তাতে। এবার শ্রাদ্ধ ক'রে শূন্যগহ্বর বসতবাটিতে শিকল তুলে ফিরে এলেন কলকাতা। কলকাতা এসেই মাটির বাড়িতে ইঁটের গাঁথুনি দিলেন, টিনের ছাদ খুলে রেখে এ্যাস্‌বেস্‌টাস লাগালেন। তাঁর নিরানববুই বছরের লীজ নেওয়া সাড়ে চার বিঘে জমির মধ্যে টিনের সেডে দোকানঘর আর ঐ ছোট্ট বাড়িখানা ধূ ধূ করতে লাগলো।

সেই ধূ ধূ জমির দিকে তাকিয়েই আর একটা বুদ্ধি এলো মাথায়। পরবর্তী জীবনে সেই বুদ্ধিতেই তিনি লোহার কারখানা খুলেছিলেন, সংলগ্ন আরো ছ' বিঘা জমি নিয়ে বস্তি বানিয়েছিলেন।

কিন্তু সে সব আজকের কথা নয়, অতীতের স্মৃতি মাত্র। যে স্মৃতি একমাত্র দারুকেশ্বরের হৃদয়েই একটুকরো ঝাপসা ছবি হ'য়ে আছে। অনেক কিছু করতে করতে হঠাৎ যে স্মৃতি অবচেতনের তিমির থেকে সব ভেদ ক'রে উঠে আসে মাঝে মাঝে। একটি পঁচিশ বছরের যুবকের ওপর দিয়ে তারপর আরো কত দিন ক্ষণ মাস বছর গড়িয়ে গড়িয়ে

কত ঋতুর ছাপ রেখে গেল শরীরে মনে! পথ চলতে চলতে কত ফুল মাড়ালেন, কত কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত হ'লেন। ভ্রূক্ষেপ না ক'রে চ্যাটার্জি কোম্পানীর চ্যাটার্জি কনট্রাকটারের মতো আরো কত মানুষকে ডিঙিয়ে ভাঙিয়ে উঠে এলেন ওপরতলার সিঁড়িতে! দরকার মতো কখনো কারো পা ধরলেন, কারোকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিলেন, কতবার বন্ধুতা করলেন, কতবার তাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে মিশিয়ে দিলেন রাস্তার ধূলোয়! কিছু ভুললেন, কিছু মনে রাখলেন, কিছু হাতে রাখলেন, কিছু ফেলে দিলেন। তারপর কালস্রোতে কোথায় ভেসে গেল সেই সব দিন, সেই সব কথা, সেই সব মানুষ। এমনি ক'রেই একদিন ভাগ্যের অনেক উঁচু চূড়োর উঠে পৌঁছুলেন এসে একাত্তর বছরের সিংহ দরজায়। ধনে সম্পদে কর্তৃত্বে যেখানে এসে এখন থর থর করছেন তিনি।

স্ত্রী মারা গেছেন বহুকাল আগে। সেই টালিগঞ্জের গঙ্গার ধারের জঙ্গল থেকে, বালিগঞ্জের এই জঙ্গলে এসে মাত্র কয়েক বছর ছিলেন। মেয়ের পরে পর পর আরো পাঁচটি সন্তানের জননী হ'য়েই হাঁফ ধরেছিলো তাঁর বুকে। মাঝখানের দু'টিকে মৃত্যুর কাছে সঁপে দিয়ে আরো ভেঙে গেলেন। প্রথম সন্তান মেয়ের পরে দুই ছেলে, তারপরে আর এক মেয়ে, আবার দুই ছেলে। কনিষ্ঠ পুত্রটিকে নিয়ে যখন সুতিকাগৃহে দারুণ রক্তহীনতায় মূর্ছার মতো পড়েছিলেন, সেই সময়ে সদ্যোজাত শিশুর উপরের আড়াই বছরের ছেলেটি এবং সাড়ে তিন বছরের মেয়েটি, দু'জনেই অযত্নে জ্বরে পড়লো। বুকে ঠাণ্ডা বসে সব মিলিয়ে হয়তো দিন পনেরো ভুগেছিলো তারা। তারপর অচিকিৎসায় মারা গেল। দারুকেশ্বর দাহ ক'রে এসে একদিন ঝিমিয়ে রইলেন, তারপরেই আবার কাজে ডুবে গেলেন। কিন্তু দারুকেশ্বরের স্ত্রীর ফোঁপানি থামতে সময় লাগলো। এ নিয়ে দারুকেশ্বর অনেক ধমক ধামকও করলেন। সেই ধমকে আস্তে আস্তে চোখের জল শুকোলো বটে কিন্তু বিছানার সঙ্গে হৃদ্যতা জন্মালো।

দারুকেশ্বর তাতেও রাগ করলেন। মেয়েমানুষের একমাত্র যোগ্যতাই তো তার শরীর, তার স্বাস্থ্য। তাই যদি গেলো তো রইলোটা কী?

এ কথা শুনে আবার শুকনো চোখে জল দাঁড়ায় দারুকেশ্বরের স্ত্রীর। স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য আবার উঠে দাঁড়ান তিনি, আবার রান্না করেন, বাসন মাজেন, ঘর ঝাড়েন, ছেলে রাখেন ধুঁকতে ধুঁকতেও সধবা স্ত্রীলোকের সন্তান ধারণের দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু ঐ ধারণ পর্যন্তই, শেষ অবধি আর পৌঁছুতে পারলেন না। সাত মাসের মাথায় একটি কড়ে আঙুলের মতো মৃত শিশু প্রসব করেই রক্তক্ষরণের আধিক্যে চোখ বুজলেন। তাঁর আর সবকিছুর মতো মৃত্যুটাও খুব নিঃশব্দে হ'লো। যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই মারা গেলেন।

খবর পেয়ে কাজ থেকে ছুটে এলেন দারুকেশ্বর, একগাদা শিশুসন্তানদের দিকে

তাকিয়ে অন্ধকার দেখলেন দুই চোখে। স্ত্রীর জন্য কষ্টও পেলেন একটু। শান্তশিষ্ট ভদ্রমহিলাটি যে মানুষ হিসেবে নিতান্ত মন্দ ছিলেন না, সে বিষয়ে নিঃসংশয় হ'লেন। এমন কি এক কথা ভেবে অন্তরে অন্তরে বেশ একটু অনুতপ্ত হ'লেন যে কাজকর্মের জন্য অতটা চাপ না দিলে, একটা ঠিকে ঝি রেখে দিলে হয়তো এত তাড়াতাড়ি শেষ হ'য়ে যেতো না তাঁর স্ত্রী। তা ছাড়া কিছু ওষুধপত্রও খাওয়ানো উচিত ছিলো, ডাক্তার দেখানো উচিত ছিলো। কিন্তু যা হ'য়েছে তা হ'য়েছেই, আর তো তার পরিবর্তন বা সংশোধন সম্ভব নয়। সুতরাং বিলাপ ক'রে আর লাভ কী। আর ওসব বিলাপের সময়ই বা তাঁর কোথায়? স্বভাবও নয়। বরং এখন সংসারটা চলবে কী করে, রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়া, এতোগুলো শিশুর রক্ষণা-বেক্ষণ করা—এ সবের কী ব্যবস্থা হবে সে কথা চিন্তা করাই বেশী জরুরী।

প্রতিবেশীরা গায়ে পড়ে দেখাশুনো করতে এসেছিলো, মুখের পেশীতে মনের ভাব প্রকাশ ক'রে তাদের তাড়ালেন দারুকেশ্বর। তারপর খুঁজেপেতে একজন শক্তসমর্থ ঝি নিয়ে এলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই আবার ঠিক হ'য়ে গেল সব। শিশুদের মনের কথা শিশুরাই জানে, কিন্তু দারুকেশ্বরের আর কোনো অসুবিধে রইলো না। বরং বিয়ে করা বৌয়ের চেয়ে মাইনে করা ঝি দিয়েই তিনি বেশী কাজ পেতে লাগলেন। সাংসারিক কাজ তো বটেই, কর্তার মনোরঞ্জনের ভূমিকাতেও স্বাস্থ্যবতী ঝিটির পটুতার অভাব দেখা গেলো না কোনো। আর সেই পটুতার অবশ্যম্ভাবী ফল যা হওয়া উচিত, কয়েক মাসের মধ্যেই তা পরিস্ফুট হ'য়ে উঠলো। একদিন দারুকেশ্বর তাকে নিয়ে কোথায় বেরিয়ে গেলেন, ফিরে এলেন আর এক ঝি নিয়ে। দেখা গেল এই মেয়েটিরও স্বাস্থ্য বেশ ভালো, বয়েস আরো অল্প।

প্রতিবেশীদের মধ্যে প্রচুর জটলা হ'লো তাই নিয়ে। কিন্তু দারুকেশ্বর আপন কর্মে অটল, অচল। এ-সব নিন্দা-চর্চা তিনি গ্রাহ্য করলেন না। তাঁর ঘরে গৃহীণী নেই, স্বাস্থ্যবতী অল্পবয়সী ঝি না হ'লে তাঁর চলবে কেন?

অবিশ্যি বিয়ে করলেই সব ঝামেলা চুকোতে পারতো। কিন্তু ও সব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যেতে আর রাজি হ'লেন না তিনি। পরিবার হ'লেই তার প্যাখনা হবে অনেক। এই চাই ওই চাই, আজ মাথাধরা কাল শরীর ব্যথা—তার উপর ছেলেপুলে হওয়া তো লেগেই থাকবে বছর ভ'রে। বিবাহিত স্ত্রীর সন্তান তখন কে উৎপাটন করবে? আর এক স্ত্রী ভালোমানুষ ছিলো বলে, অন্য স্ত্রীটি যে দুরন্ত দজ্জাল হবে না তার কি অঙ্গীকার আছে কোনো? তবে?

বেশ ভালোই চলছিলো সব। হঠাৎ তাকিয়ে দেখলেন, বড়ো মেয়েটি যেন বেশ বড়ো হ'য়ে উঠেছে। সংসারটাকে যেন কেমন সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছে। বয়সটা হিসেব করলেন মনে মনে। বারো পূর্ণ হ'য়ে গেছে পাঁচমাস আগে। যত্তো ঝামেলা। মনে মনে গাল দিলেন তিনি, অনুভব করলেন স্বাস্থ্যবতী আর অল্পবয়সী ঝি রাখা আর চলবে

না। কারণে অকারণে সেই ঝিয়েদের ফষ্টি নষ্টি চোখের জল, কারণে অকারণে চেঁচিয়ে উঠে ভয় দেখানো, আর সেই দেখানো ভয়ে দারুকেশ্বরের কাতর হ'য়ে ওঠা, সব যেন ওই বারো পূর্ণ তেরো বছরের মেয়েটা কেমন মনোযোগ দিয়ে দেখে, শোনে। ঝিগুলো যখন বাসনমাজা খসখসে হাত পেতে রীতিমতো অধিকারের দাবি নিয়ে মোটা টাকা আদায় করতে আসে, ঐ মেয়েটা যেখানেই থাকুক, ঠিক টের পেয়ে যাবে। ঝিগুলোকে ঠাণ্ডা করবার জন্য দারুকেশ্বরের গোপন ধমক, গোপন শাসন, গোপন ভালোবাসা আর গোপন ক্ষতিপূরণ সব যেন উদঘাটন করে ফেলতে চাইবে ঐ পাকা মেয়েটা।

মেয়ের ওপর তিনি খড়গহস্ত হ'য়ে উঠলেন। মেয়েকে তাঁর সুখের কাঁটা বলে মনে হ'তে লাগলো। স্ত্রী আদর ক'রে লক্ষ্মীমণি নাম রেখেছিলেন, সেই নামটা তৎক্ষণাৎ উল্টে দিতে ইচ্ছে করলো। তখন তিনি উঠে পড়ে লাগলেন তাকে বিদায় করতে। ঘটক লাগিয়ে সম্বন্ধ খুঁজে বেড়াতে লাগলেন।

কিন্তু মেয়েটি আসলে লক্ষ্মীই ছিলো। ঝি উঠিয়ে দিয়ে বাবা যখন তাকে শাস্তি দেবার জন্য সকল ভার চাপিয়ে দিলেন তার ওপর, নিঃশব্দে করতে লাগলো সব। না ক'রেই বা উপায় কী? শব্দ করবে, আপত্তি করবে, পারিনা বলে বসে পড়বে, এমন সাহসই কি আছে নাকি তার। বাপকে সে যমের মতো ভয় করে। ঠাণ্ডা শীতল মাকে মনে পড়ে তখন, চোখ ভ'রে জল আসে। অম্লানবদনে সংসারের সমস্ত কাজ করতে করতে, কখনো সোজা দক্ষিণে—মা'র মতো ক'রেই টলটলে লেকের জলের দিকে তাকিয়ে থাকে, হয়তো মা'র মতোই ডুবে যেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু ইচ্ছে আর সামর্থ্য কি এক? ভাইয়েরা সবাই তার ছোট, সবাই ঐ একরত্তি দিদির স্নেহের ছায়ার দিকে তাকিয়েই বেঁচে আছে, তারা তাকে কাঁদতেও দেয় না প্রাণভরে। বিশেষ ক'রে সবচেয়ে ছোট ভাইটি—তার তো সে-ই মা।

দারুকেশ্বরের প্রতি এই অমানুষিক ভয় অবিশ্যি শুধু লক্ষ্মীমণিরই ছিলো না, ছেলে তিনটিও কাঁটা হ'য়ে থাকতো। দারুকেশ্বর ভাবতেন কাট্‌লেট যেমন যত বেশী থেঁতো করা যায় তত বেশী সুস্বাদু হয়, শিশুরাও তেমনি। দোষ করুক চাই না করুক, শাসনের দণ্ড সর্বদাই উদ্যত রাখতে হবে। আর যেহেতু বাপ ছাড়া সংসারে তারা অন্য কোনো লোকের আশ্রয় পেতো না, সে জন্যে শাসনটাও নিরবচ্ছিন্ন হবার বাধা ছিলো না কোনো। যদি তাদের মা জীবিত থাকতেন, নিশ্চয়ই দারুকেশ্বর এই রকম মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে তাঁর ওপর এমন নির্বিচার আনুগত্যে অভ্যস্ত করাতে পারতেন না। মায়ের স্নেহ বড় ভীষণ জিনিস। নিশ্চয়ই সন্তানের প্রতি দারুকেশ্বরের একাধিপত্যে বাদ সাধতেন। নিষেধ শাসনে বাধা দিতেন। যত ভীরু স্ত্রীলোকই হোক, এই একটি জায়গায় তারা মরীয়া। নিজের উপর স্বামীর সমস্ত অত্যাচার তারা হয়তো সারাজীবন মুখ বুজে সহ্য করবে কিন্তু সন্তানের বেলায় অন্যমূর্তি। সেখানে সে শাবকরক্ষক বাঘিনীর সমগোত্র।

ছেলেদের ভয়ভীতি বাধ্যতা দেখতে দেখতে একথাটা প্রায়ই মনে হ'তো দারুকেশ্বরের। সেই সঙ্গে নিজের মাকেও মনে পড়তো। কেদারেশ্বরের মতো ঐরকম রাশভারি দুর্দান্ত বাপকেও তিনি অমন অনায়াসে (খুব কি অনায়াসে?) পরিত্যাগ ক'রে চলে আসতে পারলেন, তার কারণটা কী? একদিকে পিতার নিষ্ঠুরতা অন্যদিকে মায়ের প্রশ্রয়, প্রতিবাদ। কেদারেশ্বরের শাসনের লাগাম ঢিলে হ'য়ে গিয়েছিলো, এই দুইয়ের সংমিশ্রনে। আর সেই ছিদ্র দিয়েই দারুকেশ্বর দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর বাবা যা করছেন যা বলছেন সেটাই রীতি নয়, নীতি নয়, একমাত্র নয়। এর প্রতিবাদ আছে, প্রতিরোধ আছে।

দারুকেশ্বর এদিক থেকে ভাগ্যবান। সত্যি ভাগ্যবান। স্ত্রীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যত কষ্টই হোক বা যত অসুবিধেই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত ফলটা তার ভালোই হ'য়েছিলো। ছেলেদের মানুষ করতে তাঁর আর অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হ'তে হয়নি। শক্ত হাতে রাশ টেনে টেনে তিনি তাদের শায়েস্তা করেছেন, শুধু একটি জায়গায় কী জানি কেমন ক'রে হঠাৎ এককোঁটা জল ঢুকে গেছে, তাঁর শুকনো হৃদয়ের মরুভূমিতে সেই এককোঁটা জল এক টুকরো ঘাসের জমি তৈরী করে ফেলেছে। কনিষ্ঠ পুত্রটির প্রতি তিনি তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ভাবেই একটু দুর্বল। মাতৃবিয়োগের পরে এই শিশু-শরীর রাতের পর রাত তাঁর বুকের তলার আশ্রয়েই ঘুমিয়ে থেকেছে, তাঁর উদাসীনতাকে উপেক্ষা ক'রে, তাঁকেই ক্রমাগত চেয়েছে, কাজ থেকে দেরি ক'রে ফিরলে হাপুস নয়নে কেঁদেছে, ভয়ডর ভুলে দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরেছে। এই ছেলেকে ছাড়াতে পারেন নি, নড়াতে পারেন নি, দূরে ঠেলে রেখে নির্লিপ্ত হ'তে পারেন নি। অবিশ্যি তাতে ক্ষতি হয়নি কোনো, শাসনের বাগে কিছু কম পড়লেও এই ছেলে তাঁর স্বভাবতই শান্ত, বাধ্য, অনুগত।

কিন্তু এ-ও সেই অতীতেরই গল্প, যে অতীতকে তিনি অনেক কাল আগে ছাড়িয়ে এসেছেন, পিছন ফিরে তাকালে যে অতীত এখন ধূ ধূ প্রান্তর মাত্র। সে অতীতে তাঁর স্বাস্থ্য ছিলো অসুরের মতো, একদিন এককোঁটা মাথাও যাঁর ধরেনি। এখন, বুড়ো হ'তে হ'তে মাঝে মাঝেই দেহ বিশ্বাসঘাতকতা করছে তাঁর সঙ্গে। আজ ঘুম হয় না, কাল খাবার হজম হয় না, পরশু দাঁতের গোড়া কন্‌কন্ করে, এ তো লেগেই আছে, তার উপর আসল ব্যামো হচ্ছে তাঁর ব্লাডপ্রেসার। এটা নতুন। প্রেসার বাড়লে তিনি অচৈতন্য হ'য়ে পড়েন, তখন ছেলেরা যে যেখানে থাকে ছুটে আসে কাছে, হন্তদন্ত হ'য়ে ডাক্তার ডেকে আনে, সেবার আধিক্যে এ ওকে হার মানায়, ধাক্কাধাক্কি করে। হয়তো সেই একাগ্র যত্নেই দারুকেশ্বর আবার চোখ মেলে তাকান পৃথিবীর দিকে, কয়েকদিন শুয়ে থেকেই উঠে বসেন। আর একবার ভালো হয়ে উঠলেই কোনো ভাবনা থাকে না। ঈশ্বর তাঁর শরীরে খুব দামী ইঞ্জিন লাগিয়ে ভবধামে পাঠিয়েছিলেন, সামান্য ওষুধ ইঞ্জেক্‌সন তেল খেয়েই আবার তা পুরোদমে চলতে থাকে। আবার তিনি সুস্থ সবল হ'য়ে কাজে লেগে যান।

তিন

দারুকেশ্বরবাবু যখন প্রথম এ পাড়ায় এসেছিলেন, বাড়িটি একতলা ছিলো। চারপাশে ফাঁকা জমি পড়ে থাকায় বেশ হাত পা ছড়ানো মনে হ'তো। এখন সেই সব জমি ভরাট হ'য়ে মস্ত মস্ত প্রাসাদ উঠে গেছে। পৃথিবীর লোক এসে ভিড় করেছে এই অখ্যাত কেয়াতলা নামধারী পাড়াটিতে। তাঁর বাড়িওয়ালাও তাঁর একতলার উপরে দোতলা তেতলা বানিয়ে ভাড়াটে বসিয়েছেন, কিন্তু তাদের কাছ থেকে যা ভাড়া নিচ্ছেন, দারুকেশ্বরবাবু দিচ্ছেন তার তিনভাগের একভাগ। বাড়িওলা ক্রুদ্ধ হ'য়ে অনেকবার তাঁকে উঠোবার চেষ্টা করেছেন, পারেন নি, শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে চুপ করেছেন। শুধু একবার দারুকেশ্বরবাবু দয়াপরবশ হ'য়ে পঁয়তিরিশ টাকা ভাড়ার বদলে পাঁচ টাকা, বড়িয়ে চল্লিশ টাকা ক'রে দিয়েছিলেন। ব্যস সেই শেষ। তা-ও আজ পনেরো বছর আগের কথা। দোতলার ভাড়াটেরা তিনখানা ঘরের জন্য তিনশো টাকা দেয়, তেতলার ভাড়াটেরা চারতলার উপরের একটি চিল কুঠি মিলিয়ে সাড়ে তিনখানা ঘরের জন্য সাড়ে তিনশো দেয়, আর দারুকেশ্বর দেন চল্লিশ।

তিনখানা ঘরের একখানা বেশ বড়সড়ো, আলো বলতে হাওয়া বলতে চারপাশের বাড়ির মাথা ডিঙিয়ে যা একটু আসে ঐ ঘরেই আসে। অন্য দু'খানা তার চেয়ে ছোটো। কিন্তু পূর্বদক্ষিণ কোণ জুড়ে বেশ চওড়া চৌকো বারান্দা আছে একটি। দু' সিঁড়ি নেমে ছোট্ট একটু উঠোন, উঠোনেই কল চৌবাচ্চা রান্নাঘর। রান্নাঘরের পাশে খুপরিমতো একটুখানি একটা বাথরুম।

এর মধ্যে দারুকেশ্বরের বড় ছেলে, মেজ ছেলে, ছোট ছেলে তাদের তিন স্ত্রী নিয়ে বসবাস করে। বড় ছেলের চারটি শিশু, মেজ জনের তিনটি—আর ছোট জনের একটি। সব মিলিয়ে চোদ্দোজন। আর দারুকেশ্বর নিজে। অর্থাৎ পনেরোজন। তাছাড়া আরো আছে, দু'জন চাকর আছে, একজন টাইপিস্ট আছে, একজন সরকার আছে। তা হ'লে মোট সংখ্যা দাঁড়ালো উনিশ। তবে সরকার আর টাইপিস্ট ছোকরাটি খায় কিন্তু শোয় না। একটু দূরে একটি গ্যারেজ ঘরে তাঁদের গুদোম আছে মালপত্রের, কোনো রকমে সেই সবের ফাঁকে একটু জায়গা ক'রে নিয়ে এক কোণে একটি মলিন শয্যায় শুয়ে সেখানেই ঘুমিয়ে থাকে।

দিনের বেলা যতক্ষণ বুড়োর কাছে কাজকর্ম থাকে, করে, যা ফরমাস থাকে খাটে, বাকী সময় ফুটপাথে, পার্কে, আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ি এই ক'রে ক'রে সময় কাটায়। এই কর্মচারী দু'টিকে দারুকেশ্বর নিজের দেশ থেকে আনিয়ে নিয়েছেন। ভদ্রলোকের ছেলে কিন্তু তেমন লেখাপড়া শেখেনি। না পারে আপিসের কাজ করতে, না পারে লোকের বাড়ির চাকর হ'তে। অথচ প্রত্যেকের ঘাড়ের উপরেই একটি ক'রে সংসার আছে। মা-বোনের সংসারই হোক বা স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সংসারই হোক। রোজগার না করলেই

অনাহার। তাই সুযোগ বুঝে দয়ালু দারুকেশ্বর নিয়ে এসে এই চাকরী দিয়েছেন। চার বেলা খেতে দেন, আবার হাতখরচাও দেন পনেরো টাকা ক'রে। কম কথা নয়। অবিশ্যি চাকর দু'জনকে খাওয়া-পরা বাদেও একজনকে পঁয়তিরিশ আর একজনকে পঁচিশ টাকা ক'রে দিতে হয়, নইলে তারা থাকে না। এক বাড়িই তো নয়, তাদের দশ বাড়ি আছে। গতর খাটালে পয়সার অভাব নেই।

চাকর দু'জনকে যে তিনি সাধ ক'রে এত মাইনে দিয়ে রেখেছেন তা নয়। এখন তাঁর নিজের অবিশ্রান্ত একটি লোক না হলে চলে না। শরীরের তো এই অবস্থা, প্রায়ই অশক্ত হয়ে পড়ে। রাত্রিবেলা কেউ ঘরে না শুলে মৃত্যুভয় হয়। তাই সারাদিন সারাক্ষণ একটি লোককে তিনি চোখের সামনে দেখতে চান, খাটাতে চান, অনর্গল কথা বলতে চান এবং তার মারফৎ সংসারের উনকাটি চৌষট্টি খবরটুকু সংগ্রহ করতে চান। সেই লোকটি তাঁকে স্নানের ঘরে দিয়ে আসে, নিয়ে আসে। রাত্রি বেলা বাথরুমে যেতে না পারলে ঘরের মধ্যেই তার ব্যবস্থা করে দেয়। আরো আছে, বিছানা ঠিক ক'রে দেওয়া আছে, হাতের কাছে সব জিনিস এনে দেওয়া আছে, পঞ্চাশবার দোকানে যাওয়া আছে। বুড়ো বয়সে লোভ হয়েছে খুব। নাতি-নাতনিতে ঘর ঠাসা, লুকিয়ে লুকিয়ে ঠোঙাভরা জিলিপি এনে খেতে হয়, তেলে ভাজা আনতে হয়। অতএব বেশি মাইনে দিতে হলেও এই লোকটাকে রাখতেই হয় তাঁর। আর অন্যটাকেও না রেখে পারা যায় না। এতজন লোকের রান্না-বান্না, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, বড় কম নয়। বৌরা পেরে ওঠে না। চায়ও না। তাছাড়া বড় বৌ, মেজ বৌ বেশীর ভাগ সময়টাতেই পালা ক'রে ক'রে বাপের বাড়ি সন্তান হ'তে চলে যায়। আসে একেবারে পাঁচ-সাত মাস কাটিয়ে। বুড়ো দারুকেশ্বর হিসেব ক'রে দেখেছেন ছানাপোনা নিয়ে যে ক'দিন তারা বাপের বাড়ি গিয়ে থাকে তাতে বাচ্চাদের দুধ থেকে মায়েদের প্রসবের খরচ, খাওয়া দাওয়া সব শুদ্ধু যে খরচটা সংসার থেকে বাদ যায়, তাতে একটা চাকর রাখা চলতে পারে।

বুড়ো দারুকেশ্বরের কলকাতা সহরে বিত্ত আছে কিছু। ভবানীপুরে বড় রাস্তার ধারে বাড়ি আছে তিনখানা, একখানা বৌবাজারে। দু'টি বস্তি আছে, একটি খিদিরপুরে, একটি টালিগঞ্জের সেই চুন সুরকির দোকানের তিন বিঘা জমিতে। তার আয় বড় মন্দ নয়। ফাঁপানো কারবার আছে। লোহার কারখানা। সেখানে নানারকম পাইপ তৈরী হয়, দেশে বিদেশে চালান যায়। ছেলেরা তিনজন সেই কারবারেই খাটে। বড় জন ওভারসিয়ারি পাশ করে ঢুকেছে, মেজ জন ইঞ্জিনিয়ারিং আর ছোটজন ওকালতি। বাণিজ্যের সুবিধার জন্যই ছেলেদের এইভাবে শিক্ষিত করেছেন দারুকেশ্বর। আর তাতে ফলও পাচ্ছেন আশাতিরিক্ত। আগে ব্যবসাটা এত বড় ছিল না, ছেলেরা সব পাশ টাস ক'রে কাজে লাগবার পরই এমন হয়েছে। লক্ষ্মী এসে সোহাগ ভ'রে ধরা দিয়েছেন হাতের মুঠোয়।

অক্লেশে টাকা জমেছে ব্যাঙ্কে। তা জমুক। টাকা জিনিসটার জন্মই জমবার জন্য। ফাই ফুটুনি ক'রে যদি খরচই করবেন, তবে আর এত কষ্ট ক'রে রোজগার করা কেন?

পিতার সঙ্গে এই বিষয়ে ছেলেরাও সম্পূর্ণ একমত। তারাও জীবনে কোনেদিন কোনোরকম বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দেয়নি, দারুকেশ্বরের নিয়মকেই জীবনযাপনের অভ্রান্ত আদর্শ বলে মেনে নিয়েছে।

তারা দেখতে কেউ ভালো নয়। গায়ের রং পেয়েছে মায়ের মতো, চেহারা পেয়েছে দারুকেশ্বরের। কালো রংয়ের মুখের উপর ছোট চোখ আর থ্যাবড়া নাক। দেহ স্থূল। তার উপরে তাদের সাজসজ্জা সেই দেহেরই অনুরূপ। হেঁটো ধুতির তলায় মস্ত মোটা লোমশ পায়ের গোছ প্রায় হাঁটু পর্যন্ত খোলা থাকে। উর্দ্ধাঙ্গের খাটো ফতুয়া আর মাথার কদম ছাঁট চুলে তাদের বিশেষ কোনো জন্তুর মতো দেখায়। কিন্তু এ নিয়ে কখনো তারা মাথা ঘামায় না, আয়না দিয়ে দেখে আঁৎকে ওঠে না। সারাদিন ভূতের মতো খাটে আর পিতার আদেশে ওঠে বসে। তাতেই তারা অভ্যস্ত। তাদের নিজস্ব কোনো যুক্তি নেই, বুদ্ধি নেই, ইচ্ছে নেই, প্রবৃত্তি নেই।

রক্ষণশীল পিতার পুত্র তারা, দারুকেশ্বর তাদের তিন ভাইকে যথেষ্ট কড়া শাসনে মানুষ করেছেন। অবিশ্রান্ত দেখাশুনো করার জন্য তাঁর নিজের চেয়েও একজন কঠোর শিক্ষক নিযুক্ত করে রেখেছেন বারোমাস। ছেলেবেলাকার সেই শাসন বড় হ'য়েও তারা ভোলেনি, সেই অভ্যাস বড় হ'য়েও তাদের ঘোচেনি। এখনো এই বয়সেও পিতার নির্বিচার আনুগত্যেই তারা অভ্যস্ত। তারা কেউ (প্রকাশ্যে) সিগারেট খায় না, সিনেমা দেখে না. মেয়েদের দিকে তাকায় না। মেয়েরা অবিশ্যি তাকায় না। না তাকাক। বিয়ের বাজারে তাই বলে তাদের দর এক কানাকড়িও কম হয়নি। বুড়ো দারুকেশ্বর সাংঘাতিক উঁচু দামেই ছেড়েছেন ছেলেদের। বড় ছেলেকে দিয়ে পেয়েছেন দশহাজার। দানসামগ্রী গয়না-গাটি এসব কিছু অবশ্য নেন নি, সবটাই নগদে ধরে নিয়েছিলেন কারণ জিনিসপত্র আসা মানেই বাড়িতে জঞ্জাল বাড়া, আরামের অভ্যাস হওয়া এবং সে সবের ভোগদখলের স্বত্বও ছেলে-বৌয়ের হাতে চলে যাওয়া। কিন্তু নগদ টাকার ভাগ নেই. সেটা সম্পূর্ণভাবেই দারুকেশ্বরের, যে দারুকেশ্বর ছেলেদের খাইয়েছেন, পরিয়েছেন, লেখাপড়া শিখিয়ে উপযুক্ত করে তুলেছেন। এ টাকা ছেলেদের কাছ থেকে সেই ঋণেরই সামান্য পরিশোধ মাত্র।

মেজ ছেলেকে দিয়ে তার চেয়েও বেশী পেয়েছিলেন। অবিশ্যি সঙ্গত কারণেই পেয়েছিলেন। চেহারা আর চলন বলন দিয়ে আর কে কবে বাঙালী মেয়ের পাত্র নির্বাচন করেছে। হাতে কলমে তাদের যোগ্যতা তো কম নয়? বিয়ের দরবারে তারা বরং একটু বেশীই উপযুক্ত। শুধু যে তারা নিজেরাই উপযুক্ত তা-ই নয় কলকাতা সহরে তাদের না আছে কী? বাড়ি তিনটির ভাড়াই তো পাচ্ছে মাসে তিনশো ক'রে, তার উপরে বস্তি।

সহরের বাবুরা অবিশ্যি মেয়ে নিয়ে এগুলোনা কেউ। কানে শুনে এসে চোখে দেখে

ফিরে গেল সব। তা যাক। সহুরে বাবুদের মেয়ে চানও নি দারুকেশ্বর। সেই সব ইস্কুল কলেজে পড়া মেয়েদের স্বভাব-চরিত্রের ওপর এক ফোঁটাও আস্থা নেই তাঁর। নগরবাসী মেয়েরা যে বিলাসিতায় বারবনিতাদেরও হার মানাতে পারে এ তো তিনি রাস্তায় বেরুলেই দেখতে পান। তারা কি কারো ঘরের বৌ হবার যোগ্য? সুতরাং দুই বৌ-ই তিনি গ্রাম থেকে আনলেন।

এক বৌ এলো বালেশ্বর থেকে, আর এক বৌ নবদ্বীপ। দু'জন কুটুম্বই তাঁর এই মাত্র উঠতি দুই সম্পন্ন গৃহস্থ। এখানে মেয়ে দিতে পেরে তারা বরং কৃতার্থই হলো। দারুকেশ্বর মেয়েদের চেহারার দিকে নজর দিলেন না, বংশের দিকেও না, শিক্ষার দিকে তো নয়ই। দৃষ্টি অর্জুনের লক্ষ্যভেদের মতো যেদিকে একাগ্র ছিলো, সেটা ভালোই হাতে পেলেন। তবু মেয়ে দু'টি এমন কিছু কালোকুচ্ছিত হলো না, বংশমর্যাদায়ও খুব বেশি নিকৃষ্ট হ'লো না। দুটি মেয়ের স্বভাবও বেশ নরম সরম বলেই মনে হ'লো। এত বড়লোক শ্বশুর-পুত্রদের সাজ-সজ্জা চেহারা চলন বলন সংসার দেখে তাদের মনে যে কোনো কিন্তু ভাব হ'য়েছে তা-ও বোঝা গেলো না কোনো ব্যবহারে। শ্বশুরের অপ্রতিহত কর্তৃত্বের অধীনস্থ হ'য়ে কয়েক দিনের মধ্যে তারাও যেন ঠিক সেই বাড়িরই আচার আচরণের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ালো।

ছোট ছেলের বিয়ে হ'লো এদের বছর চারেক পরে। এই বৌ এলো পূর্ববাংলার কোনো এক পড়ন্ত জমিদারের ঘর থেকে। এই ছেলে দিয়ে দারুকেশ্বর আরো বেশী টাকা পেলেন। সম্বন্ধটা দূরে দূরে প্রায় পত্রালাপেই স্থির হ'য়ে গেল। মেয়েও দেখলেন না তিনি। শুনলেন রং কালো। ভাবলেন, কানাখোঁড়া তো আর নয়। আর তা যদি হয়ই, তাড়িয়ে দিলেই হবে। তাঁর ছেলে তো কানা-খোঁড়া নয়, আবার বিয়ে দিতে ক'দিন। তবু মেয়ের দাদা একটা ফটো পাঠিয়ে দিলেন। তারপর একদিন সেই পূর্ব-দক্ষিণ কোণের চৌকো বারান্দায় যেখানে দারুকেশ্বরের ছোট ছেলে এত দিন চট টাঙিয়ে একা ঘুমোতো, সেখানে কাঠের ফ্রেমে ক্যানভাস লাগানো খুপরিতে শাঁখ বাজিয়ে ছোট বৌকে বরণ করা হলো। আসবাবপত্রের মধ্যে তো একটা বড় তক্তপোষ, সেই তক্তপোষটা সহজেই ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে। আর তক্তপোষই যখন ঢুকলো, তখন আর ভাবনা রইলো কী? দড়ি টাঙিয়ে কাপড় রাখো আর চৌকিতে শুয়ে রাত কাটাও। ঘরের তো এই প্রয়োজন। অবিশ্যি ট্রাঙ্ক বাক্সগুলোও রাখতে হবে বৈ কি। তার জায়গাও হ'লো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো সবাই। তিনখানা ঘরের কোন্ ঘরে যে এদের জায়গা দেওয়া হবে তাই নিয়ে ক'দিন থেকে একটু ভাবাভাবি চলছিল। ঘরটা তৈরী হবার পরেও নবদম্পতির পক্ষে ঘরখানা ঠিক হ'লো কিনা এ নিয়ে একটা দ্বিধা ছিলো সকলের মনে। বড় ছেলে ভদ্রতা ক'রে বলেছিলো, 'আমি বরং এই বারান্দায় থাকি, সর্বা নতুন বৌমাকে নিয়ে আমার ঘরে যাক।'

তৎক্ষণাৎ মেজ ছেলে বলেছিলো, 'না, না 'তা কখনো হয়? আপনি কেন যাবেন, আমিই বরং যাই।'

সর্বেশ্বর বলেছিলো, 'কারোকেই যেতে হবে না, এই ঘরই আমার ভলো।'

বৌরা নিভৃতে খেতে বসে বলেছিলো, 'ঐটুকু ঘরে যদি বা ছোট ঠাকুরপো বৌ নিয়ে কোনো রকমে ঢুকতে পারে, তিনচারজন বাচ্চা নিয়ে আমাদের ঢুকতে হ'লেই হয়েছে। তারপর সজনের ডাঁটা চিবোতে, চিবোতে গলা খাটো করে বলেছিলো 'কেন, ঐ বুড়ো গিয়ে থাকুক না বারান্দায়। একটাই তো মানুষ। সেদিকে আঁটো আছে। কেমন সবচেয়ে খোলা মেলা বড় ঘরটা নিয়ে মজা ক'রে ছড়িয়ে আছে। এদিকে দধীচির হাড়, শিগ্‌গির যে ঘর খালি হবে এমন সম্ভাবনাও নেই।'

তক্ষুণি বাইরে খ্‌টখ্‌ট খড়মের আওয়াজে চকিত হয়ে মেজ বৌ তার ফিসফিসে গলা ঈষৎ উঁচু পর্দায় তুলে বললো, 'বাবা যদ্দিন বেঁচে আছেন, তদ্দিনই যা আছি। তাঁর দয়াতেই তাঁর ছেলেরা তবু ক'রে কম্মে খাচ্ছে, আর আমরাও নিজেদের বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে দুই চাকর খাটিয়ে পায়ের উপর পা তুলে আরাম করে আছি।'

বড় বৌ বললো, 'সত্যি, বাবার যখন শরীর এমন তেমন হয় আমার বুকের মধ্যে কী রকম'—খড়মের আওয়াজ বারান্দা বেয়ে বাথরুমে গিয়ে মিশলো।

যাই হোক, ঘরখানা যত ছোটই হোক, দু'জনের শোবার মতো বড় সড় একখানা তক্তপোষ ঢুকে যাওয়ায় নিশ্চিন্ত হ'লো সবাই। কিন্তু বৌকে নিয়ে প্রথমদিন যখন সেই ঘরে রাত কাটালো সর্বেশ্বর, তার যেন কেমন অন্য রকম লাগলো মানুষটাকে। তার মনের জগতে ঠিক এই ধরণের কোনো মেয়ের কল্পনা ছিলো না। বৌদিদের তার এ রকম লাগেনি। মধ্যিরাত্রে ঘুম ভেঙ্গে দেখলো বৌ বিছানায় নেই। অন্ধকারে তাকিয়ে দেখলো, চুপচাপ জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। সারা ঘরে ঐ একটাই জানালা। কিন্তু ঘরের তুলনায় যথেষ্ট বড়। আলো হাওয়ার অবাধ প্রবেশের জন্য স্বেচ্ছাকৃত বড় নয়। ক্যানভাসে কম পড়ে যাওয়ায় দশ ফুট বাই বারো ফুট ঘরের জন্য তিন ফুট বাই দুই ফুট জায়গা ফাঁকা পড়ে রয়েছে। জানালার পাট নেই তাতে, পুরোনো চটের পর্দা আছে একটি।

মধ্যিরাত্রে ঘুম ভেঙে যাওয়াটা সর্বেশ্বরের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। সম্ভব তো নয়ই। সারাদিন খাটে, বাড়ি এসে পেট ভ'রে মোটা চালের ভাত ডাল তরকারী দিয়ে মেখে খায় আর রাত্রিবেলা নিশ্ছিদ্র ঘুম লাগায়। এই তার চিরাচরিত অভ্যাস। যখন ছাত্র ছিলো, পরীক্ষা দিতে হয়েছে, তখনো এই অভ্যাস থেকে চ্যুত হয়নি সে। দারুকেশ্বর রাত জাগতে দেননি ছেলেদের। রাত জাগার বদলে ভোর চারটায় উঠিয়ে পড়া মুখস্থ করিয়েছেন। নাওয়া-খাওয়ার সময়টুকু ছাড়া সারাদিন সেই পড়া মুখস্থই চলেছে। যিনি মাষ্টার ছিলেন, অর্থাৎ গার্জেন টিউটার, তিনি একটি বেত হাতে নিয়ে সতর্ক প্রহরীর মতো পাহারা দিয়েছেন। এই পাহারা শুধু পরীক্ষার সময়েই না বারোমাসই চলেছে তাদের ওপর। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত উদয় অস্ত সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছেন সেই মাষ্টার। যখন স্কুলে যেতো তিন

ভাই, তখনও মাষ্টার মশাই গিয়ে দিয়ে আসতেন তাদের। স্কুলের ঘণ্টাটি না বাজা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতেন তিনি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতেন, যাতে অন্য ছেলেদের সঙ্গে না মেশে, না খেলে, আবার টিফিনের সময় তিনি উপস্থিত। টিফিনের ঘণ্টা না পড়া পর্যন্ত সেই পাহারা। তারপর ছুটি। ছুটিতে বাড়ি নিয়ে এসে নিশ্চিন্ত।

দারুকেশ্বরের এই হুকুম এই নিয়ম। আশ্চর্য তবু এই নিয়ম ভঙ্গ করে বড় ছেলে রোহিতেশ্বর তেরো বছর বয়সেই লুকিয়ে বিড়ি ফুঁকতে শিখেছিলো। ওভারসিয়ারি পড়াকালীন আরো যে সব গুণ একে একে সে আয়ত্ত করেছিলো তার কোনোটাই সুখশ্রাব্য নয়। মেজ জনও বড় জনের আদর্শে বেশ ভালো ভাবেই অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠছিলো, বিয়ে ক'রে অনেক ঠাণ্ডা হ'য়েছে। ঠাণ্ডা অবিশ্যি বড় জনও হ'য়েছে, কিন্তু মিথ্যা কথা বলা বা প্রবঞ্চনা করার নেশাটা তার আজও কাটেনি। আর সেই প্রবঞ্চনা সে তার পিতার সঙ্গেই বেশী করে। বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। দারুকেশ্বরের শাসনের তলা দিয়ে পিঁপড়ে গলবার ছিদ্রটুকুও তিনি রাখতে চাননি, অথচ হাতী গলে গেছে।

শুধু একটা বিষয়েই তাঁর সকল চেষ্টা ষোলো আনার জায়গায় আঠারো আনা সিদ্ধ হ'য়েছে, সেটা হচ্ছে বাপ বিষয়ে ছেলেদের অদ্ভুত ভয়, আতঙ্ক। এখনো এই বয়সেও ছেলেবেলাকার সেই ভয় তাদের কাটেনি, আনুগত্য এতটুকু শিথিল হয়নি। আড়ালে যাই করুক, যাই বলুক, দারুকেশ্বরের সামনে দাঁড়ালেই সব ঠাণ্ডা। এ বিষয়ে বড়, মেজ, ছোট সবাই সমান। বাপকে তারা বাঘের মতো ভয় করে। আর বাপের প্রভাবও তাদের ওপর বড় কম নয়। স্বভাবে চরিত্রে বাপকে তারা একেবারে ব্লটিং পেপারের মতো শুষে নিয়েছে। তাদের জীবনযাপনের পদ্ধতিগুলি পিতারই অনুরূপ। বর্তমান জগতের আবহাওয়াকে তারাও দারুকেশ্বরের মতোই ঘৃণা করে। পয়সা খরচ ক'রে ফুটুনি করাকে সযত্নে পরিহার করে।

ছোট ছেলে সর্বেশ্বরের সঙ্গে তার দাদাদের একটু তফাৎ ছিলো। ঈষৎ অন্যমনস্ক এবং উদাসীন স্বভাব ছিলো তার। সেটা তার পিতার শাসনের সুফল নয়। প্রকৃতিগত ভাবেই সে একটু বেশী শান্ত এবং চুপচাপ মানুষ। যে ভাবে যে নিয়মে সংসার চলছে, সেও কিছু না ভেবেই ভেসে চলেছে সেই স্রোতে। তা নিয়ে আর মাথা ব্যাথা নেই কোনো। ডাল-ভাত দিচ্ছ, তাই দাও। দুধ-ভাত দিলেও খরচের কথা ভেবে সে অস্থির হবে না। বাবা তাকে উকিল বানিয়েছেন, তাই সে হয়েছে। আজ যদি বলেন, সব ছেড়ে দিয়ে ডাক্তারি পড়ো, তাতেও সে প্রশ্ন করবে না কিছু। শুধু একটিমাত্র বিষয়ে সে তার সামান্য প্রতিবাদ জানিয়েছিলো, বিয়ে করতে ইচ্ছে ছিলো না তার। অবিশ্যি বিয়ে দিতেও যে দারুকেশ্বর খুব কিছু উৎসুক ছিলেন, তা নয়। অন্য দুই ছেলেকে বিয়ে দিয়ে দেখছেন তো কী গতিতে জনসংখ্যা বাড়ছে। আর জনসংখ্যা বাড়া মানেই খরচ বাড়া। দারুকেশ্বরের চোখ বেড়ালের চোখ। অন্ধকারেও জ্বলে। সেই অন্ধকারেই দৃষ্টি চালিয়ে দেখেছিলেন বড় দু'জনকে বিয়ে না দিলে তাদের ঘরে রাখা দায় হবে। ব্যবসায়ে মন বসানো কঠিন হবে। তাই পঁচিশ না

পুরতেই এক বছরের আড়াআড়িতে ঘরে বৌ এনে ছেলেদের বাঁধলেন তিনি। আর তাদের খরচ-খরচা বাবদ কুটুম্বদের কাছ থেকে যে টাকাটা তিনি নগদে নিলেন ভেবে দেখলেন, তাতে বৌদের খাওয়া-পরার জন্য তাঁর নিজের পকেটে হাত না দিলেও অনেক দিন চলে যাবে।

ছোট ছেলেকে নিয়ে কোনো ভাবনা ছিলো না তাঁর। তিনি জানতেন, এই ছেলের যদি কোনোদিনও বিয়ে না দেন, তবু তার চরিত্র খারাপ হবার একতিল আশঙ্কা নেই। যা খেতে দেবেন খাবে, যা পরতে দেবেন পরবে, আর যা করাবেন তাই করবে। কিন্তু সম্বন্ধটা এলো হঠাৎ। দারুকেশ্বরেরই এক ব্যবসায়ী বন্ধু কথাটা তুললেন। টাকার অঙ্কটা শুনে মনস্থির করতে সময় লাগলো না দারুকেশ্বরের। কিন্তু সর্বেশ্বরের সময় লেগেছিলো। কেন লেগেছিলো কে জানে, কাজ করতে করতে সে উন্মনা হ'য়ে ভেবেছিলো বিয়ে আমি করবো না। কল্পনায় কোনো মেয়ের ছবি তাকে আকর্ষণ করেনি। যে দু'জন মেয়ে বৌ হ'য়ে এসেছে তাদের বাড়িতে, ঐ রকম আরেকটি মেয়ে এসে সংসারের সংখ্যা বাড়ানো ছাড়া আর যে কী সুখ হবে, ভেবে পায়নি। কিন্তু দারুকেশ্বর ঠিক করলে সে বেঠিক করবে, এতটা সাহস তার ছিলো না, উদ্যমও ছিলো না। দেখতে দেখতে এক জ্যৈষ্ঠের গরমে বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে বসলো সে।

মেয়ের দাদা তখনো পূর্ববাংলার মায়া ত্যাগ করতে পারেন নি। পাকিস্তান হয়ে যাবার পরে সাংঘাতিক গোলযোগের সময় একবার চলে এসেছিলেন বটে বছর খানেকের জন্য বাড়ি তালা বন্ধ করে, মিটে যেতেই ফিরে গেছেন আবার। রহমৎ তাঁর পিতার আমলের বিশ্বস্ত সর্দার, বিপদে আপদে সে-ই পাকা বাঁশের লাঠি নিয়ে বুক ফুলিয়ে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, লুঠতরাজের সময়েও তেমনিই দাঁড়িয়ে থেকে মুসলমান ঠেকিয়ে রক্ষা করেছে, মনিবপুত্রের শূন্য বাড়ি। অবস্থা শান্ত হ'লে সে-ই চিঠি লিখেছে, 'চলে আসুন, কোনো ভয় নেই।'

মুস্কিল বেধেছিলো বিবাহযোগ্যা এই বোনটিকে নিয়েই। নিজের তাঁর নাবালক তিনটি পুত্র। তাদের নিয়ে ভাবনা নেই, কিন্তু যুবতী বোনের চিন্তাতেই তিনি কাতর হ'য়ে পড়েছিলেন। অনেক ভেবে-চিন্তে শেষে গ্রামের বাড়িতে না ফিরে গিয়ে ঢাকার বাড়িতে এসে উঠলেন, চিঠি লিখে দেশ থেকে রহমৎকেও আনিয়ে নিলেন রক্ষক হিসেবে। ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন বোনের বিয়ের জন্য। দিক্‌বিদিকে চর পাঠালেন একটি ভালো সম্বন্ধের খোঁজে। ঈশ্বর দয়া করলেন, মাত্র ছ'খানা পত্রের বিনিময়েই ঠিক হ'য়ে গেল সব। তারপর নিশ্চিন্ত মনে বোনের বিয়ে দিতে সপরিবারে কলকাতায় বেলঘরিয়াতে এক আত্মীয়ের বাড়িতে এসেই উঠলেন। গোলমালের সময় তিনি এই বেলঘরিয়াতেই ছিলেন, চেনা জায়গা।

সর্বেশ্বর তার বাবা এবং দাদাদের সঙ্গে সেজে গুজে সেখানেই বিয়ে করতে এলো। বিয়ের লগ্ন অনেক দেরিতে ছিলো, নববধূকে নিয়ে সে যখন নিভৃত হ'লো রাতের আর

অবশিষ্ট ছিলো না কিছু। সে শুয়ে পড়লো ক্লান্ত হ'য়ে আর নতুন বৌ জানালায় গিয়ে দাঁড়ালো চুপচাপ। বাসি বিয়ের দিন তো অমনিই গেল। ভালো ক'রে দেখা হ'লো শুভরাত্রির দিন। (শুভরাত্রিও তার শ্বশুরবাড়িতেই হ'য়েছিলো। নিজের বাড়িতে ঐ সব ঝামেলা দারুকেশ্বর কোনো ছেলের-বিয়েতেই করেন নি।) সেদিন সর্বেশ্বরের বুকটা থরথর ক'রে কেঁপেছিলো। ঢাকাই শাড়িপরা স্বল্প ঘোমটা স্ত্রীকে ভীষণ ভালো লেগেছিলো। আগ্রহ ভরে সে তাকিয়েছিলো তার দিকে, ভাবছিলো কী কথা ব'লে আলাপ শুরু করবে, কিন্তু মেয়েটি সেদিনও তেমনি জানালায় গিয়ে দাঁড়ালো। যখন রাত বাড়লো গম্ভীর মুখে ধীরে ধীরে শুয়ে পড়লো এসে। প্রতীক্ষারত সর্বেশ্বর জেগে থেকেও কিছু বলতে সাহস পেলো না। কেবল মোটা শরীরটা নিয়ে কড়া গন্ধ তেল মাখা ছাঁটা মাথাটা (গন্ধ তেলটা বিয়ের জন্য কেনা) দুলিয়ে একবার উঠলো, একবার বসলো, একবার এ পাশ ফিরলো একবার ও পাশ ফিরলো এই ক'রে ক'রে শেষে ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুমের ব্যাঘাত তার সেই প্রথম।

নিজের বাড়িতে এসে একটু সাহস বেড়েছিলো। প্রথম রাত্রে ছোট বৌ ঘরে আসবার আগেই প্রতীক্ষা করতে করতে কখন জানি তন্দ্রা এসে গিয়েছিলো তার। কিন্তু ভেঙে গেলো চট করে। তাকিয়ে সেদিনও বৌকে জানালায় দেখে উঠে বসলো তাড়াতাড়ি, তক্তপোষ থেকে নামলো, এগিয়ে এসে পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে বললো, 'এই যে, মানে, আমি—আমি বলছিলাম কি'—

ফিরে তাকালো ছোট বৌ। আবছা অন্ধকারে স্পষ্ট করে তাকালো স্বামীর দিকে তারপর আবার নিঃশব্দে ফিরিয়ে নিল মুখ। সমস্ত সাহস ফুৎকারে নিবে গেল সর্বেশ্বরের। দাঁড়িয়ে থেকে ঘাম জমলো তার।

কিন্তু সর্বেশ্বরের যাই মনে হোক না কেন, বাইরে থেকে ছোট বৌকে কিন্তু অন্য রকম কিছু লাগলো না। কেবল অন্য বৌদের তুলনায় একটু নির্লজ্জ। ভাসুরদের দেখলে তেমন করে ঘোমটা টেনে দেয় না, নির্ভয়ে শ্বশুরের ঘরে যায়। আরো একটু পুরোনো হলে, দেখা গেল দরকার মতো এটা-ওটা কিনতে বাইরে যাবারও বেশ অভ্যাস আছে। কেনার দরকার না থাকলে বিকেলে বাচ্চাদের হাত ধরে কাছেই কোনো ফাঁকা জায়গায় বেড়িয়ে আসে। তার জন্যও কারো অনুমতির অপেক্ষা রাখে না।

এ নিয়ে বাড়িতে আলোচনা শুরু হ'তে দেরি হ'লো না খুব। বড়বৌ মেজবৌ গুরুজন হিসেবে তা নিয়ে একটু আধটু শাসনও করলে, একথাও জানিয়ে দিলে শাশুড়ির অবর্তমানে তারাই তার অভিভাবক, তাদের কথাই তার একান্তভাবে মান্য করা উচিত। সব শুনে ছোট বৌ হাতের কাজ থামিয়ে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকলো একটু, তারপর দৃষ্টি নামিয়ে অসমাপ্ত কাজ শেষ করলো। কিন্তু তারপরেও তাকে শোধরাতে দেখা গেলো না।

সুতরাং বিষয়টা অবহেলার যোগ্য নয়। এক কান দু কান হয়ে দারুকেশ্বরের কানেও পৌঁছুলো কথাটা। তারপর কোনো এক রাত্রে বাড়ি নিঃশব্দ হ'লে, অতি নীরবে একদিন তিনি ছোট ছেলের দরজায় এসে টোকা দিলেন। ভিতর থেকে সর্বেশ্বর বললো, 'কে, কী চাই?'

দারুকেশ্বরের গলা জলদগম্ভীর হ'লো, তিনি বললেন, 'আমি। খোলো।'

সর্বেশ্বর এবার সন্ত্রস্ত হয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো, কম্পিত গলায় বললো, 'আপনি!' দারুকেশ্বর জবাব দিলেন না। চুপ করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। সর্বেশ্বরের চিরদিনের কদমছাঁট চুলগুলো হঠাৎ যেন বড্ড বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে হ'লো তাঁর। তিনি দেখলেন সেগুলো আর আগের মতো পাপোষ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকছে না মাথার জমিতে, কপাল বেয়ে নেমে আসতে চাইছে চোখের পল্লব ছুঁয়ে। পায়ে কাঠের খড়মের বদলে চামড়ার নূতন স্যাণ্ডেল, পরনের ধুতিটির বহর পায়ের পাতার কাছাকাছি, গায়ে ফতুয়ার বদলে ফর্সা পাতলা গেঞ্জি। প্রায় চেনা যাচ্ছে না, আগের সর্বেশ্বর বলে। বিশ্রী মোটা গড়নটা যেন অনেকটা ছিপছিপে দেখাচ্ছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত বার কয়েক দেখলেন তিনি, তারপর ঘরের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে গিয়ে উড়ন্ত পর্দা নাকে লেগে বাধা দিল। (আবার পর্দা! হায়! হায়! যাবেন কোথায়?) আর তারই ফাঁকে লক্ষ্য করলেন খাকি রংয়ের ক্যানভাসগুলোকে ধবধবে সাদা রং দিয়ে ঠিক দেয়ালের মতো চেহারা করা হ'য়েছে আর তারই তলায় এই রাত্রিবেলা বৌমা একখানা আয়নার কাছে বসে চুল আঁচড়াচ্ছে। সেই আয়নাটি এক বিঘৎ লম্বা আধ বিঘৎ চওড়া, কেমিকেল ফ্রেমের আয়না নয়, যে আয়না দেয়ালের পেরেকে লট্‌কে থেকে মুখ দেখায়। বেশ বড় সড় হেলান দিয়ে বসানো আয়না।

একটি কথা বললেন না, যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন, তেমনি নিঃশব্দে ফিরে গেলেন। ডাক পড়লো পরের মাসের পয়লা তারিখে।

'আজ্ঞে, আমাকে ডেকেছেন?' অবনত ছোট পুত্র পিতার চোখের তলায় এসে দাঁড়ালো নম্র হয়ে।

'হ্যাঁ।' দারুকেশ্বরের গলা আগুনের মতো।

'বলুন।'

'কোর্ট থেকে ফিরলে?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'আজকে তোমাদের মাইনে নেবার তারিখ, জানো বোধ হয়?'

'আজ্ঞে, জানি।'

'রোহিতেশ্বর আর মহেশ্বর তাদেরটা পেয়ে গেছে।'

একটু চুপ করলেন, 'আমার মনে হচ্ছে, তোমার নিজের উপার্জনই তোমার পক্ষে যথেষ্ট, আমায় আর আলাদা ক'রে দেবার দরকার নেই।'

'কী বলছেন?' সর্বেশ্বর বুঝতে পারলো না কথাটা।

বলছিলাম, 'তোমার আয় তো আজকাল বেশ ভালোই হয়, তবে আর মিছিমিছি আমার কাছ থেকে নিচ্ছ কেন?'

অবাক হ'য়ে দারুকেশ্বরের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালো সর্বেশ্বর। নেহাৎই ওকালতি পাশ করেছে, নিয়ম রক্ষার্থে যেতেই হয় কোর্টে, নামটা রাখতেই হয়। কিন্তু তেমন উঠে-পড়ে লেগে কি প্র্যাকটিস ক'রে নাকি সে? সময় কোথায়? ব্যবসা-বাণিজ্যের ঝামেলাতেই তো ব্যস্ত থাকতে হয় সারা বছর। নিজেদের কারবারেরই বাঁধা উকিল সে। দারুকেশ্বর তাকে দিয়ে 'হয়' কে 'নয়' করাচ্ছেন আর 'নয়' কে 'হয়', 'দিন' কে 'রাত' করাচ্ছেন, আর 'রাত' কে 'দিন'। একে ঠকাচ্ছেন, ওকে ঠকাচ্ছেন, ভাগীদারদের দিচ্ছেন না তাদের ন্যায্য অংশ, অন্যায় ক'রে ফ্যাসাদে পড়ছেন, আর মুক্তি পাচ্ছেন। আর তার জন্য ছেলেকে বেঁধে রেখেছেন একশো সাত টাকা মাইনে দিয়ে। সাত টাকা তার যাতায়াতের খরচ, বাকীটা মাইনে। খাওয়াটা অবিশ্যি ফ্রি। থাকারও সিট-রেন্ট নেই।

সেই একশো টাকাতে আজকাল আর চলতে চাইছে না সর্বেশ্বরের। কোথাও যেতে হলে সেই টাকা থেকেই খরচ করতে হয়, যতো অল্প মূল্যেরই হোক, জামা-কাপড়ও কিনতে হয় তা থেকে, জলখাবারের খরচটাও নিজের। আবার কেমন ক'রে একটু বারে বারে চা খাবার বদভ্যাস হ'য়েছে। আর বাবা বলছেন তার নিজের উপার্জনই যথেষ্ট, মাইনে না নিলেও চলবে। বলছেন কী। বিয়ের আগে বলেছিলেন, বিয়ের পরে দশ টাকা বাড়িয়ে দেবেন, কী কারণে বিরূপ হয়েছেন কে জানে, সে কথাও রাখেন নি তিনি। ওকালতিতে কোনো মাসে ষাট, কোনো মাসে সত্তর পেলে যথেষ্ট। বরং সেদিক থেকে দাদারা ভালো আছে তার থেকে। বাবা তাদের দিচ্ছেন, দুশো করে, বেশীর ভাগ সময়েই তারা কলকাতার বাইরে থাকে, সেজন্য ট্যুরিং এলাউন্সও আলাদা আছে। তার উপরে কেনাকাটার ব্যাপারে দুই দাদাই বেশ 'ইয়ে' করে। সর্বেশ্বর জানে বাবার কাছে ওরা যতই বিনীত হয়ে থাকুক, আর ভক্তি শ্রদ্ধা দেখাক, যা তা বলে হিসেব বোঝাতে ওদের জুড়ি নেই। আগে, শরীর সমর্থ থাকতে দারুকেশ্বর নিজে নিয়মিত কারখানায় যেতেন, একটি পয়সা তাঁর গরমিল হতো না। কিনতে কাটতে নিজেই বাইরে যেতেন, এখন আর পারেন না। কাজেই সম্পূর্ণ ভাবেই ছেলেদের উপর নির্ভর ক'রে থাকতে হয়। আর হয় বলেই ছেলেরা যা বোঝায় বিশ্বাস না করলেও মেনে নিতে হয়।

বেশী চাপাচাপি করলে আবার তারা সবিনয়ে পদত্যাগ-পত্র দিতে চায় আজকাল। উকিল না হলে চলে, ইঞ্জিনিয়ার অপরিহার্য। তা ছাড়া ঘরের ছেলে, ব্যবসাটা নিজেদের, প্রাণ দিয়ে তারা খাটে, প্রাণ দিয়ে রক্ষা করে নিজেদের বিষয়-সম্পত্তি, একটা বড় অর্ডার পাবার জন্য সব তুচ্ছ করে ছুটে যায় কোথায় কোথায়। এ কথা আর কে না জানে, এর সর্বময় কর্তা একদিন তারাই হবে। সত্যি বলতে দারুকেশ্বর আর ক'দিন। তাই বাপকে তারা যেমন নরমে গরমে রাখে, বাপও তাদের তাই করেন। নরম গরমটা সর্বেশ্বরেরই শুধু

ভালো আসে না। বাপকে ভক্তি-শ্রদ্ধা কতটা করে তার হিসেব সে করে দেখেনি, কিন্তু ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভালোও বাসে, প্রবঞ্চনা করবার কথা কল্পনা করে না। মাঝে মাঝে যখন ব্লাডপ্রেসারের অতিবৃদ্ধিতে দারুকেশ্বর মরণাপন্ন হন তখন তার চোখে যে জল আসে তার মধ্যে মেকি নেই কোনো। দাদারা যখন মাথার কাছে দাঁড়িয়ে প্রায় শব্দ করে কেঁদে পাশের ঘরে এসেই জিজ্ঞাসা করেন, 'কী রে সব্বা, মস্ত তো বিদ্বান হয়েছিস, নাড়ী দেখে বলতো, বুড়ো ঠিকই এবার টেঁসবে, না আবার উঠে বসে হিসেবপত্র মেলাবে?' তখন দাদাদের উপর সে রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়। আজকে দারুকেশ্বরের এই অদ্ভুত প্রশ্নে অনেকক্ষণ স্তম্ভিত থেকে বললো, 'আমার আবার আয় কী?'

দারুকেশ্বর বললেন, 'কেন, তুমি তো রোজ বাড়ির ভাত খেয়ে আলিপুর যাচ্ছ, ফিরে আসছো সন্ধ্যায়। গিয়ে তো আর ঘোড়ার ঘাস কাটো না। সত্যি সত্যি কত টাকা তুমি রোজগার করো ওকালতি করে, সেটা আমার জানা দরকার।'

'আপনি তা জানেন।'

'কী ক'রে জানবো? তুমি যখন ফিরে আসো আমি তোমার পকেটে হাত দিয়ে সার্চ করি না যে, চুপে চুপে কি নিয়ে আসো, জানতে পারবো সেটা?'

আহত হ'লো সর্বেশ্বর, গম্ভীর থেকে বললো, 'ওকালতিতে পসার জমাতে হ'লে তার কতোগুলো আয়োজন আছে। আমার কোনো চেম্বার নেই, বই নেই, নিজেদের ব্যবসায় আছি বলে তেমন সচেষ্ট হ'য়ে উপার্জন করবার সময় বা মনোযোগ কোনোটাই নেই। কাজেই কোর্ট থেকে ফিরলেই যে পকেট আমার বোঝাই হ'য়ে উঠবে না, সেটা কি না জানা বিষয়?'

দারুকেশ্বর এবার আসল কথায় এলেন, 'তা বড়লোকের মতো ঘরের রঙিন পর্দা যখন ফুর ফুর ক'রে বাতাসে ওড়ে, ক্যানভ্যাসে দেয়ালের রং ওঠে আর রাত করে মুখ দেখার চকচকে আয়না ঝিলিক দেয় তখন তো তোমাকে খুব শূন্যগর্ত বলে মনে হয় না সর্বেশ্বর!'

'ও, এই কথা!' সর্বেশ্বর ঢোক গিললো, 'ও-সব আমি—মানে আমি ও-সব কিনিনি।'

'হুট হুট ক'রে বেরিয়ে গিয়ে তোমার বৌ যে নিজেই হাট বাজার ক'রে সে সব কিনে নিয়ে আসতে পারেন, তা আমি জানি, কিন্তু টাকাটা তিনি পান কোথায় সেটাই আমার জানা দরকার। আসা করি তুমিই দাও।'

সর্বেশ্বর চুপ।

'মেয়েছেলের কথায় ওঠো বসো, লজ্জা নেই তোমার?'

সর্বেশ্বর চুপ।

'শাসন করতে পারো না? বলতে পারো না, এটা গৃহস্থের বাড়ি।'

চুপ।

'আর মাথার চুলগুলো? ওগুলো অত বড় করেছ কেন? ঘর সাজাতে যত পয়সা লেগেছে, চুল না ছেঁটে তা উশুল করবে বুঝি? নাপিতের চার আনা বাঁচিয়ে চারশো টাকার

আসবাব কিনবে, না? আর বাবু বহরের কোকিল পাড় ধুতি,—'

দরজার দিকে তাকিয়ে, হঠাৎ থেমে গেলেন দারুকেশ্বর। ধীর পায়ে ছোট বৌ এসে ঘরে ঢুকলো। হাতে কাঁসার থালার ওপর বসানো শ্বশুরের বৈকালিক আহার। দুধ, কলা, মুড়ি। বৌটির বেশ ফিটফাট চেহারা, রং ময়লা, কিন্তু মুখশ্রী সুন্দর। এইমাত্র স্নান করে এসেছে, ঈষৎ সুগন্ধ ভাসছে বাতাসে। খাবারটা সামনে একটা টুলের উপর নামিয়ে রাখলো সে। মাথায় আধো ঘোমটা, স্বামীকে দেখে সে ঘোমটা একটুও নামলো না যেটা অন্য বৌরা সর্বদাই ক'রে থাকে, উপরন্তু দরজার কোণে দাঁড়িয়ে থাকা দারুকেশ্বরের আলাদা ভৃত্য নিবারণকে স্পষ্টগলায় ডাকলো, 'নিবারণ!' হুকুমের স্বরে বললো, 'এখনো ঘর পরিষ্কার করো নি যে?'

'আজ্ঞে, কত্তাবাবু কথা বলতিছিলেন।'

'তোমার সঙ্গে বলছিলেন?'

'আজ্ঞে না।'

'তা হ'লে তুমি দাঁড়িয়ে কী শুনছো?'

'আজ্ঞে—মানে—'

'তোমাকে এর আগেও একদিন বলেছি, আজ আবার বলছি বেলা চারটের মধ্যে এ ঘর তুমি পরিষ্কার ক'রে রাখবে। এটা আপিস এখানে লোকজন আসে। যাও, আর যেন কখনো বলতে না হয়।'

খাবারের থালাটা ছোট বৌ টেবিলের উপর রাখলো। নিবারণ সভয়ে দ্রুত হাতে গোছগাছ করতে মন দিল।

কিংকর্তব্য সর্বেশ্বর আড়চোখে স্ত্রীর দিকে একপলক দেখেই সরিয়ে নিল চোখ, তারপর একবার এদিকে তাকালো, ওদিকে তাকালো, ঠোঁট চাটলো জিব দিয়ে, শেষে গলা বন্ধ কালো কোটের বোতামটা খুঁটতে লাগলো। আর তার বাবা দুর্দান্ত দারুকেশ্বর ভালোমানুষের মতো খাবারের থালাটা কাছে টেনে নিয়ে দুধের বাটিতে কলা চটকাতে চটকাতে বললেন 'ঠিক আছে যাও। এ মাসের মাইনে আমি তোমাকে দেবো কিন্তু তুমিও একটু সাবধান মতো চলাফেরা করো।' সর্বেশ্বর তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করলো।

সেদিন রাত্রিতে শুতে এসে ছোট বৌ স্বামীর দিকে খানিকক্ষণ নিঃশব্দে তাকিয়ে হাসলো একটু। চোখ থেকে চোখ সরিয়ে ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে সর্বেশ্বর বললো—কী?'

'কিছু না।'

'কী যেন ভাবছিলে?'

'তোমার সমস্যার কথাটা ভাবছিলাম।'

'আমার সমস্যা? আমার আবার সমস্যা কী?'

'প্রত্যেক মানুষেরই যেমন একটা আলাদা রক্ত-মাংসের শরীর আছে, একটা আলাদা মনও আছে সেই মনটা বোধ হয় তুমি খুঁজে পাচ্ছো না।'

'এ্যাঁ, কী!'

'অন্যের ইচ্ছার ছায়া হ'য়ে বেঁচে থাকা, সেও এক রকমের মৃত্যু।'

'মৃত্যু!'

'বলছি, সাবালক হও।'

'কী!'

'বয়সটাই বেড়েছে, মানুষটা এখনো বড় হওনি।'

ছোট বৌ যথারীতি অন্যদিনের মতো আয়নার সামনে গিয়ে চুলে বেণী পাকাতে বসলো। স্ত্রীর এসব রহস্যপূর্ণ কথা সব সময় বুঝতে পারে না সর্বেশ্বর। রাগ হয়, ভয় হয়, সম্ভ্রম হয়। সর্বেশ্বর তাকিয়ে তাকিয়ে স্ত্রীর চুল আঁচড়াবার ভঙ্গি দেখতে দেখতে আজ ভারি অস্থির বোধ করলো। সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়লো সে। ভাবতে চেষ্টা করলো, তার দাদাদের ঘরে তার বৌদিরাও এই সময়ে ঠিক এই রকম ক'রেই কথা বলছে কিনা। ভাবতে চেষ্টা করলো এই বৌটির সঙ্গে সেই দু'টি বৌ-এর কোথাও কোনো মিল আছে কিনা। সে নিশ্চিত জানে নেই। সে জানে রাত দশটার অন্তরঙ্গ ঘরে তারা দু'জনের একজনও এখন জেগে থেকে এই ভাষায় কথা বলছে না স্বামীর সঙ্গে, এমন সুন্দর ব্যবধান রচনা ক'রে কষ্ট দিচ্ছে না তাদের। আলো জ্বালিয়ে আয়নার কাছে বসে চুল বাঁধবার কথা কল্পনায়ও আনছে না তারা। স্ত্রীলোক হ'য়ে রাত্রিবেলা যে আয়নায় মুখ দেখতে নেই একথা তারা জানে, মানে। সর্বেশ্বর দেখেছে রাত্রিবেলা বৌদিরা আয়নাগুলো ঢেকে রাখে। ছেলেবেলায় দিদিকেও তাই করতে দেখেছে সে। শুধু মনে পড়ে অনেকদিন আগে মা নামক একজন মানুষ ছিলেন এই বাড়িতে, তিনি বেলা পড়তেই দিদির চুল বেঁধে দিতেন, গামছা দিয়ে মুখ মুছিয়ে টিপ পরিয়ে দিতেন। তারপর একদিন তিনি কোথায় চলে গেলেন, বদলে একজন দাসী নিয়ে এলেন বাবা, সেও তেমনি ক'রে চুল বেঁধে দিত দিদির। সন্ধ্যার পরে কখনো কোনো কারণে দিদি আয়নায় মুখ দেখলে বলতো, 'সূর্যদেব পাটে বসেছেন না? এখন কি ওরকম মুখ দেখতে হয়? তাছাড়া রাত্রিবেলা ওরকম আয়নায় মুখ দেখে কারা সাজে বলো তো?'

'কারা সাজে?' মনে মনে ভাবতো সর্বেশ্বর। উত্তর খুঁজে পেতো না। বড়ো হ'য়ে জেনেছে সে কথা।

তারপর কতদিন চলে গেছে, ভুলে গেছে সে সব দিন, বছরের পর বছর কেটে গেছে এক স্ত্রীলোকহীন সংসারে। তারপর আবার বৌদিরা এলো। আবার তারা বেলা পড়তেই দিদির মতো করে দাঁতে ফিতে চেপে চুল বাঁধতে বসলো শক্ত ক'রে; তারপর গা ধুয়ে

প্রসাধন। শুধু ছোট বৌ-ই সংসারের সব নিয়মের ব্যতিক্রম। বিকেলে সে চুল বাঁধে ঠিকই, কিন্তু সে অন্যরকম বেণী ক'রে বাঁধে রাত্রিবেলা, ঠিক শোবার আগে। ছোট বৌ কেমন সকলের চেয়ে আলাদা—

শুয়ে শুয়ে আরো অনেক কথা ভাবে সর্বেশ্বর। ছেলেবেলার কথা ভাবে, ছাত্রবেলার কথা ভাবে, উপার্জনের কথা ভাবে। বাবা আজ তাকে যে-সব কথা বলেছেন, সে সব কথার মর্মার্থও গ্রহণ করতে চেষ্টা করে মনের মধ্যে। বাবার আদর্শের সঙ্গে ইদানীং তার জীবনযাপন পদ্ধতির যে একটু গরমিল দেখা দিয়েছে সে-কথা সে নিজেই বুঝতে পেরেছে। শিক্ষাদাতা হিসেবে দারুকেশ্বরকে সে কোনোদিন বিশ্লেষণ ক'রে দেখেনি। অন্ধের মতো মান্য করেছে, অনুসরণ করেছে। দারুকেশ্বর চিরদিন তাদের বুঝিয়েছেন, শিখিয়েছেন, কাপড় পরতে হয় লজ্জা নিবারণের জন্য, খেতে হয় ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য, আর ঘুমিয়ে পড়তে হয় বিশ্রামের জন্য। এর মধ্যে কোনো বাহুল্যের জায়গা নেই জীবনে। এমন একটা কথা বলবার সাহসই তাদের কোনোদিন হয়নি, যে বলবে এ ধুতিটা চাই না সে ধুতিটা চাই, এটা বড় মোটা অথবা সেটা বেঁটে। এ পাড়টা ভালো না বা এ রংটা বিশ্রী। বলবার কথা ভাবতে পর্যন্ত ভুলে গেছে। খাওয়া বিষয়েও ঠিক তাই। খাবে খাও। পেট ভরলেই হ'লো, তা নিয়ে আবার খুঁত খুঁত কী? কাঁড়ি কাঁড়ি মাছ মাংস খেয়ে পয়সা খরচ ছাড়া আর কী মোক্ষলাভ হয়, কেবল জিহ্বাকে ছোটলোক বানানো। স্বাদের জন্য তো নুনই আছে। নুন ভাতই যথেষ্ট, তবু তো দারুকেশ্বর রোজ কিছু না কিছু তরকারী আনান বাজার থেকে, ডাল কেনেন। এমন কি কোনো কোনো দিন তেল খরচ ক'রে ঢেঁড়স ভাজাও হয় ডালের সঙ্গে মুখে দিয়ে খাবার জন্য। এরপর আর কী চাই। যদি কেউ চায়, সেটার নামই লোভ, সেটার নামই বিলাসিতা। সেই রিপুকে যতো প্রশ্রয় দেবে ততোই সে আগুনের মতো লক্‌লকিয়ে বেড়ে উঠে সর্বনাশ করবে গৃহস্থের। পাপে ছেয়ে যাবে সংসার।

অবিশ্যি এ নিয়ম দারুকেশ্বর নিজের উপর খাটান না, বয়েস হয়েছে একটু বেশী খাওয়া তাঁর দরকার, একটু এটা ওটা দিয়ে ভোঁতা রসনাকে শাণিত করা প্রয়োজন। তাই তিনি না হয় নিবারণকে দিয়ে যখন তখন যা তা আনিয়ে খান। রক্ত যাদের গরম, সেই সব জোয়ানদের কথা ওঠে কিসে?

আর বিশ্রাম! খালি তক্তপোষ তো পড়েই আছে ঘরে ঘরে, গড়াও না যতো খুশি। (গরম কালে তক্তপোষেরই বা দরকার কী? মেঝেতেই আরাম। তবু একটু বিশ্রাম পাবে চৌকিটা, আর একটা বছর বেশী টিকবে।)

কিন্তু তাই বলে তক্তপোষের উপর বিছানা পাততে পারবে না দিনের বেলা। দারুকেশ্বর অবিবেচক নন, রাত্রিবেলার জন্য তিনি ছেলেদের তোষকও দিয়েছেন, বালিশও দিয়েছেন, চাদরও দিয়েছেন। কিন্তু দিনের বেলা সে সব ছোঁবার নিয়ম নেই। সকালে ঘুম

ভেঙে উঠেই বৌরা সেগুলো পরিপাটি ক'রে ভাঁজ করে, তারপর যার যার ঘরের এক কোণে টুল বা ট্রাঙ্কের উপর একটা পুরোনো কাপড় চাপা দিয়ে রেখে দেয়, দারুকেশ্বরের বিছানা তোলে নিবারণ। এই বুড়ো শরীর নিয়ে তিনিও সারাদিন ঐ শক্ত তক্তপোষেই গড়াগড়ি করেন। বেশী ব্যবহারে সব জিনিসেরই আয়ু কমে, তোষকটা ফেটে যায় যদি। যদি বালিশটার তুলো বেরিয়ে যায়। তখন? তখন সেই খেসারৎ দেবে কে? অবিশ্যি তোষক বালিশ দারুকেশ্বর শেষ যে কবে করিয়েছিলেন, চেষ্টা করেও মনে আনতে পারেন না। ছেলেদের বিয়ের পর বৌরা যার যারটা তারা নিজেরা নিয়ে এসেছে বাপের বাড়ি থেকে, দারুকেশ্বর বেঁচে গিয়েছেন।

স্ত্রীর মৃত্যুর বছর চারেকের মধ্যেই মেয়েটিকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন দারুকেশ্বর, তারপর থেকে এই তিন ছেলে নিয়ে আছেন তিনি। মেয়ে বড়ো একটা আসে না বাপের বাড়িতে। তার ছেলেমেয়ে আছে কয়েকটি, সব ক'টিকে নিয়ে এলে দারুকেশ্বর বিরক্তি বোধ করেন। মেয়ে একা এলে তাঁর আপত্তি নেই, দু'-একদিনের জন্য জামাই এলেও না হয় চলতে পারে। আর দশজনের সঙ্গে মেয়ে-জামাইয়ের জন্যও না হয় দু'মুঠো বেশী ডাল-ভাত খরচ করা যাবে। কিন্তু শিশুদের ভিড় অসহ্য। সারাদিন ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান তো আছেই, তার উপর খাওয়া দাওয়ার ধুম কতো! ওদিকে ভাতও খাবে, সেদিকে দুধও খাবে আর জিনিসপত্র নষ্ট করবে না বুঝি? এটা ধাম্‌সাবে, ওটা মটকাবে, সারা বাড়ি উথাল-পাথাল। দেখছেন তো ছেলেদের ধুরন্ধরগুলোকে। বড় ছেলে দু'জনও তাতে বিরক্ত হয়, তারাও অকারণে এত খরচ পছন্দ করে না।

কেবল সর্বেশ্বরই এ বিষয়ে একটু দুর্বল। দিদির উপর তার টানটা একটু বোকার মতো। অবিশ্যি অন্য বিষয়ে বাবার মতামতের ওপর তার কোনো আপত্তি নেই। দাদাদের মতো সে-ও বাপের কারবারে খেটে আর বাপের হোটেলে সাপটে ডাল-ভাত খেয়ে সুখেই আছে। মূঢ়ের মতো সংসারের আর পাঁচজন সাজের পুতুলের দিকে ফিরেও তাকায়নি। হেঁটো ধুতিতে লজ্জা ঢেকে তক্তপোষের কঠিন কাঠে গড়িয়ে কোনো অভাববোধও পীড়িত করেনি হৃদয়কে। কিন্তু বিয়ের পরেই যেন ছবিটা পালটে যাচ্ছে ক্রমশ। ছিপ্‌ছিপে কালো মেয়েটির কাছে নিজেকে কেমন যেন অশোভন মনে হচ্ছে, অদ্ভুত লাগছে। ছোট বৌ যখন রাত্রিবেলা ঘুমুতে এসে গম্ভীর মুখে তার থেকে অনেক দূরে শুয়ে পনেরো পাওয়ারের মিট্‌মিটে আলোয় কোনো একটা বই পড়ে মন দিয়ে, তার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ছট্‌ফট্ করে সর্বেশ্বর। নিজের স্ত্রী, তবু ভয় করে কাছে যেতে। যত ভয় করে, তত ইচ্ছের জোর বাড়ে, তত সে বুকের মধ্যে অদ্ভুত একটা ভালোবাসার যন্ত্রণা অনুভব করে। তেল চুকচুকে ছাঁটা চুলে কারণে অকারণে চিরুণী চালায় (যা সে আগে কখনো করেনি) ঢোলা ফতুয়াটাকে এদিকে টানে, ওদিকে টানে, খাটো ধুতির মোটা কোঁচাটাকে গোঁজে আর খোলে। আর তারপর চকিতে দেয়ালের বড় আয়নাটাতে নিজের দিকে তাকিয়ে নিজের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে।

কিন্তু সেই বেঁটেখাটো লোমশ স্বামীটির দিকে ভুলেও ফিরে তাকায় না ছোট বৌ, যেন সমস্ত ঘরটার মধ্যে সে ছাড়া আর কারো কোনো অস্তিত্ব নেই এমনি তার ভাব। শেষে একদিন মরিয়া হয়ে সর্বেশ্বর আলো নিবিয়ে দিয়ে চুম্বন করলো স্ত্রীকে, নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ ক'রে রুদ্ধ স্বরে বললো, 'জানি, তুমি আমাকে পছন্দ করো না, ভালবাসো না, কিন্তু বলতে তো পারো কী করলে তোমার মন পাবো?' বিবাহের পুরো তিন মাস পরে ছোট বৌ সেই প্রথম স্বামীর সান্নিধ্যে ধরা দিল। প্রেমে ভরা দুটি মাংসল কালো হাতের বন্ধনে বুকের অন্ধকারে মুখ রেখে সে স্থির হয়ে রইলো।

সকালবেলা বললো, 'আমার একটা কথা রাখবে?'

রাখবে না! ছোট বৌ বললে সর্বেশ্বর কী না পারে? আকাশের চাঁদ এনে দিতে বলো না, সমুদ্র সাঁতরে পার হতে বলো না, বলো না পর্বত ডিঙোতে, আগুনে ঝাঁপ দিতেই বা আপত্তি কিসের। অস্থির হ'য়ে গেল সেই কথা রাখবার ইচ্ছেতে। কাল রাত্রে একটা উত্তাল ঝড় বয়ে গেছে তার জীবনে। তার ঝাপ্টায় এখনো যেন কাঁপছে সে ভিতরে ভিতরে। কোমরে আঁটা লুঙ্গিটা একবার খুললো, একবার পরলো, তিনবার কাসলো, তিনবার এগুলো, দ্রুত গলায় বললো, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেন রাখবো না, রাখবো।'

'আজকে তুমি চুল ছাঁটতে যেয়ো না।'

'এ্যাঁ, চুল! ও, আজ বুঝি চুল ছাঁটবার তারিখ? দাদারা ছাঁটছে বুঝি? আমাকে ডাকছে বুঝি?'

এ বাড়ির সব কাজ নিয়ম বাঁধা। ছেলেরা যে চুল ছাঁটবে, তারও তারিখ ঠিক করা আছে। মাসে একবার। প্রায় ন্যাড়া হয়ে যায় সেদিন। চিমটি দিয়েও ধরা যায় না সে চুল। তারপর এক মাস পুরতে মাথার মাঝখানটা খাড়া খাড়া হয়ে ওঠে, ঘাড়ের দিকে চুল লম্বাটে হয়ে বেয়ে নামে, জুলপিটা বিশ্রীভাবে গালে সুড়সুড়ি দেয়। খিদিরপুর বস্তি থেকে বুড়ো হারাণ নাপিত এসে ছেঁটে দিয়ে যায়, পয়সা লাগে না।

তারিখটা ভুলে গিয়েছিলো সর্বেশ্বর। ভুলবারই কথা। আজও যদি সবকিছু ভুলে না যায় আর ভুলবে কবে। কাল রাত্রের সুখ সৌভাগ্য ছাড়া আজ সকালে আর কিছুরই কোনো অস্তিত্ব বা অর্থ ছিলো না তার কাছে। স্ত্রীর কথায় তাড়াতাড়ি খড়মটা পায়ে দিয়ে নিল, খটখট শব্দ ক'রে ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে গেল দরজা পর্যন্ত।

ছোট বৌ বললো, 'শোনো—'

'এ্যাঁ।'

'তোমার চুল এখনো ছাঁটবার মতো হয়নি।'

'কী?'

'বলছি তোমার চুল ছাঁটার সময় হয়নি এখনো।'

'সময়? সময়ের কথা কী? আজ তো তারিখ।'

'চুল না বাড়লেও ছাঁটতে হবে?'

'বাড়াবাড়ির কী? তারিখ মতো ছাঁটবো না?'

'না।'

'এ্যাঁ!'

'আরো সপ্তাহ দেড়েক পরে ছাঁটবে।'

'সপ্তাহ দেড়েক পরে? নাপিত! নাপিত পাবো কোথায়? হারাণ তো এ মাসে আর আসবে না।'

'হারাণ ছাড়া কী আর নাপিত নেই?'

'কই না তো।'

'কী না তো।'

'হারাণ ছাড়া অন্য নাপিতে আর কোনোদিন ছাঁটি নি আমরা।'

'জন্ম থেকে এই নাপিতে ছাঁটছো?'

'হারাণের যে পয়সা লাগে না।'

'ও, তাই বলো।'

চুপ ক'রে গেল ছোট বৌ। আর ছোট বৌকে চুপ করতে দেখে ঘাবড়ে গেল সর্বেশ্বর। সে-ও চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো একটু। কপাল পিঠ ঘেমে গেল। বললো, 'তবে তুমি কী করতে বলো?'

'বলেছি তো।'

'চুল ছাঁটবো না আজ?'

'একটা কয়েদীর মতো চেহারা ক'রে রাখলে কি তোমাদের লোহার কারবারে কিছু বেশী আয় হবে?'

'কী?'

'চুল ছাঁটার বরাদ্দে চার আনা আট আনা খরচ করলে কি তিনখানা বাড়ির একখানা নীলামে উঠে যাবে?'

'কী সব বলছো?'

ছোট বৌ উঠে কাছে এসে মুখোমুখি দাঁড়ালো। 'চুলগুলো বড় হ'তে দাও, পায়ের খড়মটা ছেড়ে একটা চামড়ার জুতো কিনে পরো, হেঁটো ধুতি আর ফতুয়ার কবরেজী চেহারাটা বদলাও। সরে এসো জানালার ধারে আর আয়নায় তাকিয়ে নিজের বয়েসটা একবার দ্যাখো।'

কী বলবে সর্বেশ্বর। কী করবে। কী উত্তর দেবে স্ত্রীর এই সব সাংঘাতিক ঘরভাঙানো কথার? হঠাৎ নিজেকে ফিরে পেয়ে সাহসের সঙ্গে বললো, 'তার মানে তুমি আমাকে কলকাতার বাবু হতে বলছো? বাবার সঙ্গে ঝগড়া করতে বলছো?'

'কলকাতার বাবু কা'কে বলে জানি না, আমরা কলকাতার লোক নই। ভদ্রলোক হ'তে বলছি। এর মধ্যে বাবার সঙ্গে ঝগড়ার কোনো প্রশ্ন নেই।'

'নিশ্চয়ই আছে।' এতকালের সংস্কারে ঘা লেগেছে সর্বেশ্বরের। 'বাবা বিলাসিতা পছন্দ করেন না। বিলাসিতা পাপ।'

'অর্থগৃধ্নুতা যে তার চেয়েও বড় পাপ, সে-কথা বুঝি বলেননি?'

'অর্থগৃধ্নুতা।'

' না খেয়ে আত্মাকে কষ্ট দেওয়া, না প'রে দেহকে কুৎসিত ক'রে রাখা, রাশি রাশি টাকা জমিয়ে শুকিয়ে মরে যাওয়া, এর এক নাম অর্থগৃধ্নুতা, অপর নাম নরক।'

শুনতে শুনতে ঠোঁট কামড়ালো সর্বেশ্বর, ভারি গলায় বললো, 'আর বাবাকে অমান্য করাটা স্বর্গ, না?'

'বাবাকে অমান্য করার কথা উঠছে না এখানে।'

'নিশ্চয়ই উঠছে। এই নিয়ম তিনি করেছেন, ভাঙবার কর্তা আমি নই। যদি ভাঙি তা হ'লে নিশ্চই তাঁকে অমান্য করা হবে।'

'মা বাবা তাঁদের অবোধ শিশু সন্তানের জন্যই এই সব আদেশ, উপদেশ, নিষেধ শাসনের গণ্ডি এঁকে রাখেন, বয়স্কদের জন্য নয়। বয়স্করা নিজেদের বুদ্ধিতেই জানে আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়, জলে ঝাঁপ দিলে ডুবে যাবার সম্ভাবনা থাকে।'

'এটা আর ওটা সমান হ'লো?'

তা তো হ'লোই। আটাশ বছর বয়সেও যে মানুষ নিজের বুদ্ধিতে চলতে পারে না, অন্যের ইচ্ছের পুতুল হ'য়ে খায় দায় ঘুমোয়, জেগে ওঠে, কাজে যায় তাকে আর যাই বলা যাক, মানুষ বলে না।'

'কী বলে? অমানুষ?' ফোলা গাল অসম্মানের বেদনায় লাল হ'লো সর্বেশ্বরের। ছোট বউ জানালায় দাঁড়িয়ে ধীরে-সুস্থে মস্ত চুলের মোটা বেণীটা নরম হাতে খুলতে খুলতে মৃদুস্বরে বললো, 'না, অমানুষ নয়, ছেলেমানুষ। শিশু। অতবড় শরীরে শিশুতা শুধু বিসদৃশ নয়, অপরাধ।' বলতে বলতে কোনো দিকে না তাকিয়ে সর্বেশ্বরের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সর্বেশ্বর স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো খানিকক্ষণ, তার পর ঠাস ক'রে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে ধড়াস ক'রে শুয়ে পড়লো।

চার

এই পর্যন্ত হ'লো গল্পের ভূমিকা। আসল গল্প যেখানে শুরু সেখানে সর্বেশ্বর সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। দারুকেশ্বরের ধমক খেয়ে প্রথমবার কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিলো বটে, কিন্তু ছোট বৌ-এর সাহায্যে সামলে উঠতেও দেরি হয়নি বেশী। চেহারার প্রতি ততদিনে প্রেমে পড়ে গেছে সে। সে জেনেছে, বুঝেছে, আয়নায় দেখেছে একখানা বড় বহরের পাতলা ধুতি আর গেঞ্জি প'রে চলে-ফিরে বেড়ালে যেমন দেখায়, লুঙ্গি আর ফতুয়ায় তা দেখায় না। ঢেউখেলানো বড় চুলে চিরুণী চালিয়ে চেহারাটা যতো দুরস্ত হয়ে ওঠে, কদমছাঁট তেল-চুকচুকে নেড়া মাথায় তেমনি মর্কটের মতো দেখায়। ছোট বৌ যা বলে সত্যিই তা নেহাৎ না ভাববার কথা নয়। এই বয়সেও যদি পাঁচ বছরের বালকের মতো বাবা কান ধরে ওঠান বসান, সেটা মোটেই সঙ্গত নয়। মা-বাপ শিশুকেই শুধু ইজের পরিয়ে, কাজল বুলিয়ে, পাউডার মাখিয়ে আপন ইচ্ছেমতো সাজিয়ে দিতে পারেন, কী পরবে তা-ও ঠিক ক'রে দিতে পারেন। সে কোথায় যাবে আর না যাবে সেটাও তাঁদেরই হাতে। তাই ব'লে তার মতো একজন সাবালক ভদ্রলোককেও—না, না, ছি। সেটা খুব অন্যায়। খুব বিশ্রী। সেটা অনুচিত। অসঙ্গত।

বলাই বাহুল্য, কিছুদিনের মধ্যেই গরমিলটা প্রকট হ'য়ে উঠলো। শুধু জামা-কাপড় আর চুলের কাট-ছাঁটই নয়, মনের কাট-ছাঁটও বদলে গেল সর্বেশ্বরের। স্ত্রীর আয়নায় সে দেখতে পেলো নিজেকে. দেখতে পেলো পৃথিবীকে। জগৎ সংসারের দিকে এতদিন চোখ তুলে তাকিয়ে চোখ তার ধাঁধিয়ে গেল। জৈব প্রয়োজনটুকুর বাইরেও যে মানুষের জীবনে অনেক কিছুর প্রয়োজন আছে হঠাৎ সেটা উপলব্ধি ক'রে ভারি ভালো লাগলো।

অনেকদিন আগে একদিন ছোট বৌ তাকে জিজ্ঞেস করেছিলো, 'তুমি কখনো কবিতা পড়েছ?'

সর্বেশ্বর তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছিলো, 'হ্যাঁ, কত। স্কুলের বইয়ে পড়েছি, কলেজের বইয়ে পড়েছি—'

'না, না, সে রকম নয়,' অস্থির হ'য়ে ছোট বৌ বাধা দিয়েছিলো। 'নিজের ইচ্ছেয় পড়েছো কি না, ভালো লাগে ব'লে পড়েছো কি না।'

সর্বেশ্বরকে মাথা চুলকোতে হলো। বুঝতে পারলো না, বাধ্য না হ'লে মানুষ খামোকা খামোকা কতকগুলো কবিতা পড়তে যাবে কেন? এখন সে নিজে পড়ুক না পড়ুক, কেউ কেউ যে খামোকা কেন পড়ে আর কী সুখ পায়, তা যেন অনেকটা অনুভব করতে পারে। আর এটাও অনুভব করতে পারে, সময়ে অসময়ে ছোট বৌ জানালায় দাঁড়িয়ে আকাশে তাকিয়ে থাকে কেন? চাঁদ, তারা, ফুল, পাখী, এদের সৃষ্টিও যে ঈশ্বরের রাজত্বে নেহাৎ অকারণ নয়, স্ত্রীকে ভালোবেসে সেটা বুঝতে আর কষ্ট হয় না তার।

ক্রমে ক্রমে এতটাই পরিবর্তন হ'লো সর্বেশ্বরের যে গ্রীষ্মের বিকেলে কোনো কোনো

দিন সে একটা বেলফুলের মালা হাতে নিয়েও বাড়ি ফিরতে লাগলো। বড় বৌ, মেজ বৌ রকমসকম দেখে হতবাক্। বড় ভাই, মেজ ভাই হাসবে না কাঁদবে, ভেবে পেলো না। আর ছোট বৌএর সাহসের তো কোনো অন্তই নেই। ঐ তো একটা পার্টিসন করা ঘর, পা ফেলবার জায়গা নেই। তার মধ্যে যে কী না ঢুকিয়েছে। এলানো বেতের চেয়ার কিনেছে একটি, তাতে আবার নিজেই সেলাই ক'রে রঙিন কাপড়ের ঢাকনা পরিয়ে নিয়েছে, পেতেছে জানালার তলায়। মাথার কাছে ছোট আখরোট কাঠের টেবিল। কবে নাকি স্বামীর সঙ্গে নিউ মার্কেটে বেড়াতে গিয়ে কিনে এনেছে সখ করে। বেহায়া আর কাকে বলে? আগে ক্যানভাসগুলোকেই শুধু সাদা রং করে নিয়েছিলো, আজকাল আবার তার কাঠের ফ্রেমেও কেমন মেঘলা মেঘলা রং চাপিয়েছে। কৌটোভরা রং এনে, বুরুশ দিয়ে নিজেই করে এ সব। বুটিদার পর্দা দিয়েছে জানালায়। আর বিছানা কী? তোষক-গদিতে বেডকভারে সজ্জিত হয়ে যেন বারোমাসের বাসরঘর।

শুধু তাই নয়, নিজের ঘর ছাড়িয়ে ছোট বৌ মাঝে মাঝে জা'য়েদের ঘরেও হানা দেয়, কেউ বলে না তবু দড়ির কাপড়গুলো দোকানের মতো পাট পাট করে গুছোবে, মেঝের উপর ছড়ানো ছিটানো ছেলেমেয়ের বইগুলো থাক ক'রে সাজিয়ে দেবে তাকের উপর, ছুটির দিন হ'লে, কারো অনুমতি না নিয়েই একটা তোষক বিছিয়ে রঙিন চাদরে ঢেকে দেবে চৌকিটাকে। লজ্জার লেশ নেই, ঘোমটার বালাই নেই, বড় বৌ মেজ বৌ বারণ করলে বলে, 'বা রে, আজ দাদাদের ছুটি না, দুপুরে শোবেন না ওঁরা? শুধু তক্তপোষে ঘুমোবেন নাকি?'

'ঘুমোক। তোর কী। তোর পিঠে তো আর ব্যাথা লাগবে না।' বলতে ইচ্ছে করে এসব, কিন্তু বলে না। মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন চুপ করে যায়। না গিয়েই বা করে কী! শুধু তো ভাসুরদের জন্য বিছানাই পেতে দেয় না, ভাসুরদের এক পাল বাচ্চা-কাচ্চা নিয়েও কম পরিশ্রম করে না সে। নিজের হয়েছে একটি। তার সঙ্গে ধরে বেঁধে সব ক'টাকে খাওয়ায় দাওয়ায় জামা জুতো পরায়, শাসন করে, সেগুলোকে পড়তে বসানোই কি একটা সহজ ব্যাপার! আরো আছে। জায়েদের পান সেজে দেয়, চুল আঁচড়ে দেয়, নোংরা থাকলে চ্যাঁচামেচি করে। কাজেই মুখে যতই নিন্দে করুক, মনে মনে কোথায় যেন একটু সমর্থনও আছে। হয়তো তাই চুপ করে থাকে সব।

কিন্তু সবাই থাকলেও দারুকেশ্বর থাকবেন কেন? অনেকবার অনেকভাবে তিনি নিজের অসন্তোষ অসম্মতি এবং অপছন্দ জানিয়ে নানাভাবে শাসন করেছেন ছেলেকে। গম্ভীর থেকে বুঝতে দিয়েছেন রাগ, খারাপ ব্যবহার ক'রে বিরক্তি জানিয়েছেন। কিন্তু অবাধ্যতার স্পর্ধা তাতে এতটুকু দমিত হয়নি সর্বেশ্বরের। বরং আর এক ধাপ উঁচুতে হাত বাড়িয়েছে, আরো বিলাসী হয়ে উঠেছে দিন দিন, স্ত্রীর আরো অনুগত।

এবার ক্রুদ্ধ দারুকেশ্বর একদিন ফেটে পড়লেন। কঠিন গলায় তীব্র হুঙ্কারে সমস্ত বাড়ির সব ক'টি লোককে কাঁপিয়ে জানিয়ে দিলেন, ভদ্রলোকের বাড়িতে এই সব কুৎসিৎ

আচরণ করলে, বৌকে তো নিশ্চয়ই, দরকার হলে ছেলেকেও তিনি ঘাড় ধ'রে বার করে দেবেন।

বেলা ন'টা, তখনো বাড়ি থেকে বের হয়নি কেউ, বৌয়েরা সব সংসারের কাজে ব্যস্ত, কর্মচারীরা দারুকেশ্বরের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে, রান্নার চাকর একমাত্র বাজার এনে মসলা পিষতে বসেছে, নিবারণ কর্তাবাবুর প্রাতরাশের পরিত্যক্ত বাসন নিয়ে সবে উঠোনের কলে পা দিয়েছে, এই সময়ে এই।

দারুকেশ্বর রাশভারি মানুষ, তাঁকে এমনিতেই ভয় পায় সবাই, ইঙ্গিতেই সংসার চালান তিনি। তাঁর অঙ্গুলি হেলনেই এ বাড়ির প্রত্যেকটি মানুষ ওঠে বসে। আজকের এই চিৎকার তাঁর পক্ষে অপ্রত্যাশিত। ছোট বৌ সকালবেলা নিজে নিয়ে গিয়ে তার সাড়ে তিন বছরের ছেলেকে কোনো এক কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে ভর্তি ক'রে দিয়ে এসেছে, যার মাইনে পুরো দশ টাকা। দু'একদিন আগে সর্বেশ্বর দারুকেশ্বরকে কিছু মাইনে বাড়িয়ে দেবার কথা বলেছিলো, দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করেছিলেন দারুকেশ্বর। তারপর সামলে নিয়ে বলেছিলেন, 'যা মাইনে দিই, তার জন্যই কৃতজ্ঞ বোধ করো।'

সর্বেশ্বর বলেছিলো, 'তা হ'লে আমাকে যদি প্র্যাক্‌টিস করবার জন্য নিয়মিত সময় দেন একটু, যাতে'—যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গেই বলেছিলো কিন্তু রেগে গেলেন দারুকেশ্বর—'নিয়মিত সময় বলতে তুমি কী বোঝো? কী চাও?'

'অন্তত কোর্টে যাতে রোজই ঘণ্টা কয়েকের জন্য একবার গিয়ে বসতে পারি, সিনিয়রদের কাছে একটু ঘোরাফেরা করতে পারি, বার লাইব্রেরিতে—'

'বেশতো, তাই করো না, পদত্যাগপত্র পেশ করো এখানে।'

'আপনি অকারণে রাগ করছেন।'

'আর তুমি খুব সঙ্গত কারণে মাইনে বাড়াবার কথা বলতে এসেছ, না?'

আমার চলছে না।'

'কী ক'রে চলবে, স্ত্রীকে যে স্ত্রীলোকের মতো তোয়াজ করে, পা-মোছা পাপোষকে যে গা-মোছা তোয়ালে বানায়—'

'বাবা!'

'আমি এই তোমাকে শেষবারের মতো সাবধান ক'রে দিচ্ছি সর্বেশ্বর, এরপরেও যদি তুমি ঠিক পথে না চলো, আমার একটি কথা অমান্য করো—' বলতে বলতে তাকিয়ে দেখলেন সর্বেশ্বর কখন যেন চলে গেছে তাঁর কাছ থেকে।

এতদূর আস্পর্ধা। তিনি কথা বলছেন, আর তা না শুনেই তাঁর ছেলে চলে যেতে পারলো ঘর ছেড়ে! রাগে অন্ধকার দেখলেন তিনি। শরীরে যেন আগুন ধ'রে গেল। তখুনি তাঁর চিৎকার ক'রে উঠতে ইচ্ছে করেছিলো। নিজের শরীরের কথা ভেবে, বয়সের কথা ভেবে অতিকষ্টে দমন করলেন নিজেকে। সারারাত ঘুমোতে পারলেন না। আর তার

প্রতিক্রিয়াতেই আজ সকালে উঠে এই।

বড় ছেলে রোহিতেশ্বরের দুই ছেলে এবং মেজ ছেলে মহেশ্বরের এক ছেলে—এই তিনজনও স্কুলে যায়। পাড়ার স্কুল, মাইনে মাত্র দু'টাকা, দুষ্টুমি করলে আচ্ছা ক'রে ঠেঙায়, দশটা থেকে চারটা পর্যন্ত আটকে রাখে। মায়েরা তাইতেই সুখী। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা পড়াতে বসিয়ে ছোট বৌ রাগ ক'রে বলে, 'গোয়ালখানায় দু'টাকা দিয়ে কি গরু হবার জন্যে ভর্তি করা হ'য়েছে?'

বড় বৌ মেজ বৌ রসিকতা ক'রে হাসে 'তা নেহাৎ মন্দ কী, গরু বানাতে পারলে কয়েক ফোঁটা দুধ তো অন্তত পাওয়া যাবে। এ বাড়িতে সাদা জিনিস কেউ চোখে দেখেছে?'

'লেখাপড়ার পাট নেই', ছোট বৌ'র বিরক্তি কমে না, 'এদিকে মার খেয়ে খেয়ে বাচ্চাগুলোর পিঠের হাড় ভেঙে যাবার দশা। মাস্টারগুলো নেহাৎ অশিক্ষিত। বিড়ি ফোঁকে আর কী সব জঘন্য কথা শেখায়। এ সব কুশিক্ষা কি শিশুদের পক্ষে ভালো?'

শুয়ে ব'সে আলস্য করতে করতে জা'য়েরা আবার হাসে, 'ঐ মরা বলতে বলতেই রাম রাম শিখে ফেলবে, তোকে অত ভাবতে হবে না।'

কী আর বলবে ছোট বৌ। বলবার আছে বা-কী? যার যার পাঁঠা তারাই যদি ল্যাজে কাটে, অন্যের হাজার মাথা ব্যথাতেও প্রতিকার হবে না কোনো। কিন্তু তাই ব'লে নিজের ছেলেকে সে এভাবে মানুষ করতে পারে না। একটা শিশু মানুষ করার অনেক দায়িত্ব, অনেক আয়োজন. সুতরাং নিজের ছেলেকে সে মূল্য বেশী হ'লেও স্কুলে না দিয়ে পারলো না। আর এই সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে যে দারুকেশ্বর এমন অসঙ্গত রকমের ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠতে পারেন, এটা কল্পনাও করেনি সে। যাবার আগে ছেলেকে জামা জুতো পরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো তার দাদুর ঘরে প্রণাম করাতে, ঘরে অনেক লোকজন ছিলো তাই ব'লেই চলে যেতে হয়েছে। ফিরে এসেছে এই মাত্র, আসা মাত্রই দারুকেশ্বরের বজ্রের মতো গলা শুনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

ঘরে ব'সে দাড়ি কামাচ্ছিলো সর্বেশ্বর. বাবার গর্জন শুনে, তোয়ালেতে মুখ মুছে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো। 'আমাকে বলছেন?'

'নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই তোমাকে। তুমি ছাড়া এতবড় কুলাঙ্গার আর কে আছে এ বাড়িতে যে পুরুষ একটা মেয়েমানুষের ভেড়া।'

নীল হ'য়ে উঠলো সর্বেশ্বরের মুখ।

'মনে রেখো এটা বাজার নয়, ভদ্রলোকের বাড়ি. বৌকে ব'লে দিও, বৈঠকখানা সাজাতে হ'লে এ পাড়ায় চলবে না। বাপের বাড়ির দেশে গিয়ে যেন সাজায়।'

'এসব আপনি কী বলছেন?' জীবনে এই প্রথম বাপের দিকে মুখ তুলে চোখে চোখে

তাকিয়ে প্রতিবাদের ভঙ্গি করলো সর্বেশ্বর, 'আমি আপনার ছেলে, আমার সম্পর্কে আপনি যা খুশি তা বলতে পারলেও, অন্য একজন মেয়ে সম্পর্কে এরকম বলা আপনার উচিত নয়।'

'রেখে দাও তোমার উচিত অনুচিত। যা সত্য তাই বলছি। আমার বাড়িতে থাকতে হ'লে, আমার ভাত খেতে হ'লে প্রত্যেক নিঃশ্বাসে আমার কথা মতো চলতে হবে। পারো, ভলো। না পারো, বাড়ি ছেড়ে চলে যাও।'

'তাই যাবো।' সর্বেশ্বরের গলার স্বর অনমনীয় হ'লো।

'এখুনি, এখুনি বেরোও', দারুকেশ্বর প্রচণ্ড রেগে ব'লেন 'আর এক দণ্ড আমি তোমাদের বাড়িতে দাঁড়াতে দেবো না।'

'ভাতটা আপনার, বাড়িটা আপনার নয়। বাড়ি আমি আমার সুবিধে মতো ছাড়বো, কিন্তু আপনার ভাত আর খাবো না।'

'কী? কী বললে? বাড়ি আমার নয়?'

'না। এ বাড়ির ভাড়াটে হিসেবে আপনার যত অধিকার আমারও ঠিক তাই।'

'বদমাস।' ছুটে ছেলের মুখোমুখি এসে তর্জনী তুললেন, 'এত বড় স্পর্ধা হ'য়েছে তোর! আমার মুখে মুখে দাঁড়িয়ে তুই বলতে সাহস পাস যে এ বাড়ি আমার নয়? তবে কার রে হারামজাদা! ভাড়া কি তুই দিস? বাড়ি কি তোর নামে নেওয়া হ'য়েছে?'

'আমি উকিল, আইনের প্যাঁচে রাতকে দিন করতে পারি, দিনকে রাত করতে পারি। সত্য কথা, সত্য ব্যবহার, ধর্ম, বিবেক সে সব আমি আপনার জন্য অনেকবার বিসর্জন দিয়েছি, দরকার হ'লে শেষ বারের মতো নিজের জন্যও একবার দেবো।'

ব'লে আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালো না সর্বেশ্বর, উঠোন পেরিয়ে সোজা বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে, আর ক্রুদ্ধ দারুকেশ্বর সেদিকে তাকিয়ে নিষ্ফল আক্রোশে ছেলেকে এমন সব ভাষায় গালিগালাজ করতে লাগলেন, যে সব ভাষা কোনো অভিধানে নেই। কোনো বস্তির নিম্নতম বাসিন্দাও যে ভাষা উচ্চারণ করতে একটু দ্বিধা করে। শুধু তাই নয়, তক্ষুনি বড় ছেলেকে পাঠিয়ে উকিল ডাকিয়ে আনলেন, উইল ক'রে সম্পত্তি থেকে সর্বেশ্বরকে বঞ্চিত করবেন বলে, যাতে তাঁর মৃত্যুর পরে এই কুলাঙ্গার একটি কপর্দকও না পেতে পারে। আর মাসোহারার কোনো প্রশ্নই রইলো না।

এই সব ব্যাপার দেখে ছোট বৌ কম্পিত পায়ে নিজের ঘরে ঢুকে স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো কতক্ষণ, তারপর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে জানালার কাছে এসে শূন্য মনে তাকিয়ে রইলো বেলা দশটার আকাশের দিকে। বৈশাখ মাস, একখণ্ড কালো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে লঘু গতিতে, হয়তো ঝড় উঠবে, হয়তো বৃষ্টি নামবে—নামুক, নামুক। সারা পৃথিবীটা ছেয়ে যাক মেঘে, ভেসে যাক বৃষ্টিতে।

কিন্তু তা যাবে না। এমনি ক'রেই আরো অনেক, অনেকদিন বেঁচে থাকতে হ'বে এই

সংসারে, এই বাড়িতে। এই বৃদ্ধ ভদ্রলোক এতটুকু বদলাবেন না, এতটুকু জায়গাও ছেড়ে দেবেন না তাঁর কর্তৃত্বের অদম্য স্পৃহা থেকে। না, একটু ভুল ভেবেছে ছোট বৌ। এ বাড়িতে আর তো জায়গা নেই তাদের জন্য। তার জন্যেই আজ এই জায়গা বেদখল হ'য়ে গেছে। এ বাড়ির সঙ্গে সর্বেশ্বরকে আজ শুধু তার জন্যই বিচ্ছিন্ন হ'তে হ'য়েছে। সত্যি কি এখন চলে যেতে হবে! কোথায় যাবে? গেলে চলবে কেমন ক'রে? খাবে কী? বাড়ি ভাড়া দেবে কী দিয়ে? এই তো মাসের মাত্র মাঝামাঝি, এরই মধ্যে হাত খালি হ'য়ে এসেছে। তার উপরে ছেলেকে ভর্তি করতে আজ কত টাকা বেরিয়ে গেল। কে জানতো এমন হবে, এমন ক'রে কুকুর বেড়ালের মতো তাড়িয়ে দেবেন আপন সন্তানকে।

এদিকে মাসখানেক যাবত কী যে হ'য়েছে সর্বেশ্বরের, মাঝে মাঝেই পেটের মধ্যে এক অদ্ভুত যন্ত্রণা হয়, ছটফট করে বিছানায় শুয়ে, দাঁতে দাঁত লেগে যায় ব্যাথায়। ছুটে গিয়ে ডাক্তার নিয়ে আসতে হয়, ভিজিট দিতে হয়, দামী দামী ওষুধ কিনতে হয়। কোনো ডাক্তার কখনো বলেন কলিক, কখনো লিভার, কখনো বিকোলই, এখন এক্সরে করিয়ে নিতে বলছেন। শুধু তাই নয়, ডায়েটেরও চার্ট ক'রে দিয়েছেন তিনি। এই সব বিপদে আপদে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, সাহায্য করেন দারুকেশ্বর। তিনবার হাত পাতলে একবার অন্তত হাত বাক্সের ডালা তিনি খুলে ধরেন। এক আধবার কুশল প্রশ্নও যে জিজ্ঞাসা না করেন তাও নয়।

আগে আগে চাইতে বড় লজ্জা করতো, অভিমান হ'তো, অবাকও লাগতো এরকম অদ্ভুত ব্যবহারে, কিন্তু কালক্রমে সবই সয়ে এসেছে। শুধু অভিমানটাই গিয়েও যেতে চায় না। কখনো কখনো মনে হয়, যা হয় হোক, শ্বশুরের দরজায় গিয়ে আর প্রার্থী হ'য়ে যেন দাঁড়াতে না হয়। হয়তো ঈশ্বর এতদিনে সেই আবেদন নিবেদনে কান দিয়েই এমন একটি ঘটনা ঘটিয়ে দিলেন। নইলে পিতা হ'য়ে পুত্রের সঙ্গে কেন দারুকেশ্বর এমন ব্যবহার করবেন! কেউ করে কখনো। কেমন ক'রে তিনি ঐ সব কুৎসিত কথা উচ্চারণ করতে পারলেন? বাড়িভর্তি লোকের সামনে অমন অকাতরে নিজের পুত্রবধূর নামে আর কোন শ্বশুর এই রকম অভদ্র ভাষা ব্যবহার করতে পারতেন? কী আশ্চর্য, নিজের বাসগৃহ সাজানো পাপ? অন্যায়? অসৎচরিত্র স্ত্রীলোকের নিদর্শন? ছি! ছি, ছি! কী নোংরা! কী নোংরা! যে ঘরে মানুষ বাস করবে, সে ঘর সে গুছিয়ে নেবে না মনোমতো ক'রে? চোখের একটা দাবী আছে না? পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাটা একটা অশ্লীলতার পরিচয় এমন কথা কে কবে শুনেছে? এমন কোন ভদ্রবাড়ি আছে যেখানে এরচেয়ে অন্যরকম থাকে।

যে ঘরটায় দারুকেশ্বর নিজে থাকেন—ঘরটা বেশ। আলো হাওয়া আছে। কিন্তু জানালা দরজা বন্ধ রেখে, ময়লা বিছানায় চিটচিটে কাপড় জামায় নোংরা মেঝেতে কী ভাবে থাকতেন সারাদিন। কী ভাপ্‌সা গন্ধ বেরুতো! একদিন সে ঘর ধুয়ে মুছে ফিটফাট ক'রে দিয়েছিলো। বুড়ো মানুষ নিজে কিছুই পারেন না, স্ত্রী নেই; কে ক'রে দেয়। তাই মানুষটিকে সেবা করতে ভালো লাগতো ছোট বৌয়ের আর কর্তব্য ব'লে মনে হ'তো।

বুঝি বা একটু মমতাও হ'তো। শরীর অসুস্থ হ'লে যখন দিন রাত শুধু ঐ তক্তপোষটায় শক্ত কাঠের উপর শুয়ে থাকতেন, যেন তার নিজের পিঠে লাগতো। দারুকেশ্বরের সেই শুধু তক্তপোষের উপর যদিও নিজের একটা তোষক ছিলো, (কোনো পুরোনো জিনিসের প্রদর্শনী হ'লে সেই তোষকটা নিশ্চয়ই ফার্স্ট প্রাইজ পেতো।) সেটার তুলোগুলো তুলো ছিলো না, বয়সের চাপে অন্য কোনো কঠিন বস্তুতে পরিণত হ'য়েছিলো। উপরের কাপড়টার রেশ মাত্র ছিলো। ছোট বৌ'র সন্দেহ হ'য়েছিল, এ তোষকটা বোধহয় দারুকেশ্বরের বিবাহের তোষক। কারো অনুমতি না নিয়েই নিবারণকে দিয়ে সেটাকে ডাস্টবিনে চালান করেছিলো ছোট বৌ তারপর নিজের বিয়ের নতুন তোষকটা এনে পেতে দিয়ে বলেছিলো, 'এরপরে আর কিন্তু আপনি কখনো শক্ত তক্তপোশে শুতে পারবেন না, এটা পাতাই থাকবে।' কই তখন তো কোনো আপত্তি করেন নি, বা রাগ করেন নি। নিজের তোষকটা শ্বশুরকে দিয়ে কয়েকদিন শুতে খুব কষ্ট হ'য়েছে তার, সর্বেশ্বরের বিয়ের আগের চেপ্টে যাওয়া পুরোনো জিরজিরে, ডিমওঠা, বিচিভরা, তোষকটাকে পিঠের তলায় অভ্যেস করে নিতে রীতিমতো অসুবিধে হ'য়েছে। বুঝতে পেরে সর্বেশ্বর কিছু না ব'লে কোর্ট থেকে ফেরবার পথে আর একটা নতুন তোষক কিনে নিয়ে এসেছে একদিন।

ঘর অপরিষ্কার থাকলে, আজকাল দারুকেশ্বর রীতিমতো রাগ করেন, দড়িতে ঝোলানো ময়লা কাপড়ের স্তূপ দেখলে নিবারণকে বকেন। ছোট বৌ এমন কথাও বলতে শুনেছে তাঁকে, যা শুনে ছোট বৌ'র মনে হ'য়েছে, এই সব ছোট-খাটো সুখসুবিধার কাজগুলো নিবারণের হাতে ছেড়ে না দিয়ে তিনি যেন তাকে করতেই ইঙ্গিত করছেন। খুশি হ'য়েছে সে, মনে মনে ভেবেছে, যাক্, আস্তে আস্তে অভ্যেস বদলাচ্ছে তা হ'লে এমনও আশা করা যায়, যে একদিন বাড়িটা সত্যিই একটু ভদ্র হ'য়ে উঠবে, অন্তত এই শুয়োরের জীবন যাপনের যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবার কথাটা চিন্তা করতে শিখবে।

এই নাকি তার পরিণাম!

কিন্তু সর্বেশ্বর কোথায় গেল? কেন গেল? কেন এখনও ফিরছে না। কী হ'লো তার? জানালা ছেড়ে দ্রুতপায়ে ছোট বৌ দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো।

দরজার বাইরে দুই চাকর দাঁড়িয়ে জটলা করছে তাদের নিয়ে। চোখ বড় ক'রে গলা ছোট ক'রে দু'জন দু'জনের (একজন ছোট বৌ আর একজন দারুকেশ্বর) পক্ষে নিয়ে নানা তথ্যের অবতারণা ক'রে এ ওকে হারিয়ে দেবার চেষ্টায় উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছে। এক পলক দেখেই দরজার আধখোলা পাল্লাটা ছোট বৌ আবার ভেজিয়ে দিল। পারিবারিক কলহে এদের উৎসাহটাই সর্বদা টগবগ করে বেশী। অনেক খোরাক পায় এরা। অনেকদিন ধরে আলাপ আলোচনা চালিয়ে জিইয়ে রাখে কেচ্ছাটি। জিভের ব্যায়াম করে। তবু এরা ক্ষমার যোগ্য। খাওয়া আর ঘুম ছাড়া আর কী জানে বেচারারা। পৃথিবীর কতটুকু খবর এসে তাদের কানে পৌঁছয়। কাজেই যে বাড়িতে বাস করে সেই চারদেয়ালের

ভিতরটুকুতে উত্তেজক কিছু ঘটলে ঘোলা জলে আলোড়ন ওঠে, জীবনের একটা মানে খুঁজে পায়।

কিন্তু শুধু কি ওরাই? এ বাড়ির আর দু'খানা ঘরেও কি এই আলোড়ন কিছু সুখ আনেনি? উৎসাহিত হবার মতো কোনো বক্তব্য আনেনি? এনেছে। ছোট বৌ জানে এনেছে।

ছোট বৌ দরজার কাছ থেকে সরে আবার এসে জানালায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকালো।

বেলা প্রায় বারোটার সময় চাল ডাল তেল নুন, হাঁড়িকুড়ির নতুন সংসার নিয়ে ফিরে এলো সর্বেশ্বর। এসে দেখলো, ছেলে ঘুমিয়ে রয়েছে, আর ছেলের মা শুকনো মুখে বসে আছে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে।

'কী ভাবছো এত?' সর্বেশ্বর গলায় স্বাভাবিক সুখ আনতে চেষ্টা করলো। চোখ সজল হ'য়ে উঠলো ছোট বৌ'র।

হাসিমুখে স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো—'সব নিয়ে এসেছি আমি। এই তো ভালো হ'লো, এতদিনে স্বাধীন হতে পারলাম, একটা মানুষের জীবন পেলাম। তুমি গুছিয়ে নাও, রান্নার জোগাড় করো। মাত্র তো আড়াই জন মানুষ, রান্না করতে খুব কষ্ট হবে তোমার?'

ছোট বৌ নিচু ক'রে চুপ করে রইলো।

সর্বেশ্বর তার কাছে এসে পিঠে হাত রাখলো, 'আপতত এখানেই দু' একটা মাস কাটাতে হবে, উপায় তো নেই, চট ক'রে কি নিজেদের অবস্থা অনুযায়ী ভাড়ার বাড়ি পাওয়া যাবে এখন? কাজেই এখানেই মানিয়ে নাও, মন ঠিক ক'রে নাও। আর তুমি নিশ্চয়ই আমাকে এত অযোগ্য ভাবো না যে, বাপ খেতে না দিলেই পথে দাঁড়াবো, স্ত্রী আর সন্তানের ভরণপোষণ করতে পারবো না।' বলতে বলতে স্ত্রীকে সে বুকের মধ্যে টেনে নিল, 'মানুষ হবার মন্ত্র তো তুমিই আমাকে দিয়েছ, এখন তুমিই আবার মুখ ভার ক'রে থাকবে?'

এবার স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে দুই চোখ ছাপিয়ে জল এলো ছোট বৌ'র।

মা বাবা না থাকলেও ছোট বৌ তার দাদা বৌদির ভালোবাসায় কোনোদিনই তাঁদের অভাব অনুভব করতে পারে নি। দাদা নিজে তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় ক'রে তুলেছেন, বৌদি নিজের গয়না বেচে তার বিয়ে দিয়েছেন। এক কালে ধনী ব'লে খ্যাতি থাকলেও পূর্বপুরুষের বিত্ত নিয়ে খুব বেশী আরামে বসে শুয়ে দিন কাটেনি দাদার। সে বড় হ'তে হ'তে আর দাদা বৌদির বয়স বাড়তে বাড়তে সবই প্রায় ক্ষয়ে এসেছিলো। তাদের পারিবারিক চাল চলনের পক্ষে সে প্রায় একটা ফুৎকার। ঢাকা সহরে মস্ত একখানা বাড়ি তখনও টিকে ছিলো, ভাড়া পাওয়া যেতো, কিছু ধানের জমি ছিলো, ঘর কয়েক প্রজা ছিলো, এই সম্বল। তার বিয়েতে কী ক'রে যে দাদা অতগুলো টাকা দিতে পেরেছিলেন এখনো ভেবে পায় না সে। সে বারণ করেছিলো। এত যাদের টাকার খাঁই সেখানে বিয়ের

কথা ভাবতে অপমানিত বোধ করেছিলো। কান্নাকাটিও করেছিলো বৌদির কাছে। ওঁরা শোনেন নি। পাত্র উকিল, ভাইরা ইঞ্জিনিয়ার একটি মাত্র বোন বিবাহিতা, বাপের অতগুলো বাড়ি, বস্তি, লাখ টাকার কারবার এই শুনেই কোনোদিকে তাকালেন না। বললেন, 'গরীবের বোন হ'তে পারো, মেয়ে তো বড়লোকেরই। ছিলো তো সবই, এখন শুধু হাতটা বড় আছে আর কিছুই নেই। এক অভাব থেকে আর তোমাকে আমি আর এক অভাবে ঠেলে দেবো না। তাতে আমার জমি বন্ধক পড়ুক বা বাড়ি বিক্রি হোক, এই রকম বড়লোকের ঘরেই বিয়ে দেবো তোমাকে।' তবুও সে একটা অস্ফুট তর্ক তুলতে চেয়েছিলো থামিয়ে দিয়েছেন দাদা, যুক্তি দেখিয়েছেন, 'সব রকম একসঙ্গে পাওয়া যায় না। বড়লোকের ছেলেরা অনেক সময়েই লেখাপড়ায় মূর্খ থাকে, এ একেবারে সোনায় সোহাগা। তাছাড়া আমার কি আর মেয়ে আছে?'

হায় রে! কী বিশ্বাসেই কয়েকখানা চিঠির উপর নির্ভর ক'রে বড় ঘরে বোনকে বিয়ে দিলেন দাদা! এই নাকি বড় ঘর। এই নাকি চাল-চলন। বৌ হ'য়ে বাড়িতে ঢুকে ছোট বৌ সব দেখে শুনে স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিলো। আর দাদার মুখে মেঘের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিলো। চিন্তার রেখাগুলো স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠেছিলো কপালে। যাবার সময় ঢোক গিলে বলেছিলেন, 'অন্যের কথার উপর নির্ভর ক'রে কী করলাম! কী হবে, কেমন হবে, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

নত মুখে ছোট বৌ জবাব দিয়েছিলো, 'তুমি কিছু ভেবো না দাদা, এঁরা লোক খুব ভালো।'

'ভালো?'

'বাড়িটাতে অনেকদিন কোনো মেয়ে ছিলো না কিনা, তাই একটু বিশৃঙ্খল,' দাদাকে যে কী কৈফিয়ৎ দেবে ভেবে পায় নি, চুপ ক'রে থেকে আবার বলেছে, 'কিন্তু খুব ভালো সবাই, আমার খুব ভালো লেগেছে।'

মাথায় হাত রেখে বোনের অশ্রুসজল মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছেন দাদা, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছেন, 'কী জানি।' চোখ মুছে বলেছেন, 'তুই আমাকে চিঠিতে সব খুলে লিখিস।' ছোট বৌ কান্না চেপে বলেছে, 'সব ঠিক হয়ে যাবে দাদা! আমি সব ঠিক ক'রে নেবো।

সত্যিই সব ঠিক ক'রে নিতে পেরেছে কি পারেনি, আজ আর তার হিসেব মিলোলো না ছোট বৌ। বড়লোক শ্বশুরের বড় ঘরে পা দিয়ে, শুভদৃষ্টির সময়ে শ্বশুরের পুত্রের দিকে তাকিয়ে সেদিন হতাশার যে গভীর অন্ধকারে প্রায় তলিয়ে গিয়েছিলো সে, আজ পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত দরিদ্র স্বামীর দিকে তাকিয়ে সব দুঃখ তার সার্থক হ'য়ে গেল। সব বেদনা সার্থক হলো। অকৃত্রিম আনন্দে আলো হ'য়ে উঠলো পৃথিবী। নতুন উৎসাহে উঠে দাঁড়ালো সে, নতুন সংসার রচনায় মন দিল। তাদের স্বামী স্ত্রীর একক সংসার, সুখের সংসার।

কিন্তু কী ছোট ঘর! কী যে অসুবিধে হ'তে লাগলো বলা যায় না। একটা বারান্দাকে ঘর বানালে বারান্দার আকৃতিও স্পষ্ট হয় না, ঘরের আকৃতিও স্পষ্ট হয় না। কোনো রকমে শোয়া বসা চললেও গোটা সংসারকে সেখানে ধরানো প্রায় একটা অলৌকিক ব্যাপার ব'লেই মনে হ'লো ছোট বৌ'র। এদিকে খাট চৌকি ওদিকে আলনা আলমারী তার উপরে হাঁড়িকুড়ি উনুন। আর তারও উপরে একটি শিশু। ছোট বৌ ভেবে অস্থির হ'য়ে গেল কী উপায়ে এই একফোঁটা চৌকো জায়গাতে সে এত রকম কাজে ব্যবহার করবে। যত ছোট সংসারই হোক, তার আয়োজন কিছু কম নয়। থালা, বাটি, গ্লাস, প্লেট, হলুদ, লঙ্কা, ধনে, জিরে—কী বাদ দেওয়া যায়? বেশী লোকের পরিমাণ বেশী, কম লোকের পরিমাণ কম, এছাড়া এই তালিকায় আর কিছুরই প্রভেদ নেই। ওদিকের রান্না ঘরে, অর্থাৎ দারুকেশ্বর আর দারুকেশ্বরের অন্য দুই ছেলের সংসারেও যা যা দরকার, ছোট বৌ'র একক সংসারেও ঠিক তাই প্রয়োজন।

দেয়ালগুলো ক্যানভাসের উনুন ধরালে আর টেঁকা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে তেতে ওঠে। সর্বেশ্বর স্টোভ নিয়ে এসে তবু একটু রক্ষা করলো। অনেক ভেবে চিন্তে রাস্তা থেকে এক মিস্ত্রি ধ'রে নিয়ে এলো ছোট বৌ। বারান্দার পশ্চিম দিকে কর্পোরেশনের নিয়ম মাফিক যে চার ফুট জায়গা ছেড়ে রাখা ছিলো, সেদিকের ক্যানভাসটা কাটিয়ে নিল তাকে দিয়ে, তারপর কাঠের ফ্রেম দিয়ে এদিকের মতো আর একটা দরজা বসিয়ে দিল। অনেকটা খোলা মেলা হ'য়ে গেল ঘরটা। বাড়ির ভিতর দিকে ঠিক ঐ দরজারই মুখোমুখি দরজাটা। ঝগড়াঝাঁটির পরে প্রায় বেশীর ভাগ সময়েই বন্ধ ক'রে রাখতে হ'তো। নিতান্ত বেরুতে হ'লে, জল আনতে হ'লে অথবা বাথরুমে যাওয়া ছাড়া খুলতোই না ছোট বৌ। তার লজ্জা করতো, ভয় করতো, সঙ্কোচ হ'তো। ঠিক পাশের কোনাচে ঘরটিই দারুকেশ্বরের, খুললেই চোখাচোখি হ'য়ে যাবার আশঙ্কা, আর চোখোচোখি হ'লেই তিনি সবেগে মুখ ঘুরিয়ে ঠাস ক'রে জানালাটা বন্ধ ক'রে দিতেন। সেটা সহ্য হ'তো না কারো। ছোট বৌ'র না, সর্বেশ্বরেরও না। সর্বেশ্বর বলতো না কিছু, কিন্তু ছোট বৌ জানতো জানালার শব্দটা ঠিক এসে বুকে বাজবে তার, যন্ত্রণায় সে চোখ বুজবে। সেজন্য আরো সাবধান হ'য়ে থাকতো সে। এদিকের দরজা ফুটিয়ে যেন হাঁফ ছাড়লো একটু। শুধু তাই নয়, চার ফুট গলিটুকুকেও সে পরিষ্কার ক'রে লেপে পুঁছে সুন্দর একটু আঙিনা ক'রে নিল। দরজার কাছে কেরোসিন কাঠের বাক্স রেখে এক ধাপ সিঁড়ি বানালো, সীমানার দেয়ালের সঙ্গে আর ঘরের দেয়ালের মাথায় ঢালু বেড়া দিয়ে ছোট্ট একচালা ঘরের মতো সেড ক'রে নিল একটু, আর সেটুকুই হ'লো তার রান্নাঘর। বৃষ্টি হ'লেই যা মুস্কিল, নইলে নিতান্ত মন্দ হ'লো না। পোড়া মাটির ছোট ছোট ঘটি বাটি এনে গুছিয়ে রাখলো মশলাপাতি। বৈয়ম এনে চা চিনি চিঁড়ে গুড় সাজালো। খাটের তলাটা ইঁট দিয়ে উঁচু ক'রে ভাড়ার ঘর বানালো। এ ভাবে চালাতে চালাতেই প্রাণপণে বাড়ি খুঁজতে লাগলো সর্বেশ্বর। সারা পাড়া চষে ফেললো সে, কিন্তু কোথায় বাড়ি! তার মতো স্বল্প আয়ের গৃহস্থের জন্য কোথাও কিছু নেই। এতদিনে

সর্বেশ্বর বুঝতে পারলো কলকাতা সহর কী ভীষণ জায়গা।

এক পলকের নোটিশে বাপ তাকে চাকরী ছাড়িয়ে আলাদা ক'রে দিতে পেরেছেন বটে কিন্তু ওকালতির আয় নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ এতটা বেশী হ'য়ে ওঠেনি যার উপর নির্ভর ক'রে স্ত্রী আর ছেলের হাত ধ'রে সে যে কোনো ভাড়ার একটি বাড়িতে গিয়ে অনায়াসে উঠতে পারে।

প্রায় সাত বছর হ'য়ে গেল আইন পাশ করেছে সর্বেশ্বর, তারপরেই তো বাঁধা মাইনেতে ঢুকেছে নিজেদের কারবারে। এখন নতুন ক'রে পসার জমানো প্রায় পাহাড় ডিঙোনোর মতোই কঠিন এই বাজারে, একমাত্র উপায় আবার আর কোনো প্রতিষ্ঠানে যদি এই রকমই কোন চাকরী পাওয়া যায়। তার মতো মানুষের পক্ষে সেটাই ভালো, সেটাই নির্ঝঞ্ঝাট।

মাত্র দু'মাসের আলাদা সংসারেই বেশ কিছু ধার দেনা হ'য়ে গেল। নতুন সংসার পাতার আয়োজনে যা খরচ হ'লো দেখা গেল তার সংখ্যা খুব কিছু কম নয়। জামাকাপড় কম পরা যায়, কিন্তু পেটটাকে তো অল্প দিয়ে ভরানো যায় না। সামান্য ডাল তরকারী ভাত জোটানোও মন্দ শক্তকর্ম ব'লে মনে হ'লো না সর্বেশ্বরের। একটা ছোট শিশু আছে, একটু দুধ লাগে তার, নিজের শরীরটা কিছুকাল যাবৎ যথেষ্ট শত্রুতা করছে, একটা আধটা ওষুধও কিনতে হয়। সারাদিন আলিপুরে কালো কোট গায়ে দিয়ে মাকড়সার পোকা ধরার মতো মক্কেল ধরার কাজে হা পিত্যেশ ক'রে পরিশ্রম যতটা হয়, লাভ ততটা হয় না।

তার উপরে দারুকেশ্বর বাড়ি ভাড়ার জন্য এক জরুরী নোটিশ পাঠালেন এবং সেই নোটিশটি পাঠ ক'রে সর্বেশ্বর হতচকিত হ'লো। স্বামীর হতাশাভরা মুখের দিকে তাকিয়ে ছোট বৌ বললো, 'ভাবছো কেন, যদি কিছু সামান্য ভাড়া দিলে উনি চুপচাপ থাকেন, না হয় তা' দেওয়া যাবে। সারাবাড়ির ভাড়াই তো তেতাল্লিশ টাকা, এই বারান্দাটুকুর জন্য আর উনি কত নিতে পারেন।

সর্বেশ্বর শিথিল হাতে নোটিশটি স্ত্রীর দিকে এগিয়ে দিল। দারুকেশ্বর জানিয়েছেন এই ঘরখানার ভাড়া একশো টাকা হওয়া উচিত, কেননা, আজকাল তিন ঘরের ফ্ল্যাট তিনশো, অতএব এক ঘর একশো। সোজা হিসেব। কিন্তু রান্নাঘর, বাথরুম কমন বলে তিনি ততটা নেবেন না, নব্বুই ক'রে দিতে হবে। দু'মাসের বাকি একশো আশি টাকা এবং এই মাসের এ্যাডভান্স নব্বুই, সবসুদ্ধ দুশো সত্তর টাকা তিনি এই মুহূর্তে দাবী করছেন। আর না দিতে পারলে সাতদিনের মধ্যে চলে যেতে বলেছেন। ছোট বৌ স্তব্ধ হ'লো।

পরের দিন দুপুরবেলা সর্বেশ্বর কোর্টে বেরিয়ে গেলে, মহেশ্বর, রোহিতেশ্বর কাজে বেরুলে, তাদের স্ত্রীরা খেয়েদেয়ে যার যার ঘরে খিল দিয়ে ঘুমোতে গেলে নিরালা নির্জন বুঝে ছোট বৌ এসে শ্বশুরের ঘরে দাঁড়ালো।

'একটা কথা আছে!'

দারুকেশ্বর হিসেব লিখছিলেন, প্রায় চমকে উঠে ফিরে তাকালেন।

পরমুহূর্তেই চোখ নামিয়ে নিয়ে বললেন, 'তোমাদের সঙ্গে আর আমার কোনো কথা নেই।'

'আপনার না থাকতে পারে, আমার আছে।'

'আমি কাজ করছি, শোনবার সময় নেই।'

'আমি ব'লে যাবো, শোনা না শোনা আপনার ইচ্ছে।'

'এখন যাও।'

'যাবো, কিন্তু যা বলতে এসেছি তা না ব'লে যাবো না।'

'কী বলতে এসেছো?'

'আপনি ওরকম একটা অসঙ্গত ভাড়া চেয়েছেন কেন?'

'না দিলে সাবলেট করবো ব'লে।'

'তা ব'লে যা অন্যায় যা অসম্ভব—'

'চুপ করো।'

'আপনি জানেন, কী কষ্টে আমাদের দিন চলছে?'

'জানতে চাই না।'

'অত ভাড়া দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব।'

'আমি তো জোর করছি না। যেখানে সস্তা পাবে চলে যাও সেখানে।'

'সস্তাতেও এখন যেতে পারি না। এখন, এই মুহূর্তে বাড়ি ভাড়া দেবারই সামর্থ্য নেই আমাদের। এ বাড়ির ভাড়াও দিতে পারবো না। যখন পারব,—'

'যখন পারবে তখনই তা হ'লে থেকো।'

'আর এখন?'

'এখন ভাড়া দিলে তবেই থাকা হবে নচেৎ নয়।'

'রাস্তায় বার ক'রে দেবেন?'

'অবাধ্য সন্তানকে তার চেয়েও কঠিন সাজা দিতে আমি প্রস্তুত।'

'কিন্তু আমি তো আপনার সন্তান নই, আমার ছেলেও আপনার সন্তান নয়, আমাদের কী করবেন?'

এ জবাব আশা করেন নি দারুকেশ্বর, একটু থমকালেন, পরমুহূর্তে—ডেস্কটা ঠেলে দিয়ে বললেন, 'আমি বলছি তুমি এখন যাও।'

'শুনলাম উইল ক'রে ছেলেকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছেন, কেন? সেটা কি আপনার উচিত হয়েছে?' ছোট বৌ নিষ্কম্প।

'বেয়াদপি কোরো না।'

'আপনার ছেলে অসুস্থ, ডাক্তার তাকে বিশ্রামে থাকতে বলেছেন, ভালো খেতে বলেছেন, চিন্তা করতে বারণ করেছেন, আপনার ভাবনা হয় না তাঁর জন্য?'

'না।'

'আপনি মনে মনে ভাবেন না, যা করছেন তা আপনার ঠিক হচ্ছে না।'

'বলছি, তুমি যাও।'

'আপনি আমাদের বাবা, সবচেয়ে বড় গুরুজন, বড় মঙ্গলাকাঙক্ষী, আমি সেই দোহাই দিয়ে আপনাকে বলছি, আপনি আপনার সন্তানের আয়ুর দিকে তাকিয়ে এত নিষ্ঠুর হবেন না।'

'তবু তুমি তর্ক করছো?'

'যদি অপরাধ ক'রে থাকি ক্ষমা করুন, সমস্ত শাস্তি আপনি আমাকে দিন, কিন্তু—'

'ওসব থিয়েটারি ঢং এ বাড়িতে চলবে না।'

'আমি বলছি আপনাকে, এই মুহূর্তে আমরা নানা রকম অভাবে—'

'য্‌ যাও।' প্রচণ্ড গর্জনে প্রায় লাফিয়ে খাট থেকে নেমে পড়লেন দারুকেশ্বর। কেঁপে উঠে থেমে গেল ছোট বৌ। দারুকেশ্বর আঙুল দিয়ে তাকে দরজা দেখিয়ে দিলেন।

ছোট বৌ সন্তানসম্ভবা, রীতিমতো ভারি মাস। ঘরে এসে কতক্ষণ পর্যন্ত যেন নিঃশ্বাস নিতে পারলো না। এবার অসম্ভব শরীর খারাপ হ'য়েছে তার। রাত্রে ঘুম হয় না, খিদে হয় না, খেলে হজম হয় না। সর্বেশ্বর চিন্তা করবে ব'লে সর্বদাই দেহের সমস্ত কষ্ট সে লুকিয়ে রাখে। কিন্তু যতই রাখুক, সময় তো হ'য়ে এলো। একটা ব্যবস্থা তো আছেই সন্তানের জন্মের সময়ে, চিন্তাও আছে। সর্বেশ্বরের উদ্বেগ উৎকণ্ঠার কথা ভেবে কাল সারারাত ছোট বৌ ছটফট করেছে, অশান্তি ভোগ করেছে, তখন থেকেই মনে মনে স্থির করেছিলো একবার গিয়ে সে দারুকেশ্বরের কাছে দাঁড়াবে, দারুকেশ্বর তার পিতৃস্থানীয়, তাঁর কাছে কিসের অভিমান, কিসের লজ্জা! সত্যি বলতে রাগের কারণটা তো সেই-ই, তার আচরণই তো দারুকেশ্বরকে ক্ষিপ্ত করেছে? না হয় সেখানে নতি স্বীকারই করলো। যদি সর্বেশ্বরের শান্তি হয়, তার জন্য এটুকু কি খুব বেশী?

কিন্তু যা হবার নয় তা হয় না। যার ভিতরে যা নেই তা আশা করা বোকামি। ব'সে থাকতে থাকতে হঠাৎ ছোট বৌ শক্ত পায়ে শক্ত মুখে উঠে দাঁড়ালো, ঘুরিয়ে প'রে নিল শাড়িটা, মাথাটা আঁচড়ে নিল, তারপর ঘুমন্ত ছেলেকে ঘরে রেখে বাইরে থেকে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে সোজা বেরিয়ে এলো রাস্তায়।

ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ, কয়েক পা হেঁটে তবে বড় রাস্তার মোড়, মোড়ের মাথায়ই এক স্যাক্‌রার দোকান। এদিক ওদিক তাকিয়ে সেখানেই ঢুকলো সে, হাত থেকে খুলে রাখা দশগাছা চুড়ির ছ'গাছা ব্যাগ থেকে বার ক'রে বিক্রি করলো মাপিয়ে। পুরোনো দিনের গড়ানো চুড়ি, ওজন আছে বেশ। ছ'গাছা চুড়ির সোনার বিনিময়ে মোট পাঁচশো তিয়াত্তর

টাকা চোদ্দো আনা হাতে এলো তার। আর দাঁড়ালো না। একটু এগিয়ে পাড়ার প্রবীণ ডাক্তার নীলমাধব সেনকে সন্ধ্যাবেলা যেতে বলে ফিরে এলো বাড়ি।

পাড়ায় নীলমাধব সেনের খ্যাতি আছে ডাক্তারিতে, রীতি মতো সম্মানিত ব্যক্তি। আর ভিজিটটাও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য রকমের বেশী। তাঁর চলনে বলনে পোষাকে সর্বত্রই লেখা আছে সে কথা। যে কোনো বাড়িতেই তাঁকে কল দেওয়া মানে বেশ বিশেষ অবস্থা বলে ধ'রে নিতে হয়। দারুকেশ্বরের গৃহেও এই তাঁর প্রথম পদার্পণ নয়। দারুকেশ্বরের রক্তের চাপ যখন তাঁকে চেতনাহীন ক'রে ফেলে, ছেলেরা তখন উপায়হীন হ'য়ে বেশী ভিজিট দিয়ে নিয়ে আসে এই ডাক্তারকে। তাই নীলমাধব সেন সশব্দে এসে পরিচিত ভঙ্গীতে প্রথমে দারুকেশ্বরের ঘরের ভিতরেই উঁকি মেরেছিলেন, কাজ করতে করতে অবাক হ'য়ে মুখ তুলে তাকিয়েছিলেন দারুকেশ্বর। ছোট বৌ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানালো, 'ও ঘরে নয়, এ ঘরে আসুন ডাক্তারবাবু।'

'ও।' ফিরলেন ডাক্তার, স্টেথেসকোপটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে ঠুকতে ঠুকতে বললেন, 'অসুখটা তা হ'লে দারুকেশ্বরবাবুর নয়?'

'আজ্ঞে না, তাঁর ছেলের।'

'তাঁর ছেলের। কার?'

'আমার স্বামীর।'

'আপনার স্বামীর!'

এক পাড়ার লোক, বিশেষত এ পাড়ায় দারুকেশ্বর এবং তিনিই বোধহয় পুরোনোতম বাসিন্দা, সুতরাং এক পরিবারের খবর অন্য পরিবারের কানে কিছু কিছু পৌঁছয় বই কি। বিশেষ ক'রে দারুকেশ্বর মজুমদারের খবর। তাই এ বাড়ির পক্ষে এই মেয়েটিকে বুঝি বা একটু অন্যরকম লাগলো ডাক্তারের। হয়তো সেই জন্যই ভালো ক'রে তাকালেন তিনি। সদর দরজা দিয়ে ঢুকে একফালি করিডোর পেরিয়ে তবে ছোট বৌ'র ঘর। গলিতে কম পাওয়ারের আলো ছিলো একটি, কিন্তু জরুরী প্রয়োজন না হ'লে কারো জ্বালাবার হুকুম ছিলো না। কেউ জ্বালাতোও না। ভুলেই থাকতো আলোটার কথা। ডাক্তারকে পথ দেখাতে, আজ জ্বাললো ছোট বৌ, আর জ্বাললো বলেই চকিত হ'য়ে বড় বৌ, মেজ বৌ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে চোখ বড় বড় করলো, 'কে রে?'

'কে!'

'ওমা, এ দেখছি ডাক্তার!'

'ডাক্তার!'

'সেই নীলমাধব ডাক্তার। সে বার বুড়োর অসুখের সময় এসেছিলো—'

'নীলমাধব ডাক্তার! কেন রে?' বড় বৌ ছেলেকে ঘুম পাড়ানো ফেলে এগিয়ে এলো মেজ বৌয়ের কাছে, মেজ বৌ এলো ছোট বৌয়ের ঘরের দিকে। বুড়ো আঙ্গুলের নখে ভর দিয়ে শরীরটা দূরে রেখে গলা বাড়িয়ে পর্দার ফাঁকে উঁকি মেরে ফিস ফিস ক'রে

বললো, 'দাঁড়াও দেখি আগে কার অসুখ।'

'ওমা, অসুখ আবার কার?' মুখ বাঁকালো বড় বৌ। 'সবাই-ই তো দেখি দিব্যি হেসে খেলে বেড়াচ্ছে। বাপ তাড়িয়েছে ব'লে কারো তো একটু ইয়েও দেখি না।'

'আর ভিজিটটাই বা কে দিলো বলো দেখি। তলায় তলায় ভাব ক'রে নেয়নি তো বুড়োর সঙ্গে?'

'হ'তে পারে। তুক ক'রে তো স্বামীকে ভেড়া বানিয়েছে, আবার শ্বশুরকে এসে কী ফুস মন্তর দিয়েছে কে জানে।'

'অদ্ভুত মেয়ে বাবা। ঐটুকু তো বয়েস—'

হঠাৎ পর্দা ঠেলে ছোট বৌকে বেরিয়ে আসতে দেখে চুপ করে গেল। কৌতূহল নিবৃত্তি করতে না পেরে জিজ্ঞেস করলো, 'তোর জন্য বুঝি ডাক্তার এনেছিলো ছোট ঠাকুরপো?'

'না।'

'তবে?'

'আমিই এনেছিলাম ওঁর জন্য।'

'কেন ওর আবার কী হ'লো?'

'পেটে ব্যথা হয়েছিলো।'

'ও বাবা, পেটের ব্যথাতেই এত বড় ডাক্তার? ভিজিট দিলে কে?'

'আমি।'

'তুই! কেন, বুড়ো দিলো না?'

'উনি কেন দেবেন?'

'আহা, ওরই তো ছেলে।'

'ছেলের সঙ্গে ওঁর কিসের সম্পর্ক?'

'যা বলেছিস। বুড়োর আবার ছেলে আর মেয়ে। সাক্ষাৎ পিশাচ। ম'রে শেষে যখ দেবে দেখিস।'

ঘর থেকে দারুকেশ্বরের গলা খাঁকারি শোনা গেল, ছিটকে দুই বৌ দুই দরজা দিয়ে যার যার ঘরে ঢুকে গেল। ছোট বৌ অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইলো সেদিকে। তারপর ডাক্তারকে বিদায় দিয়ে কাজ সেরে ঘরে এসে ভাবতে বসলো সমস্ত বাড়ির ভাড়া যদি চল্লিশ টাকা হয়, তা হ'লে এই একখানা ঘরের ন্যায্য ভাড়া কত হওয়া উচিত। অনেক ভেবে চিন্তে শেষে পুরো চল্লিশ টাকা ভাড়াই শ্বশুরকে পাঠিয়ে দিল।

সর্বেশ্বর এ নিয়ে তর্ক তুলেছিলো, বাবার সঙ্গে একটা কড়া রকমের বোঝাপড়া করতে যেতে চেয়েছিলো, ছোট বৌ ধ'রে রাখলো শক্ত ক'রে, বললো, 'এ সব ব্যাপার নিয়ে আর নোংরামি নয়। যতদিন আর একটা ঘর খুঁজে না পাই এ ভাবেই চলুক।'

'না তা হয় না।' ঘরময় অস্থির পায়ে হেঁটে বেড়ালো সর্বেশ্বর, 'অন্যায়। ভীষণ অন্যায়। এই কষ্ট ক'রে একটা বারান্দায় পড়ে থাকার জন্য এত মূল্য দিতে হবে?'

'উপায় কী?'

'উপায় আছে। প্রতিবাদ করতে হবে, অন্যায়কে অন্যায় বলতে হবে, সে অধিকার নিশ্চয়ই আমার আছে।'

'তুমি শান্ত হও।' স্বামীর বুকের উপর নিজের কোমল হাত বুলিয়ে দিল ছোট বৌ, 'তুমি ভালো থাকো তা হ'লে আর আমি কিছু চাই না।' জোর ক'রে বিছানায় বসিয়ে অসময়ে এক কাপ চা ক'রে দিয়ে খুশি করলো, চা খেতে খেতে গল্প করলো, হাসলো, স্বামীর সকল ভাবনা, সকল দুঃখ ভাসিয়ে দিল ভালোবাসার স্রোতে।

'কিন্তু তোমার হাতের চুড়িগুলো', এ কথাটা আর ভুলতে পারছে না সর্বেশ্বর, বড় লেগেছে তার। ছোট বৌ তৎক্ষণাৎ একগাল হেসে বললো, 'আরো যা আছে সব বিক্রি করবো। এতদিন যে এ বুদ্ধিটা কেন মাথায় আসেনি—'

'না, না—'

'এখন মনে হচ্ছে, নগদ অতগুলো টাকা না দিয়ে বৌদির কথামতো দাদা যদি আমাকে অন্তত আদ্ধেকটাও সোনা ক'রে দিতেন—'

'বাবার কাছ থেকে আমি তোমার দাদার সব টাকা চেয়ে নেব।'

'বাবার সঙ্গে আর একটিও কথা নয়।'

'উনি ওঁর ইচ্ছে মতোই সব করবেন?'

'এতদিনের অভ্যেস কি এত সহজে যায়?'

'মরলেও যাবে না।'

'সুতরাং চেষ্টা কোরো না। সেই চেষ্টা বরং অন্য কোনো কাজে লাগালে হাতে হাতে ফল পেতে পারবে। কিন্তু ঐ চেষ্টা নিষ্ফল।'

হয়তো তাই চুপ ক'রে গেল সর্বেশ্বর।

ধার দেনা শোধ ক'রে, বাড়ি ভাড়া দিয়ে, ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ কিনে, পাঁচশো টাকা ফুরোতে খুব বেশী সময় লাগলো না। তার উপরে মাস তিনেক পরে আর একটি সন্তান হলো ছোট বৌ'র। এটি মেয়ে। ব্যথা উঠেছিলো সকাল থেকেই, কী এক কাজের খোঁজ পেয়ে চা খেয়েই সর্বেশ্বর বেরিয়ে গিয়েছিলো, ছোট বৌ একলা ঘরে শুয়ে সারাদিন অসহ্য ব্যথায় গুমরোলো, সন্ধ্যেবেলা ফিরে এসে তবে সর্বেশ্বর নিয়ে গেল হাসপাতালে। শরীরে রক্ত ছিলো না, রক্ত কিনে দিতে হলো, যমে মানুষে টানাটানি চললো দিনকয়েক, সর্বেশ্বর উদ্‌ভ্রান্তের মতো দিন রাত পড়ে রইলো হাসপাতালের দরজায়।

হাসপাতালে দেখা করার নির্দিষ্ট সময় আছে, সে সময় পেরিয়ে গেলে সে দাঁড়িয়ে থাকতো ফুটপাথে। পা ধ'রে গেলে সেখানেই বসে পড়তো সে। কাছেই একটা চায়ের দোকান ছিলো, অসহ্য ক্ষিদে পেলে সেখানে গিয়ে খেয়ে নিতো কিছু। প্রায় পনেরো দিন

এই ভাবে কাটিয়ে স্ত্রীকে ভালো ক'রে মেয়ে সুদ্ধু বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে এলো। এ ক'দিন খোকা তার জ্যাঠাইমাদের সঙ্গেই থেকেছে। অবিশ্যি বাবা তাকে রোজই একবার ক'রে নিয়ে গেছেন মায়ের কাছে, এবার মাকে বাড়িতে আসতে দেখে খুশি হ'লো খুব। ঘুমিয়ে থাকা বোনকে আদর করলো।

বাড়ি এসেও শরীর সারতে ছোট বৌ'র অনেক সময় লাগলো। অনেক টনিক খেতে হ'লো, দুধ খেতে হ'লো, ফল খেতে হ'লো। সব জোগালো সর্বেশ্বর। স্ত্রীর প্রাণ তার নিজের প্রাণের চেয়েও প্রিয়, তার জন্য নিজেকে বিকিয়ে দেবার যে কী সুখ তা যেন রন্ধ্রে রন্ধ্রে সে অনুভব করলো। ক্লান্ত চোখ মেলে তাকিয়ে ছোট বৌ যখন তাকে কাছে ডাকে, বিশ্বসংসার ভুলে যায়, ছোট বৌ যখন নাওয়া খাওয়ার অনিয়ম নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে সব শ্রান্তি দূর হ'য়ে যায়। এক মুহূর্তের জন্যও ছোট বৌ'র কাছ থেকে দূরে থাকতে ইচ্ছে করে না তার।

নিজের ঘরে ব'সে শুয়ে সমস্ত কিছুই লক্ষ্য করেন দারুকেশ্বর। যা করেন না বা করতে পারেন না, সে খবর নিবারণ যোগায়! বৌটা যে মরতে বসেছিলো হাসপাতালে, এ খবরও যেমন তাঁর কর্ণগোচর হয়েছিলো, তাঁর অমানুষ অপদার্থ ছেলেটা যে নাওয়া খাওয়া ভুলে দিবারাত্রি সেবা করে, বড় বড় ডাক্তারের ওষুধ খাইয়ে যমের ঘর থেকে সেটাকে ফিরিয়ে এনেছে তা-ও তেমনি জানতে পারলেন। জানতে তিনি অনেক কিছুই পারলেন, দরজার পাশে কাবুলিওয়ালা যে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে থাকে সর্বেশ্বরের জন্য, তা জানতেও তাঁর দেরি হলো না। ঠোঁটের ফাঁকে অদ্ভুত একটা আনন্দের হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠলো। বৌটার নষ্টামিতে সবচেয়ে ভালো ছেলেটা ফস্কে গেছে তাঁর হাত থেকে এর সাজা কি এতই সহজ? 'তুই মরবি, পচবি, গলবি', দাঁতে দাঁত ঘষে মনে মনে বলতে থাকেন তিনি, 'অভাবে, দৈন্যে, দারিদ্র্যে, রোগে ভুগে ভুগে ধুঁকে ধুঁকে সারা হবি। তবু আমি তাকাবো না তোর দিকে, বাপকে অমান্য ক'রে বৌয়ের পা চাটবার এই শাস্তি হবে তোর। তবে তো তুই সেই পিশাচিনীকে ছেড়ে আবার আমার কাছে ফিরে আসবি। ক্ষমা চাইবি। পায়ে পড়বি। বলবি, বাঁচাও, বাঁচাও।'

কিন্তু সেদিন আর আসে না। সে ইচ্ছে তাঁর কিছুতেই পূরণ হয় না। দিনের পর দিন যায়, রাতের পর রাত আসে, ওরা দিব্যি হেসে খেলে সংসার করে। এই শোনেন অসুখ করেছে, কয়েকদিনের মধ্যেই দেখেন স্যুট বুট চাপিয়ে মশ্ মশ্ ক'রে কোথায় যাচ্ছে সর্বেশ্বর। ছেলের বৌকেও দেখেন বই কি। দিব্যি হাট করছে, বাজার করছে, হাতে ধরে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে ছেলেকে, নিয়ে আসছে চারটা বাজতে না বাজতে। বুকটা দমে যায় তাঁর, রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে আর ঘুম আসতে চায় না। বহুকাল পরে হঠাৎ স্ত্রীকে মনে পড়ে যায়, মাকে মনে পড়ে যায়, এমনকি বাবার কথাও কখন যেন ভাবতে থাকেন অন্যমনস্কভাবে।

তারপর সব ছাপিয়ে বালক সর্বেশ্বর চুপটি ক'রে কখন এসে বুকের তলায় ঘুমোয়, দারুকেশ্বর শূন্য বিছানায় হাত বুলোন। এক সময় উঠে বসেন তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি নিবারণকে ডেকে তোলেন, অকারণে ধমকে দেন খুব। কিংকর্তব্যবিমূঢ় নিবারণ অকারণে এদিকে যায় ওদিকে যায়, পাতা বিছানা আবার ঠিক করে, গোঁজা মশারি আবার গোঁজে, জল এগিয়ে দেয় দারুকেশ্বরের হাতের কাছে। যেমন হঠাৎ উঠেছিলেন, তেমনি হাঠাৎই আবার শুয়ে পড়েন দারুকেশ্বর, নিবারণও নিশ্চিন্ত হ'য়ে শোয়, আর শুয়েই ঘুম। দারুকেশ্বর তাকিয়ে থাকেন মশারির চালের দিকে। মনে হয় বিছানাটা বড় নোংরা, বড় শক্ত।

কিন্তু পিতার মতো গুরু আর কে আছে সংসারে? গুরুর গুরু মহাগুরু তিনি। তাঁর অভিসম্পাত কি একেবারে বৃথা যেতে পারে? ঘুরলে ফিরলে কী হবে, শরীরটা সর্বেশ্বরের সত্যি ভালো থাকলো না। শরীরের অপরাধও নেই কিছু, ঝড়ঝাপ্‌টা তো কম যায় নি। অভাব অভিযোগ অশান্তি সে তো নিত্য সহচর, তার উপরে স্ত্রীর অসুখের সময় যা অনিয়ম গেছে তার তুলনা নেই। রোদ বৃষ্টি, ঠাণ্ডা গরম, চিন্তা ভাবনা, ক্ষুধা তৃষ্ণা, কী না! সেই থেকেই আজ একটু সর্দি, কাল একটু মাথা ধরা পরশু হজম না হওয়া এই ক'রে ক'রে জ্বর হ'য়ে পড়ে থাকলো ক'দিন। স্বামীর দিকে তাকিয়ে ছোট বৌ'র আহার নিদ্রা চুকে গেল। দশগাছা চুড়ির অবশিষ্ট চারগাছা রুমালে বেঁধে, আবার বেরুলো সে। বিক্রি ক'রে আবার ডাক্তার ডাকলো, ওষুধ আনলো, পথ্য কিনলো। একমাস সম্পূর্ণ বিশ্রামে রেখে আপ্রাণ সেবা ক'রে ভালো ক'রে তুললো। আর ভালো হবার সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে খুব ভাল একটা চাকরীর খবর এসে গেল। আবেদন পত্র পাঠিয়েছিলো অনেক আগে, প্রায় ভুলেও গিয়েছিলো কথাটা। ট্রাম কোম্পানীতে লীগাল এ্যাড্‌ভাইসারের চাকরী, মাইনে বেশী। অথচ কাজও খুব পরিশ্রম সাপেক্ষ নয়। এমন একটা চাকরী যে এমন অনায়াসে হ'য়ে যাবে, স্বামী স্ত্রী কেউ কল্পনা করেনি। দু'জনেই অভিভূত হ'লো, কৃতজ্ঞ হ'লো।

নিবারণ ছুটে গিয়ে দারুকেশ্বরের কাছে পেশ করলো সুখবরটা, দারুকেশ্বর তাকিয়ে রইলেন কতক্ষণ, তারপর ধমক দিলেন, তারপর হিসাবের খাতা দেখতে দেখতে উপর দিকে চোখ তুলে দাঁতে দাঁত ঘষে ঈশ্বরকে শালা বললেন।

এবার বাড়ি বদলের পালা। সর্বেশ্বর বললো, 'আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না এখানে।'

ছোট বৌ বললো, 'ধারগুলো শোধ ক'রে নিলে হয় না?'

'যেখানে যাবো সেখানে বসেই ধার শোধ করা যাবে।'

'কিন্তু এখানকার ধার?'

'এখানে আবার কী ধার?'

'তোমার বাবার বাড়ি ভাড়া? চার মাস বাকি পড়েছে যে। রোজ তাগাদা দেন।'

'ও।'

'অন্য বাড়িতে যাবার আগে এটা দিয়ে যেতে হবে, নইলে দু'টো বাড়ির ভাড়া কেমন করে দেবে।'

সেটা ঠিক। বিমর্ষ মুখে চুপ করলো সর্বেশ্বর।

যখন সর্বেশ্বরের অসুখ চলছিলো, এই বাড়ি ভাড়া সেই সময়কার বাকি। ছেলেকে সুস্থ শরীরে ঘোরা-ফেরা করতে দেখে, খেয়েদেয়ে সাজপোষাক ক'রে চাকরিতে যেতে দেখে সারা শরীর জ্বলে গেল দারুকেশ্বরের। আর এক মুহূর্ত তিনি তাগাদা দিতে দেরি করলেন না বাড়িভাড়ার জন্য। কত ভেবেছিলেন, এবার বুঝি কঠিন হাতে পড়বে। উপায়হীন হয়ে ঠিক এসে ধন্না দেবে তাঁর দরজায়। লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবেন বৌটাকে। কিছুই হ'লো না। ছেলেকে আলাদা করে দিয়েছেন, সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছেন, তবু যেন যথেষ্ট শাস্তি পাচ্ছে না ওরা। রোগে ভুগছে, দেনায় তল হয়েছে তবু ভেঙে পড়ছে না। একটা সুখের আভাসে, শান্তির আশ্বাসে ওরা যেন সর্বদাই তৃপ্ত, ধৈর্যশীল। হেরে যাচ্ছেন দারুকেশ্বর, যত হারছেন তত জেদ বাড়ছে তাঁর, তত রাগ বাড়ছে।

হয়তো এই রাগের ফলেই আবার ব্লাডপ্রেসার বেড়ে হুলুস্থূল হ'লো বাড়িতে। বড় বৌ মেজ বৌ আশান্বিত হৃদয়ে ভাবতে লাগলো, বুড়োকে কোন্ খাটটায় চড়িয়ে শ্মশানে পাঠাবে, বড় ছেলে, মেজ ছেলে বাবা ব'লে হুমড়ি খেয়ে শিয়রে ব'সে শোকের প্রতিযোগিতায় এ ওকে হার মানাতে চেষ্টা করলো, ছোট ছেলে গুম হয়ে বসে রইলো নিজের ঘরের মধ্যে, ছোট বৌ রাগ অভিমান ভুলে কাছে এসে দাঁড়ালো। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বুড়ো দারুকেশ্বর কিন্তু আবার ফিরে এলো মরার ঘর থেকে।

ভালো হয়ে নিভৃতে খোদ চাকর নিবারণকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার অসুখের সময় কে কে আমাকে দেখতে এসেছিলো রে?'

নিবারণ বললো, 'আজ্ঞে কর্তা, পিতিবিশিরা সব্বোদাই খোঁজখবর নিতো।'

দারুকেশ্বর খিঁচিয়ে উঠলেন, 'গর্দভ কোথাকার। প্রতিবেশীর কথা কে জিজ্ঞেস করেছে তোকে?'

'তবে কর্তা কার কথা বলবো।'

'কার কথা আবার, বাড়ির লোকের কথা বলবি। দাদা-বাবুদের কথা বলবি।'

'ও।' হদিস পেয়ে একগাল হাসলো নিবারণ। 'তা দাদাবাবুরা খুব করেছে বটে। সারাদিন দোঁড়িয়ে থেকেছে, ডাক্তার ডেকেছে—'

'কোন্ দাদাবাবু বেশী করেছে?'

চিন্তা করলো নিবারণ, চোখ কুঁচকে বললো, 'তা দুই দাদাবাবুই বোধহয় সমান—'

'দুই দাদাবাবু। আর কেউ না?'

'বৌদিরাও আছেন।'

'রেখে দে বৌদিদের কথা—আগে দাদাবাবুদের কথা বল।'

'আজ্ঞে ঐ বললাম তো বড়দাদাবাবু ডাক্তার ডেকেছেন, মেজদাদাবাবু শিয়রে থেকেছেন—'

'আর?'

'আর! ও।'

কর্তার আসল প্রশ্নটা এতক্ষণে বুঝলো নিবারণ। হাত উল্টে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'না, ছোটদাদাবাবু ঘরে আসেন নি। তবে ছোট বৌদি যা সেবা করেছেন না দেখলে—'

'ঘরে আসেনি?'

'আজ্ঞে কর্তা না।'

'ছোট বৌকে ঢুকতে দিয়েছিলি কেন?'

'তিনি তো নিজেই এসেছেন, কেউ তো ডাকেনি তাকে। তবে একথা আমি বলবোই কর্তাবাবু, ছোট বৌমা না এলে আপনাকে বাঁচানো কঠিন হ'তো। দু'হাতে কে অমন ময়লা ঘাঁটতো? বিছানাপাটি দেখেন তো—'

'যা যা বেশী বকতে হবে না তোকে। কাজের নামে অষ্টরম্ভা, কেবল বাজে কথা। শোন্, লোকটার তো শুনেছি অসুখ করেছে, খেতে পায় না, তবে এত তেজ কিসের? শুনে রাখ এর ফল একদিন সে পাবেই, পাবেই, পাবেই।' কাজের দপ্তর খুলে বসলেন দারুকেশ্বর, তাঁর ক্রুদ্ধ অশিষ্ট ব্যবহারে অধীনস্থরা তটস্থ হ'য়ে উঠলো।

এর পবে ঈশ্বর দারুকেশ্বরকে সত্যি দয়া করলেন, তাঁর অনমনীয় অহংকার, রাগ, ব্যর্থতা এবং প্রতিশোধ স্পৃহাকে সার্থক ক'রে আবার সর্বেশ্বর বিছানা নিল। এবার সত্যি শক্ত হাতেই পড়লো। ডাক্তার বললেন, 'বেশ কিছুদিন বিশ্রাম নিতে হবে।' সর্বেশ্বর বললো, 'নতুন চাকরী, এত ছুটি পাবো কেমন ক'রে।'

ডাক্তার বললেন, 'তা বললে চলবে না।' তার পর তিনি মস্ত একটা সার্মন দিলেন। 'আপনার একমাত্র চিকিৎসাই হচ্ছে আপনার বিশ্রাম। অন্তত একটা বছর। আপনি ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত ক্লান্ত, আপনার রক্তের চাপ আপনার বয়েসের পক্ষে অত্যন্ত কম, হৃদ্‌যন্ত্র ভালো না, তার উপরে অজীর্ণ রোগে ধরেছে। আপনার এখন প্রধান কর্তব্য হচ্ছে চেঞ্জে যাওয়া, সারাদিন খোলা আকাশের তলায় একখানা ডেক চেয়ারে বসে সামান্য গল্প গুজব করা বা হাল্কা কোনো বই পড়া আর খুব ভালো ক'রে খাওয়া। প্রোটিন ফুড খেতে হবে। ঐ বাঙালীর চিরাচরিত শাক ভাত খাওয়া নয়, জাঁদরেল ইয়োরোপীয়ানদের মতো ভেড়া খাসি গরু ইত্যাদির হাড় মাস চিবোনো। ডিম খাবেন, সঙ্গে ব্যালেন্স রেখে ফল খাবেন—'

মাথা নিচু ক'রে সব শুনলো সর্বেশ্বর, তার পর ভিজিট দিয়ে বিদায় দিল ডাক্তারকে। আর তার পরে জামা জুতো পরে বেরুব্বার উদ্যোগ করলো। ছোট বৌ বললো, 'এ কি! কোথায় যাচ্ছো?'

'কাজে। ডাক্তারের কথা শুনতে গেলে আমার চলবে না। এই ক'দিনের বিশ্রামেই আমি

বেশ ভালো বোধ করছি।' ছোট বৌ চোখে চোখে তাকিয়ে রইলো একটু, তারপর কাছে এসে বোতাম খুলে জামাটা ছাড়িয়ে নিল, নিচু হ'য়ে জুতোর ফিতে খুলে দিল, হাত ধ'রে বসিয়ে দিল খাটে।

দশগাছা চুড়িই না হয় গেছে, আরো তো আছে। সর্বদা পরবার সরু হার আছে, মায়ের গলার স্মৃতিচিহ্ন মস্ত মফচেনটা আছে, কানের দুল আছে দু'জোড়া, উপহারের আংটি আছে তিনটে, রূপোর সিঁদুরের কৌটো আছে কতকগুলো—তার বিনিময়েও কি ডাক্তারের নির্দেশ মানার মতো অর্থ আসবে না হাতে? সুতরাং ছোট বৌ আবার বেরুলো। কেবল মায়ের গলার হারটা বিক্রি করবার সময়ে একটু কামড় পড়লো বুকের মধ্যে। এই হারটা যে মাকে ছেলেবেলায় পরতে দেখেছে। এই হারটার মধ্যে মায়ের ছোঁয়া লেগে আছে। তা হোক, বরং এই হারটার বিনিময়ে যা পাওয়া যাবে সেটাই সর্বেশ্বরের পক্ষে সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ হবে।

বহুদিন পরে দাদাকে চিঠি লিখতে বসলো একটা।

'দাদা, অনেকদিন তোমাদের খবর পাই নি, আশা করি, টুলু, বিলু, ছোটুকে নিয়ে তুমি আর বৌদি ভালো আছো। সেই যে শীতকালে একবার এসে দেখে গেলে আর তোমার দেখা নেই। আমার পাঁচ বছর যাবৎ বিয়ে হ'য়েছে, মাত্র একবার তোমাদের দেখেছি। মেয়েদের বিবাহ যে পিত্রালয়ের সঙ্গে কী ভয়ঙ্কর বিচ্ছেদ তা খুব ভালো ক'রেই অনুভব করতে পারছি। অবিশ্যি নিজেদের দেশ এখন আমাদের বিদেশ হ'য়েছে ব'লেই হয়তো এই দশা হয়েছে। যাই হোক এবার আমি মাস কয়েকের জন্য যাবোই স্থির করেছি। তার জন্য ভিসা, পাসপোর্ট ইত্যাদি যা যা করণীয় ক'রে নেবো। তোমার ভগ্নিপতির শরীরটা কিছুকাল যাবৎ ভালো যাচ্ছে না। ওখানে, আমাদের ঢাকার খোলা মেলা বড় বাড়িতে গিয়ে কিছুদিন থাকলে হয়তো ওঁর একটা পরিবর্তন হবে। তুমি চিঠি লিখলেই আমি যাবার আয়োজন করবো।'

চিঠি পেয়েই দাদা জবাব দিলেন, 'কবে আসবি জানা। আমি তোদের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে প্রতীক্ষা করে থাকবো।' তারপর লিখলেন, 'তোকে কয়েকটা কথা জানানো দরকার। দেনার দায়ে আমাদের ঢাকার বাড়িটা নীলেম হয়ে গেছে। সেই জন্যই সব নিয়ে এখন আমরা দেশের বাড়িতে আছি, এখানে এসেই তোর বৌদি হঠাৎ পুকুর ঘাটে পড়ে গিয়ে কোমর ভেঙে শয্যাশায়ী হয়েছেন। ছ'মাস হ'য়ে গেল, এখনও তিনি সেরে উঠলেন না। ছেলেদের নিয়ে সংসার আমার নরক হ'য়ে উঠেছে। তলায় তলায় অনেক দিন আগেই ক্ষয়ে গিয়েছিলাম, এখন নৌকোয় স্রোতের মতো জল ঢুকছে, অর্থাৎ ডুবতে আর দেরী নেই। তবু তার মধ্যে এইটুকুই সান্ত্বনা তুই এই অভাবের মধ্যে নেই, যে ভাবে হোক তোকে আমি দারিদ্র্যের এই অন্ধকার থেকে আলোর দরজায় পৌঁছে দিতে পেরেছি।

এ সব কথা এতদিন জানাইনি ব'লে রাগ করিস না। দুঃখ পাবি ব'লেই লিখিনি। কিন্তু এখন যদি আসিস, তা হ'লে নিজের চোখেই দেখবি সব, হঠাৎ ধাক্কা লাগবে। অসুস্থ স্বামী

নিয়ে এসে সেই মনখারাপের মধ্যে যাতে আবার এই আঘাতটা না পাস সেজন্যে আগেই সব জানালাম।

বাড়িটা গিয়েই যে আমি সম্পূর্ণ ধারমুক্ত হ'তে পেরেছি তা নয়। তোর বিয়ের সময়কার আরো কিছু দেনা এখনো আমি শোধ ক'রে উঠতে পারিনি। এই চৈত্রে একটা কিস্তি যেমন ক'রে হোক দিতেই হবে আমাকে। সর্বেশ্বর যদি এই দুঃসময়ে আমাকে কিছু সাহায্য করতে পারে বড় উপকার হয়। আমার অবস্থা নিশ্চয়ই তুই বুঝতে পারবি।

আবার লিখি, তোর জন্য, তোর ছেলেমেয়েদের জন্য, আমি আশাপথ চেয়ে ব'সে রইলাম। আসিস। তোর বৌদিও তাই লিখতে বললেন। ইতি—

তোর হতভাগ্য দাদা লোকনাথ মিত্র

চিঠি পেয়ে এবং প'ড়ে স্তব্ধ হলো ছোট বৌ। তার চিরাচরিত অভ্যাস মতো জানালায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলো আকাশের দিকে। সেদিন তার খাওয়া হ'লো না, নাওয়া হ'লো না, বুকের ভিতরটা ফাঁকা মনে হ'লো।

সর্বেশ্বর বললো, 'কার চিঠি?'

ছোট বৌ বললো, 'দাদার।'

কী লিখেছেন?'

'এই সব সংসারের খুঁটিনাটি আর কি।'

'ভালো আছেন সব?'

'হ্যাঁ।'

'অনেক দিন আসেন নি, আসতে লেখো না একবার।'

ঘুমন্ত মেয়েকে অনর্থক কাঁদিয়ে কোলে নিয়ে চাপড়াতে চাপড়াতে মুখ ফিরিয়ে ছোট বৌ অস্ফুটে বললো 'লিখবো।'

সমস্ত গহনা বিক্রির পুরো আটশো টাকা থেকে চারশো টাকা সেদিনের ডাকেই দাদাকে মণিঅর্ডার করে দিল ছোট বৌ. তারপর রাত্রে বসে আবার চিঠি লিখলো, 'দাদা, সমস্ত খবর শুনে বড় কাঁদতে ইচ্ছে করলো, কিন্তু চোখে জল এলো না। এ বিষয়ে আমার প্রতি ঈশ্বরের কৃপণতা অসীম।

তোমার এই দুঃসময়ে মাত্র এই সামান্য টাকা ক'টা পাঠাতে আমার খুব লজ্জাও হচ্ছে, দুঃখও হচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই। তোমার ভগ্নিপতির পিতা ধনীব্যক্তি হ'তে পারেন কিন্তু ভগ্নিপতি তা নয়। তাঁর হাতে এই সময়ে এর চেয়ে বেশী ছিলো না। যদি তোমার তিলতম কাজেও এই ক'টা টাকা ব্যয় হয় আমি ধন্য হবো, সার্থক হবো।

ডাক্তার বলছেন, তোমার ভগ্নিপতির এখন কলকাতায় থেকে চিকিৎসা করানোই ভালো, তাই তোমাদের কাছে যাওয়াটা আপাতত পিছিয়ে দিতে হ'লো। সে জন্য দুঃখ কোরো না। সংসারটা বড় গোলমেলে জায়গা, সেখানে ইচ্ছার কোনো দাম নেই। সর্বদা

তোমাদের খবর আমাকে জানিয়ো, আমি যে কত অস্থির থাকবো, তা তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে। ইতি—

তোমাদের মাধবী

পাঁচ

সর্বেশ্বরের অসুখের চেহারাটা কিন্তু তেমন ভয়াবহ নয়। ওঠে, বসে, খায়, মাঝে মাঝে রাস্তার ধারে গিয়েও দাঁড়ায়। ডাক্তারের সমস্ত আদেশ নির্দেশই সর্বতোভাবে পালন করছে ছোট বৌ। খাওয়া-দাওয়ার এতটুকু ত্রুটি হ'তে দিচ্ছে না, ছুটে ছুটে নিজেই বাজারে যাচ্ছে, মুরগী আনছে, স্যুপ বানাচ্ছে, ফল মিষ্টি দুধ—শুধু চেঞ্জেই নিয়ে যেতে পারলো না, আর বাড়িটা বদলানোও সম্ভব হ'লো না।

দেখতে দেখতে দু'টো মাস কেটে গেল। আপিসের ছুটি ফুরিয়ে গেল। কিন্তু সর্বেশ্বরের শরীরে এক ফোঁটা বেশী বল সঞ্চয় হ'লো না, রক্তের নিচু চাপ এক সংখ্যা উঁচুতে উঠলো না। বরং দিন দিন তার খাওয়ার ইচ্ছে কমে যেতে লাগলো, হজমের গোলমাল দ্বিগুণিত হ'লো, আর ছোট বৌ'র হাতের পুঁজি শূন্যে এসে ঠেকলো। সর্বেশ্বর বললো, 'আমাকে এবার কাজে যাবার অনুমতি দাও তুমি, ব'সে ব'সেই আমার শরীর বেশী খারাপ হচ্ছে।'

ছোট বৌ চোখ নিচু ক'রে কাছে এসে দাঁড়ালো. বুকের আঁচলটা ভিজে গেল তার। সর্বেশ্বর ঐ শরীর নিয়েই আপিসে গেল ট্যাক্সি ক'রে, কাজে জয়েন না করলে চাকরী যাবে, খাবে কী? শরীরটাকে টেনে টেনে মাস দুই নিয়ে যেতে পারলো বটে, কিন্তু তৃতীয় মাসেই আবার বিছানা নিতে হ'লো। আবার ডাক্তার এলেন, আবার আদেশ নির্দেশের শিলাবৃষ্টি। ছোট বৌ এবার অন্ধকার দেখলো চারদিক।

ঠিক এই রকমটাই চেয়েছিলেন দারুকেশ্বর, এই রকমই একটা নিরুপায় অবস্থা। নিবারণের কাছে সব শুনে ভিতরে ভিতরে তিনি উল্লসিত হ'য়ে উঠলেন। প্রত্যেক মুহূর্তে আশা করতে লাগলেন. তাঁর দয়ার ভিখিরী হ'য়ে অপদার্থটা ছেলেপুলে নিয়ে এলো বলে দরজায়, হাত্ত পাতলো বলে। মনে মনে তিনি দৃশ্যটাকে সাজান আর ভাঙেন, নরম হন আর গরম হন। আর উপভোগ করেন।

এই রকম ক'রে ক'রেই কেটে যেতে লাগলো দিন। কিন্তু দারুকেশ্বরের স্বপ্নকে সার্থক ক'রে না ছেলে না বউ—কেউ এসে দাঁড়ালো না কাছে; দোষ করেছি, অন্যায় করেছি ব'লে কেউ ক্ষমা চাইলো না, সাহায্য চাইলো না। কেবল বাড়িভাড়াটা আবার বাকী পড়লো দু'মাসের। তখন তিনি সেই ছিদ্রটুকু অবলম্বন ক'রেই মরিয়া হ'য়ে উঠলেন। বাড়িভাড়ার

তাগাদায় জর্জরিত ক'রে তুললেন ছেলে-বৌকে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে গালাগালি দিলেন, সাতদিনের মধ্যে ভাড়া না পেলে বার ক'রে দেবেন ব'লে শাসালেন। সাত দিন সময় যখন দিয়েছেন, অপেক্ষা করতেই হলো। আট দিনের দিন সকাল বেলা এক টুকরো কাগজ নিয়ে ঘরে ঢুকলো নিবারণ। সর্বেশ্বর লিখেছে, 'মৃত্যুর আগে অবশ্যই আপনার বাড়িভাড়া আমি পরিশোধ ক'রে দেবো।' উপরে কোনো সম্বোধন নেই। তলায় নাম স্বাক্ষর করা আছে।

চিঠিটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন দারুকেশ্বর. অনেকক্ষণ ধ'রে পড়লেন। তারপর যেন চটকা ভেঙে চেঁচিয়ে ডেকে উঠলেন, 'মহেশ।'

'আজ্ঞে।' স্নানের ঘর থেকে গামছা পরিহিত প্রায় অর্ধ উলঙ্গ মহেশ্বর ছুটে এলো এ ঘরে।

দারুকেশ্বর গর্জন করলেন, 'কী করছিলি তুই? রোহিত কোথায়?'

'আজ্ঞে তিনি তো বৌদিকে বালেশ্বরে পৌঁছে দিতে গেছেন। তারপর সেখান থেকে উড়িষ্যায় যাবেন সেই বড় অর্ডারটা—'

'জানি, আর বলতে হবে না। চাকরটা কোথায়?'

'ডেকে দেবো?'

'না। তুমি শোনো—' তুই থেকে তুমি সম্বোধনেই বোঝা গেল খুব জরুরী কথা আছে এর পরে, 'আমাদের পুবের ঘরে ভাড়াটেরা থাকে, দু'মাস তারা বাড়িভাড়া দেয়নি।'

অবাক হ'য়ে মহেশ্বর বললো, 'ভাড়াটে বলছেন কাকে?'

'কাকে আবার, জানো না। এই দ্যাখো'—সর্বেশ্বরের চিঠিটা মেলে ধরলেন তিনি, 'তোমার উপর এই ভাড়া আদায়ের ভার দিলাম। তিন দিন তিন রাত্রির মধ্যে আমার ভাড়া চাই।'

'আজ্ঞে শুনছি, ওর বড় অসুখ, ছোট বৌমা সারাদিন—'

'চুপ করো। কার অসুখ আর কে সারাদিন কী করছে, তা আমি শুনতে চাই না। চাই আমার ভাড়া। ব্যস।'

'আমি এখুনি স্নান ক'রে খেয়ে হাওড়া যাবো, আমার ট্রেন —'

'ট্রেন! তুমি আবার যাচ্ছো কোথায়?'

'আপনি আজকাল সব ভুলে যান। কাল রাত্রে আপনি তো রাঁচি যাবার কথা বলেছেন।'

'ও।'

'তাই বলছিলাম, ভাড়া আদায়ের জন্য'—

'চুপ করো।' দারুকেশ্বর গর্জে উঠলেন, 'সব তোমরা এক ঝোপের বাঁশ। ঐ লোকটা ভাড়া দিক আসলে সেটাই তোমার ইচ্ছে নয়। তলায় তলায় নিশ্চয় সাহায্য করো।'

'না।'

'নিশ্চয় করো।'

'আজ্ঞে না।'

'ঠিক বলছো?'

'ঠিক বলছি।'

'না করলে ওদের চলে কী করে?'

'জানি না।'

'তোমার কাছে চায় না?'

'না। সর্বা নাকি বলেছে আপনার এক পয়সাও সে আর ছোঁবে না।'

'কী!'

'বলেছে, যেহেতু আমি আর দাদা আপনার অধীন, এখনো আপনারটাই খাই পরি তাই আমাদের সাহায্যও সে নেবে না কোনোদিন।'

'এত! এত তেজ! বেশ। দেখা যাক কদ্দিন চলে। বুকে হাঁটতে হাঁটতে আসে কিনা আমার দরজায়।'

'বৌমা বোধহয় তাঁর গয়না বেচে চালাচ্ছেন, তবে শুনছি এখন আর—'

'চলছে না। অর্থাৎ কিছু টাকা দাও, এই তো? ব'লে দিও আমার দ্বারা ওসব হবে না। তবে হ্যাঁ, বাড়ির উপর যখন রয়েছে, আর এটা যখন একটা ব্যারাম পীড়ার ব্যাপার, ডাক্তার ডাকতে হ'লে ধার দিতে পারি, ওষুধপথ্যের জন্য আরো না হয় কিছু ধ'রে দেওয়া যাবে।'

'আমি ওদের জানিয়ে দেবো, সে কথা।'

'হ্যাঁ, আর একটা কথাও জানিয়ে দিও, তেমন ধরাধরি করলে, ঐ অসুস্থ লোকটার জন্য, মানে, বলছিলাম যে, লোকটার অসুখই করেছে, তখন তো আর তাড়িয়ে দেওয়া যায় না, না হয় বাড়িভাড়াটাও মাপ ক'রে দেওয়া যাবে।'

'তা-ও বলবো।'

'কী বলবো বলবো করছো, এখুনি বলো গিয়ে। একটা ডাক্তার ডেকে দেখাক ভালো ক'রে, কেবল লম্বা লম্বা বক্তৃতা।' গরগর করতে করতে ঘরে ঢুকে গেলেন দারুকেশ্বর। গামছাপরা মহেশ্বরও হাঁফ ছেড়ে বেঁচে পালালো।

সেই দুপুরে রাড়িটাতে হঠাৎ বড় নির্জন বোধ করতে লাগলেন দারুকেশ্বর। যদিও নির্জন বাড়িই তিনি পছন্দ করেন, ছেলেপুলের কান্নাকাটি বায়না আবদার এসব শুনলেই ছুটে গিয়ে তাদের মাথায় ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা ক'রে দিতে ইচ্ছে করে, কিন্তু আজকের এই নির্জনতা যেন তাঁকে অদ্ভুত একটা দমচাপা অন্ধকারে নিয়ে গেল। যেখানে শুধু জনপ্রাণীই নয়, গাছপালা পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন। একটা অন্ধকারের মরুভূমি। হাঁক দিলেন, 'নিবারণ।' ক্লান্ত হ'য়ে নিবারণ সবে একটু গা এলিয়ে ছিলো দৌড়ে ছুটে এলো।

'ঘুম আর ঘুম, তিনি খিঁচিয়ে উঠলেন, ঘুমোবার জন্যই রেখেছি তোমাকে, না?'

'আজ্ঞে আমি তো ঘুমুইনি?'

'তবে এতক্ষণ ছিলে কোথায়?'

'মেজোবাবুকে ঠিক ঠাক ক'রে দিলুম, তারপর গাড়ি ডেকে মাল তুলে—'

'থাক থাক, আর কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। পা টেপ।' নিঃশব্দে নিবারণ পা টিপতে বসলো।

একটু সময় চুপ ক'রে থাকলেন দারুকেশ্বর, বুঝি চোখে একটু তন্দ্রা লেগে এলো। তক্ষুণি জেগে উঠলেন, 'বাড়িটা আজ এত চুপচাপ লাগছে কেন বলতে পারিস?'

নিবারণ বললো, 'আজ্ঞে, সারা বাড়ি খাঁ খাঁ, কোনো ছেলে-পুলে নেই, দাদাবাবুরা নেই, বৌদিরা—'

'কে বললো, নেই,' দারুকেশ্বর চটে উঠলেন, 'ঐ ঘরে যে আর একটা লোক তার পরিবার নিয়ে আছে, তা বুঝি ভুলেই মেরে দিয়েছ?'

'না কর্তা, ভুলবো কেন। তবে তেনারা আলাদা কিনা।'

'আলাদা তো কী হ'য়েছে। না হয় খায় না একসঙ্গে, কিন্তু থাকে তো।'

'এ দিকের দরজাটা সারাদিনই বন্ধ থাকে, নিতান্ত দরকার না পড়লে কেউ তো আসে না এদিকে—ঘরের মধ্যে যে কী হচ্ছে, না হচ্ছে—'

'এক বাড়িতে বাস ক'রে কিছুই জানতে পার না, না?' সব কথাতেই রেগে আছেন দারুকেশ্বর। নিবারণ চুপ করলো।

'যা, এখন গিয়ে দেখে আয়, দরজাটা খোলা কি না।'

পা টেপা ছেড়ে দেখে এলো নিবারণ।

'কী দেখলি?'

'দরজা বন্ধ কর্তা।'

'আচ্ছা, দরজাই না হয় বন্ধ, তা বলে লোকগুলো তো মরে যায় নি, বলি, সাড়া-শব্দ পেলে কিছু?'

'আজ্ঞে কর্তা না।'

'কান থাকলে তো পাবি।'

নিবারণ আবার পা টেপায় মনোযোগ দিল। তারপর কর্তাকে খুশি করার জন্য বললে, 'দাদাবাবুর বোধহয় অসুখ বেড়েছে।'

'অসুখ! কেন? কী ক'রে জানলি?'

'আজ জানালায় দাঁড়িয়ে ছোট বৌমা কাঁদছিলেন।'

কাঁদছিলেন। তা কাঁদুক। যেমন কর্ম, তেমন তো ফল হবে।'

'তা তো ঠিকই।'

'কী ঠিক! কী জানো তুমি?'

ঘাবড়ে গিয়ে চুপ ক'রে রইলো নিবারণ।

দারুকেশ্বর কিন্তু চুপ করলেন না, বললেন, 'তুমি বুঝি ওদের ঘরে গিয়েছিলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কেন? কেন গিয়েছিলে?'

'আপনি ভাড়ার তাগাদায় পাঠিয়েছিলেন।'

'ও, তাগাদা শুনেই কান্না।'

'দাদাবাবু খুব রোগা হ'য়ে গেছেন।'

'তাতো হবেই।'

'এ খৎখানা লিখতেও দাদাবাবুর হাত কাঁপছিলো।'

দারুকেশ্বর অন্যমনস্ক হ'লেন।

'আপনি রাগ করবেন ব'লেই তাগাদাটা দিলাম, নইলে মনটা আমার ছোট দাদাবাবুর জন্য বড় উদাস লাগছিল। কর্তা, এতদিন এই বাড়িতে আছি এ কথা জোর ক'রে বলতে পারি, ছোট বৌদির মতোও কেউ না, ছোট দাদাবাবুর মতোও কেউ নয়, কিন্তু সংসারে ভালো মানুষেরাই দুঃখ পায়।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আর ইয়ে করতে হবে না। যাও, ঘুমোতে দাও আমাকে।' পা টেনে নিয়ে পাশ ফিরলেন দারুকেশ্বর।

এর পর কয়েকদিন হঠাৎ কাজের চাপ খুব বেড়ে গেল। সময়টা ব্যবসার পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল হ'য়ে উঠলো, দুই ছেলেই বাইরে বাইরে ঘুরছে বাণিজ্যের জন্য। তারা চিঠি লিখলো, যখন যেখানে যে অর্ডারের জন্য যাচ্ছে—তাই হ'য়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। তার জন্য ঘুষ দিতে হচ্ছে না, মদ দিতে হচ্ছে না, খোসামোদ করতে হচ্ছে না। ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ফুটলো দারুকেশ্বরের, মেজাজটা খোস হ'লো, খুব ভালো মনে কাটতে লাগলো দিনগুলো। পূবের ঘরের বাসিন্দাদের ভুলেই রইলেন প্রায়। বাড়ি ভাড়ার তাগাদাতেও ভাঁটা পড়লো। মাঝে কিছুদিন যাবত দারুকেশ্বরের একেবারেই ঘুম হচ্ছিলো না। যদি বা একটু ঝিমিয়েছেন, দুঃস্বপ্নের চাপে তখুনি ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গেছে সেই ঘুম। সেদিন সন্ধ্যে থেকে সমস্ত রাত চমৎকার একটি নিটোল নিদ্রায় আচ্ছন্ন হ'য়ে রইলেন। এমন ঘুম তিনি বহুকাল ঘুমোন নি। সকালে উঠে খুব ভালো লাগলো, হাল্‌কা লাগলো, ঝর্‌ঝরে মনে হ'লো। হাত মুখ ধুয়ে এসে খুশি মনে এক গ্লাস গরম দুধে চুমুক দিলেন। আর চুমুক দিয়েই অদ্ভুত একটা চাপা অথচ মর্মভেদী কান্নার আওয়াজে চমকে উঠে ফিরে তাকালেন পূবের ঘরের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে দুপদাপ কয়েকটা পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন, তারপরই নিবারণ দৌড়ে এসে খবর দিল, 'সর্বনাশ হয়েছে।'

'কী, কী?' দারুকেশ্বরের গলার স্বর অনর্থক কেঁপে গেল, হাত কেঁপে খানিকটা দুধ চলকে পড়লো বিছানায়, দাঁতে দাঁত আটকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

'কর্তাবাবু, ছোট দাদাবাবু আর নেই।' বলতে বলতে কাঁদতে কাঁদতে আবার ছুটে বেরিয়ে গেল নিবারণ।

দারুকেশ্বর দাঁড়িয়ে রইলেন স্তব্ধ হ'য়ে। শরীরটা পাথরের মতো ভারি হ'য়ে উঠলো।

অথচ ভালোই ছিলো সর্বেশ্বর। এমন একটা চরম পরিণতির জন্য এতটুকুও প্রস্তুত ছিলো না ছোট বৌ। সর্বেশ্বরও বোধ হয় নয়। শুধু একটু জ্বর হ'য়েছিলো কাল সন্ধ্যের দিকে। ইদানীং প্রায়ই জ্বর হচ্ছিলো তার। হজমের গোলমালটা বাড়লেই তাপ উঠতো শরীরে। সেটা যে এমন কিছু মারাত্মক, কল্পনাও করতে পারেনি কেউ। শুতে এসে রাত্তিরে ছোট বৌ মাথা টিপে দিয়েছে, গায়ে হাত বুলিয়েছে, গল্প করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে পাশে শুয়ে। ঘুম ভেঙে তাকিয়েই নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে এসেছে তার, ছুটে গিয়ে ধরতে ধরতেই যেন পালিয়ে গেল মানুষটা। যেন মস্ত এক রসিকতা করলো।

বোঝা গেল খাট থেকে নামতে গিয়েছিলো সর্বেশ্বর, টাল সামলাতে না পেরেই পড়ে গেছে, অথবা কোনো রকমে হোঁচট খেয়েছে। মেঝে থেকে অত বড় মানুষটাকে ধরে তোলা ছোট বৌ'র পক্ষে সাধ্যায়ত্ত ছিলো না, প্রথমটায় সে ব্যাকুল হ'য়ে কী যে করলো আর করলো না, কিছুই মনে নেই। শেষে ছুটে গেল গ্যারেজ ঘরে। টাইপিস্ট ছেলেটিকে ডেকে নিয়ে এলো। এই বাড়িতে এই একটি মানুষের কাছেই কোনো কিছুর দরকার হলে (অর্থের নয়, সামর্থ্যের) সাহায্য নিত সর্বেশ্বর। অল্পবয়সী, লাজুক, নম্র এই দুঃখী ছেলেটির প্রতি কেমন একটু আলাদা মমতা ছিলো তার।

ডাক্তার এসে ঘোষণা করলেন হার্টফেল। আর পারলো না ছোট বৌ, তার সমস্ত ধৈর্য সহ্য বুদ্ধি যুক্তি সব ভাসিয়ে দিয়ে একটা আর্তনাদ উঠে এলো ভিতর থেকে। সেই কান্নাটাই শুনতে পেয়েছিলেন দারুকেশ্বর। তারপরেই চুপ।

মৃতদেহ বার করতে দেরি হ'লো না বেশী। আর কোনো কান্নাকাটির আওয়াজও পাওয়া গেলো না। কেবল সর্বেশ্বরের চার বছরের ছেলেটা অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো মেঝের ওপর। ঘরের সামনেই ছোট্ট উঠোন, সেখানে এনেই শোওয়ানো হ'লো সর্বেশ্বরকে, প্রতিবেশী মহিলাদের মধ্যে কে যেন ধ'রে ধ'রে নিয়ে এলো ছোট বৌকে, ছোট বৌ পায়ের ওপর উপুড় হ'য়ে পড়ে আবার মূর্ছা গেল।

দারুকেশ্বরের ঘরে ব'সেই জানালা দিয়ে দেখা যায় উঠোনটা। দারুকেশ্বর উঁকি মেরেই ঠাস ক'রে বন্ধ ক'রে দিলেন সেটা। ভিতর থেকে অদ্ভুত একটা কাঁপুনি হলো, দাঁতের চাপে ঠোঁটটা কেটে কয়েক ফোঁটা টক্‌টকে রক্ত গড়িয়ে পড়তে পড়তে থুতনির কাছে এসে শুকিয়ে গেল। অস্ফুট হরিধ্বনি উঠলো বাতাসে, শুনে কানে আঙুল দিলেন। মড়া নিয়ে যেতে যেতে লোকেরা বললো, 'বুড়োটা একটা চামার।'

ঘটনাটি ঠিক প্রত্যাশিত নয়। কী একটু সামান্য অসুখ করেছে আর অমনিই যে বন্ধ দরজার ওপিঠে দৌড়ে এসে মৃত্যুর দূত ওৎ পেতেছে, এমন একটা কথা ভাবতেই পারেন নি দারুকেশ্বর। তাঁর নিজের বয়স একাত্তর, আর সর্বেশ্বরের বয়স বত্রিশ। তাঁর ঘর বাদ দিয়ে যে মৃত্যু পূবের ঘরের বাসিন্দার উপরই এমন ঝাঁপিয়ে পড়বে কী ক'রে জানবেন!

এ তো সেই সর্বেশ্বর, যে সর্বেশ্বরকে এইটুকু রেখে তার মা সূতিকা রোগে চোখ বুজেছিলেন।

দারুকেশ্বর হন্ হন্ ক'রে ঘরের এমাথা ওমাথা পায়চারি করতে লাগলো। ঐটুকু তো ঘর, তার মধ্যে রাজ্যের জঞ্জাল। একদিকে মস্ত উঁচু খাট তাঁর বিয়ের। তাইতেই জুড়ে আছে সব। খাটটাতে জাজিম নেই, চাটাই পাতা। ছোটবৌ যে তোষক বালিশ দিয়ে একদিন পরিষ্কার ক'রে বিছানা পেতে দিয়েছিলো, সে সব এই ঝগড়ার মধ্যে কোথায় টান মেরে ফেলে দিয়েছেন। শেষে কি পিশাচিনীর পাতা বিছানায় শুয়ে নরকে যাবেন? তার চেয়ে ম'রে গেলে কী হয়? এখন খাটটা একটা তীর্থক্ষেত্র হ'য়ে আছে। মাথার কাছে মস্ত কাঠের বাক্স, সেখানেই তাঁর টাকাকড়ি থাকে, পাশে দেয়াল ঘেঁসে তিনটে উঁচু ট্রাঙ্ক। কী যে অমূল্য সম্পত্তি আছে তার মধ্যে তা শুধু তিনি জানেন। খাট ছাড়া আরও আসবাব আছে। কাঠের একটা মস্ত আলমারি, একটা কাঁঠাল কাঠের টেবিল, দু'টো হাতলভাঙা চেয়ার। (একটা আপিস তো বটে, চেয়ার টেবিল না থাকলে চলবে কেন?) টেবিলের ওপর কাগজপত্রের স্তূপ কলমদানিও আছে একটা। দু'পাশেই দুই দোয়াতে লাল কালি আর কালো কালি। দু'টি লম্বা হাড়ের কলম সূঁচোলো নিব নিয়ে শুয়ে আছে কলমদানির ঢালা নালায়।

ঐ স্বল্পপরিসর ঘরের মধ্যেই চক্কর খেতে খেতে ঘেমে উঠলেন তিনি। শ্রান্তিতে বৃদ্ধবুকের জীর্ণ পাঁজর ব্যথা করতে লাগলো! এক সময় থামলেন, আবার জানালাটা খুলে দিয়ে তাকিয়ে রইলেন শূন্য উঠোনটার দিকে।

ঐটুকুই শুধু, তার পরের দিন থেকেই আর কোনো ভাবান্তর দেখা গেলো না দারুকেশ্বরের। ঠিক তেমনিই রুটিন মতো ভোর না হ'তে উঠলেন, চা খেলেন, দুধ খেলেন, টাইপিস্ট ছেলেটিকে ডেকে ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে কাজ বুঝিয়ে দিলেন. বললেন, 'রাঁচির বিলটা শীগগির টাইপ ক'রে ফেলো। মিস্ত্রি ডেকে প্যাকিং কেসগুলো এখুনি বানাতে দাও।' অন্য ছেলেটিকে বললেন, 'শীগগির হরেনকে একবার তাগাদায় পাঠাও। বস্তির লোকগুলি ভারি বদমাস, তাগাদা না পেলে ভাড়াই দিতে চায় না। দেবো শালাদের উঠিয়ে। আর একজন তো দিব্যি ফাঁকি দিয়ে পালালে। বলেছিলো না মরবার আগে শোধ দেবো, কই, কথা দিয়ে কথা কি সে রাখলো?'

ছেলেটি অবার হ'য়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কার কথা বলছেন?'

হাত-পা নেড়ে দারুকেশ্বর বললেন, 'আরে, ঐ পূবের ঘরের বাসিন্দার কথা।'

দু'জনেই হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলো দারুকেশ্বরের মুখের দিকে।

টেলিগ্রাম পেয়ে ছুটে এলো রোহিতেশ্বর আর মহেশ্বর। দিদিও এলেন। তিন ভাই-বোন জড়াজড়ি ক'রে খুব খানিকটা কাঁদলো। বৌ দু'জন আসেনি, তাদের একজন আসন্নপ্রসবা, অন্যজনের কোলে উনিশ দিনের শিশু। পায়ে পায়ে বেরিয়ে এসে ছোট বৌ-ই তাদের শান্ত করলো, নিরিমিষ রান্নার ব্যবস্থা ক'রে দিল। সেই রাতে শোকার্ত ননদ ভ্রাতৃবধূকে সন্তানের মতো করে নিজের বুকের তলায় নিয়ে শুলেন, চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললেন, 'তিন বছরের সর্বকে মায়ের মৃত্যুর পরে আমিই কোলে ক'রে মানুষ করেছিলাম,

আমার তখন দশ বছর বয়েস ছিলো। সেই সর্ব আজ কোথায় চলে গেল। তুই কাঁদিস না ছোট বৌ, তোর কিছু ভয় নেই, তোর ভার, তোর ছেলেমেয়ের ভার সব আমি নেবো। শ্রাদ্ধ শান্তি চুকে গেলেই এই নরক থেকে তোদের নিয়ে চলে যাবো। আর কোনোদিন আসবো না। এমন বাপের মুখ দেখবো না।'

সেই রাত্রে রোহিতেশ্বর মহেশ্বরও ঐ একই কথা বলাবলি করলো। সর্বেশ্বর তাদেব ছোটভাই। মাতৃহীন শৈশবে পিতার স্নেহে নয়, দিদি আর দাদাদের স্নেহেই সে লালিত পালিত। ধীর স্থির শান্ত একটি শিশু। সেই শিশু সর্বেশ্বরকেই বারে বারে মনে পড়তে লাগলো তাদের, বাবার উপব অদ্ভুত একটা ক্রোধে জ্বলতে লাগলো শরীর। রোহিতেশ্বর বললো, 'বাবাই এই প্রাণনাশের কারণ।'

মহেশ্বর বললো, নিশ্চয়ই। শেষে বেচারা কী কষ্টেই দিন চালিয়েছে, তার উপর বাড়ি ভাড়ার তাগাদা। বুড়ো কি সোজা পাপী, গোটা বাড়িটার ভাড়া ঐ এক সর্বেশ্বরের কাছ থেকে আদায় করতো।'

'বৌমার এখন কী হবে?'

'আমরা আছি না। এখনও যদি বুড়ো ঝগড়া চালাতে চায়, দেবো সাতকথা শুনিয়ে। মায়া মমতা যা আছে, তা তো দেখছোই। কখনো শুনেছ এরকম, যে বাপের বয়স একাত্তর, যে বুড়ো নিত্য মরে, তার চোখের সামনে তারই দোষে তার বত্রিশ বছরের ছেলে দাপিয়ে মরে গেল আর তার চোখে এক ফোঁটা জল এলো না! খাচ্ছে দাচ্ছে কাজ করছে—একে কি মানুষ বলে?'

'ধ্যুৎ! মানুষ না হাতী!' রোহিতেশ্বর উত্তেজিত হ'য়ে উঠে বসলো বিছানায়। 'তুই দেখিস মহেশ, কাল সকালে উঠে বুড়োকে আমি কেমন দু'কথা শুনিয়ে দিই। কে চায় ওর বিষয় আশয়। বিষয় আশয়ে ঘেন্না ধ'রে গেছে।

সকালের আলোয় কিন্তু সংকল্পের জোর আর অতটা তীব্র রইলো না। তবু রোহিতেশ্বর কিছু বলবে বলে দারুকেশ্বরের দরজার চৌকাঠে একবার দাঁড়ালো গিয়ে, আর কিছু না হোক, বুড়ো যেন সর্বেশ্বরের বৌকে দু'মুঠো আতপের বন্দোবস্ত ক'রে দেন। কিন্তু এই সময়ে কারো ঘরে ঢোকা দারুকেশ্বর একেবারেই পছন্দ করেন না, 'কী চাই' বলে একবার চোখ কুঁচকে ঘাড় ফেরালেন তিনি, তারপর বললেন, 'এখন যাও।'

ব্যস। তক্ষুণি ফিরে এলো রোহিতেশ্বর। প্রতিদিনের অভ্যাস মতো তামাকের গুল দিয়ে দাঁত মাজতে লাগলো উঠোনে দাঁড়িয়ে। মুখ ধুয়ে গুড়মুড়ি সহযোগে পাতলা এক কাপ চা খেয়ে কাজে বসলো গিয়ে। কাজ, কাজ আর কাজ। অতবড় ব্যবসা, না করলেও চলে না অবিশ্যি, জনবল নেই তাদের। মাত্র দুই ভাইয়ে মিলে চালিয়ে নিচ্ছে সব। সর্বেশ্বর যতদিন একসঙ্গে ছিলো, এমন হাঁপ ধরেনি, অনেক ফাঁকি দিতে পেরেছে। লেখাপড়ার যত কাজ, সব সে করতো, ভালো ভালো পার্টির সঙ্গে সে-ই দেখা করতো, তার ওপরে ভায়েদের অনেক কাজও নির্বিবাদে ক'রে দিতো! এখন তার বদলে মাইনে করা আর একজন উকিল রেখেছেন বটে দারুকেশ্বর, কিন্তু সে কি আর সর্বেশ্বরের মতো করবে? তার নির্দিষ্ট সময়,

নির্দিষ্ট কাজ। তার বাইরে একটি মিনিটও এখানে সে অপব্যয় করে না।

দারুকেশ্বর শোকেতাপে বিশ্বাস করেন না, তা ছাড়া ও রকম একটা পিতৃদ্রোহী হতভাগা কুলাঙ্গারের মৃত্যুতে তিনি বিচলিতই বা হবেন কেন? অন্য দুই ছেলেও যদি তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করে তাদেরও তিনি ক্ষমা করতে নারাজ।

কী দরকার বুড়োকে চটিয়ে। যে গেছে সে তো আর ফিরবে না, তবে কেন নিজেদের বিপন্ন করা, বোকাটা তো গোঁয়ার্তুমি ক'রেই মরলো এ ভাবে। সত্যি বলতে বুড়ো আর ক'দিন! এখন ভালোয় ভালোয় মন জুগিয়ে খুশি রেখে বিষয়টুকু হাত করতে পারলেই শেষ রক্ষে হয়।

শ্রাদ্ধ হলো এগারো দিনে। নমো বিষ্ণু ক'রে ছোট বৌ-ই ঠাকুর পুরুত ডেকে যা পারলো করালো, নেড়া ক'রে দিল ছেলে-মেয়েকে। দারুকেশ্বর কিছুই দেখলেন না, কিছুই বললেন না, কেবল একদিন দরিদ্রভোজন করালেন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে, আর রোহিতেশ্বর মহেশ্বর যখন ছোট বৌয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করলো, বাধা দিলেন না কোনো।

শ্রাদ্ধের শেষে রোহিতেশ্বর বললো, 'তা হ'লে বৌমা এখন কী করবে। যদি দিদির কাছে গিয়ে থাকে, আমি খোকাকে নবদ্বীপে তার জ্যাঠাইমার কাছে নিয়ে যাই, ঘরের ছেলে পরের ঘরে মানুষ হওয়াটা ভালো নয়। তারপর ওর জ্যাঠাইমা যখন ফিরে আসবে, ও-ও সেই সময়েই আসবে। আমরাই ওকে মানুষ করবো।'

মহেশ্বর বললো, ইচ্ছে করলে বৌমা এখানেও থাকতে পারেন, আমরা না হয় বাবাকে ব'লে ক'য়ে—'

দিদি বললেন, 'সেটাই সবচেয়ে ভালো। আমি নিয়ে গেলেও এখুনি তো নিতে পারছি না। হাজার হোক সেটা আমার স্বামীর বাড়ি, আমার আর কতটুকু জোর সেখানে। তাঁকে বলবো, তিনি রাজী হবেন, তবে তো। আর ছোট বৌও পরের বৌ, তারও তো এ পক্ষের একটা অনুমতি দরকার। বাবাকে না জানিয়ে—'

ছোট বৌ'র চোখের কোলে কালি পড়েছে, গলার কণ্ঠা উঁচু হয়েছে, মাথার লম্বা চুলে জট বেঁধেছে। সব শুনে নিঃশব্দে একটু হাসলো।

তখন তিন-ভাইবোনে মিলে পরামর্শ দিল, 'তুমি বরং এক কাজ করো বাবার পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাও গিয়ে, হাজার হোক, ঘরের বৌ, এক কথায় কি ঠেলে দিতে পারবেন?' এই বলে সব কিছুর সমাধান ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে তারা উঠলো। সকলেরই এখন যার যার কর্মস্থলে ফিরে যাবার তাড়া। ভাইয়ের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে যে যেভাবে ছিলো ছুটে এসেছে, আর একটা দিন থেকে ক্ষতি করতে চায় না। দুঃখ-বেদনা কিছু চিরস্থায়ী নয়, প্রথম যে ধাক্কাটা দেয় তার রেশ কি আর বেশীদিন থাকে? তাই এগারো দিনের ব্যবধানেই যথেষ্ট প্রলেপ লেগেছে তাদের মনে। দারুকেশ্বরের কথা অবিশ্যি ধরা হচ্ছে না এখানে। তিনি যেমন ছিলেন, তেমনি আছেন। প্যাকিং কেসের তদারক করছেন, হিসেব লেখছেন, টাকা গুনছেন, খিটিমিটি করছেন খরচপাতি নিয়ে। সামান্য পুত্রশোকে কাতর হবেন, এমন মূঢ়মতি

নিয়ে ধরাধামে তিনি আসেন নি। তফাতের মধ্যে শুধু খাওয়াটা কমে গেছে।

ছোট বৌ'র মনটা একটা কুয়াশাচ্ছন্ন দিনের লেপামোছা বোবা আকাশের মতো ধূসর হ'য়ে আছে। মেঘ নেই, বৃষ্টি নেই, বিদ্যুৎ নেই, চন্দ্র নেই, কিছু নেই সেখানে! রোদ, আলো, আশা, আনন্দ এসব শব্দের যে কী অর্থ, কবে যে সেই অর্থের কোনো মানে ছিলো জীবনে তা পর্যন্ত সে ভুলে গেছে। একটা ছবিও যদি থাকত সর্বেশ্বরের! মাঝে মাঝে মানুষটাকে যে কী ভয়ঙ্কর দেখতে ইচ্ছে করে!

শেষে টাইপিস্ট ছেলেটিকেই ডেকে পাঠালো সে। ছেলেটির নাম অনিল। মাথা নিচু ক'রে দাঁড়ালো এসে।

'আমাকে ডেকেছেন?'

'আমাকে কয়েকটা জিনিস বিক্রি ক'রে দেবে?'

'বলুন।'

'এই আয়নটা, চেয়ারটা আর বুককেসটা। তোমার দাদার আইনের বইও আছে কিছু কিছু।'

'এগুলো বিক্রি করা কি খুব দরকার?'

'খুব দরকার।'

'আমি বলছিলাম কী—'

'আর একটা ঘরও খুঁজে দেবে?'

'ঘর!'

'বস্তির ঘর-টর। আট দশ টাকা ভাড়ার মধ্যে পাওয়া যাবে না?'

অনিল ঢোক গিললো।

'আর একটা চাকরি।'

'চাকরি!'

'লেখাপড়া সামান্যই শিখেছি, তাও স্কুল কলেজে নয়। বাড়িতে দাদার কাছে। ছোট ছেলেদের পড়াতে পারবো কয়েক ক্লাশ পর্যন্ত। তবে তা যদি এক্ষুণি না জোটে, ব'সে তো থাকতে পারবো না। কোনো বড়লোকের বাড়িতে সেবা-টেবার কাজ, যাতে একটু মাইনে বেশী পাওয়া যায়, ঘরভাড়াটা দিয়ে বাচ্চা দু'টোকে খাওয়ানো চলে, না হয় আপাতত সেই রকমই একটা কিছু—আমার রান্নার কাজেও আপত্তি নেই।'

অনিলের চোখ মাটিতে নিবদ্ধ।

'পারো না?'

'কিন্তু এখানে—'

'না, এখানে হয় না।'

'আপনার দাদা—'

'তাঁকে আমি আমার অবস্থার কথা জানাইনি, জানাবোও না।'

অনিল চুপ ক'রে থেকে যেন ঝুপ ক'রে ডুব দিলো, 'দেশে আমার মা আছেন, দিদি আছেন, আমি আপনাকে সেইখানে নিয়ে যাবো।'

এ কথায় ছোট বৌকেও চুপ করতে হলো একটু। ধরা গলায় বললো, 'তুমি আমার ছোট, আমি কি তোমাকে কষ্ট দিতে পারি? অভাব কী জিনিস তা তো তুমি জানো অনিল। মা আর দিদি আছেন থাকুন, এখানে আমরাও কাজ করি, অনর্থক বোঝা বাড়িয়ে কী লাভ।'

'আমার কোনো বোঝা বাড়বে না।'

'কিন্তু তাতে যে তোমার চাকরি যাবে?'

'যাক। আমি চাইনা এখানে থাকতে, আমি পারবো না এখানে।' বাইশ বছরের অনিলের চোখ জলে ভ'রে গেল।

সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করতে আট-দশ দিন সময় লাগলো। জিনিসগুলো চেষ্টা-চরিত্র ক'রে মোটামুটি ভদ্র দামেই বিক্রি ক'রে দিতে পারলো অনিল, তার নিজের একজন সহৃদয় আত্মীয়ের বাড়ির একটি ঘরও যোগাড় ক'রে ফেললো ভদ্র ভাড়ায়, একটা চাকরির সন্ধানও পাওয়া গেল। একজন অসুস্থ ভদ্রমহিলার কয়েকটি শিশুর লালন-পালন করা। একেবারে ঝিয়ের কাজের মতো নিচু নয়, তাদের লেখাতে-পড়াতেও হবে, সংসারটাকেও দেখাশুনো করতে হবে। সকাল ছ'টা থেকে বিকেল ছ'টা পর্যন্ত। অল্প মাইনের গভর্নেস আর কি। অনিলের একটুও ইচ্ছে ছিলো না, ছোট বৌ তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করলো। সমস্যা হ'লো নিজের শিশুদের নিয়ে। তাদের রাখবে কোথায়? খেতে দিতে না হ'লে তারাও যদি মায়ের সঙ্গে যায়, তাতেও আপত্তি নেই গৃহিণীর।

অতএব সব জিনিসপত্র গোছগাছ ক'রে নিল ছোট বৌ। কী বা জিনিস। একটি ট্রাঙ্ক আর খান কয়েক শাড়ি! ভেবেছিলো সকালেই চ'লে যাবে, সর্বেশ্বরের শত স্মৃতি-বিজড়িত ঘরখানার দিকে তাকিয়ে যাবার মুহূর্তে তার পা সরলো না, সকালকে সে দুপুরে নিয়ে এলো। দুপুরকে রাত্তিরে। শেষে অনিল বললো, 'তা'হলে কালকেই চলুন। আজ আর রাত্রি ক'রে গিয়ে কী হবে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছোট বৌ বললো, 'তাই ভালো।'

দারুকেশ্বর কিছুই জানতেন না। খবরটা যথারীতি নিবারণই দিল। রাত্রিবেলা পা টিপতে টিপতে বললো, 'ছোট বৌদি তো ঘর ছেড়ে দিচ্ছেন কর্তাবাবু, আবার কারোকে ভাড়া দেন তো ঐ বাড়ির শালাবাবু নেবেন বলছেন।'

দারুকেশ্বর অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, 'কী!'

'তেতলার নগেন বাবুর শালার কথা বলছি, টাকা আছে, ভাড়া ঠিকমতো দেবে।'

'উঁ।'

'তেমন মোচড় দিলে দু'চার টাকা বেশীও পেতে পারেন। গরজ খুব।'

'কিসের গরজ?'

'ঘরটা নেবার।'

'কোন্ ঘর?'

'ছোটবাবুর ঘরটা।'

'কী বললি?'

'বলছিলাম, পূবের ঘরটা তো ফাঁকা হ'য়ে যাচ্ছে—'

'কেন?'

'ছেলেমেয়ে নিয়ে ছোট বৌদি চ'লে যাচ্ছেন যে—'

'চলে যাচ্ছেন!'

'আজ্ঞে কর্তা।'

'কোথায়?'

'কোথায় সস্তা ভাড়ায় ঘর ঠিক করেছেন।'

'কেন! কে তাদের যেতে বলেছে?'

'কে আবার বলবে। ছোট দাদাবাবু বেঁচে থাকতেই ভাড়া টানতে পারতেন না, আর এখন তো'—

দারুকেশ্বর ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মতো উঠে ব'সে ঠাস ক'রে এক চড় কসিয়ে দিলেন নিবারণের গালে, 'ভাড়া, ভাড়া, ভাড়া। ভাড়ার কথা কে বলেছে তাদের, কার এত সাহস? কে ভাড়া দেবে, কে ভাড়া নেবে?'

চড় খেয়ে হতভম্ব হ'য়ে ছিটকে স'রে দাঁড়ালো নিবারণ।

দারুকেশ্বর কোন্ এক অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশ্যে রক্ত চক্ষে তাকালেন, দাঁতে দাঁত ঘষলেন, তারপর কোমরের খোলা ধুতি ধরতে ধরতে বিদ্যুৎবেগে ছুটে এলেন এই ঘরে, সর্বেশ্বরের ঘরে।

'বৌমা!'

ছেলে-মেয়েদের ঘুম পাড়িয়ে, মেঝেতে হাঁটু ভেঙে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছিলো ছোট বৌ, শ্বশুরকে দেখে অবাক হ'য়ে মাথায় আঁচল তুলে উঠে দাঁড়ালো।

দারুকেশ্বর মুহূর্তকাল তাকিয়ে রইলেন তার বৈধব্যের দিকে, তাকালেন ঘরের চারদিকে, তারপর পাগলের মতো সারা ঘরময় কী যে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন কে জানে। কী আছে ঘরে! কোনো চিহ্নই নেই। সব পরিষ্কার। কেবল কোণের দিকে এ বাড়ির একটা বড় আলনা, আর আলনার হুকে সর্বেশ্বরের একটা শতছিন্ন পুরোনো গেঞ্জি।

দারুকেশ্বর লোভীর মতো লাফিয়ে এসে তুলে নিলেন সেই ময়লা গেঞ্জিটা, দু'হাতে মেলে ধ'রে দেখতে লাগলেন বড় বড় চোখে, বড় বড় নিঃশ্বাসে শুঁকতে লাগলেন, জড়ো ক'রে তুলে চেপে ধরলেন বুকে, চেপে ধরলেন মুখে, তারপর হঠাৎ একটা বুকফাটা আর্তনাদে সমস্ত ঘর, সমস্ত বাড়ি, সমস্ত পাড়া আলোড়িত ক'রে ডেকে উঠলেন, 'সর্বেশ্বর! বাবা সর্ব!'

পড়ে যাচ্ছিলেন, ছোট বৌ এসে জড়িয়ে ধরলো, সর্বেশ্বরের শূন্য তক্তপোষটার উপরে শুইয়ে দিলে কোনোমতে, মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। তারপর ভয় পেয়ে দৌড়ে গিয়ে নিবারণকে পাঠিয়ে দিলে ডাক্তার ডাকতে।

বুকটা এতখানি ওঠা-পড়া করছে দারুকেশ্বরের, গলা দিয়ে আওয়াজ হচ্ছে ঘড় ঘড় ক'রে, ছোট বৌ'র হাতটা তিনি জোরে চেপে ধরলেন, 'মা গো, কোথায় যাবে তুমি, আমাকে ফেলে তুমি কোথায় যাবে?' গর্তে বসা চোখের কোল বেয়ে তাঁর এতদিনের সব জমানো জল অঝোর ধারে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে ছোট বৌ বললে, 'কোথাও না, কোথাও যাবো না। আপনি শান্ত হোন।'

ডাক্তার এলেন, মুখের ভাব গম্ভীর ক'রে বললেন, 'যে যেখানে আছে খবর দিয়ে দিন।'

কিন্তু ছেলেরা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলেন না দারুকেশ্বর। সর্বেশ্বরের খাটে শুয়ে, ছোট বৌ'র কোলে মাথা রেখে, সর্বেশ্বরের মতো ক'রেই মারা গেলেন তিনি। যে তিন দিন রইলেন সেবা যত্নের এতটুকু ত্রুটি করলো না ছোট বৌ, আসবাব বেচা দু'শো টাকা ডাক্তারে ওষুধেই খরচ হ'য়ে গেল। শেষ সময় অস্পষ্ট আওয়াজে দারুকেশ্বর বললেন, 'ক্ষমা করো!' মুখ ফিরিয়ে ছোট বৌ চোখের জল লুকোলেন। দারুকেশ্বরের কম্পিত হাত আশীর্বাদের ভঙ্গিতে উঠতে গিয়েও শিথিল হ'য়ে ঝুলে পড়লো। তিনি প্রাণত্যাগ করলেন।

ছেলেরা হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এসে দেখতে পেলো না বাপকে। প্রতিবেশীদের কাছে খুব কান্নাকাটি করলো, ঘরে এসে উকিল ডাকিয়ে উইল দেখতে বসলো।

উকিল বললেন, 'স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি এতদিন একমাত্র ছোট ছেলের নামেই ছিলো, ছেলের মৃত্যুর পরে সেই উইল বদলে তিনি সেটা তাঁর ছোট পুত্রবধূ শ্রীমতী মাধবীলতার নামে ক'রে দিয়ে গেছেন। আর সেই সঙ্গে একটি অন্তিম বাসনা জানিয়েছেন। তাঁর মৃত ছেলের নামে যেন তাঁর নিজের গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা হয়। সেই ভারও তিনি তাঁর ছোট পুত্রবধূ শ্রীমতী মাধবীলতার উপরই অর্পণ ক'রে গেছেন।'

বড় ছেলে বললো, 'শালা বুড়োর শ্রাদ্ধ করে কে দেখবো।'

মেজ ছেলে বললো, 'বেঁচে থাকলে গুলি ক'রে মেরে কেটেকুটে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিতাম।'

বৌরা বললো, 'ওর অনন্ত নরক হবে, ফুটন্ত তেলের কড়াইতে ভাজা ভাজা হবে চিরদিন।'

সব শুনে ছোট বৌ ভাসুরদের কাছে লজ্জায় অধোবদন হ'য়ে রইলো।

পাড়া প্রতিবেশীদের কাছে নিবারণ বললো, 'ছোট বৌদি ভাড়া না দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই টাকার শোকেই পাগল হ'য়ে মরে গেলেন কর্তাবাবু।'

প্রথম বসন্ত

আত্মীয়ী

মা বললেন, 'কেন, তোর আপত্তিটা কী?'

'আমার ভাল লাগে না।'

'পৃথিবীর সকলের ভালো লাগে, আর তোর লাগে না?

'তা, কী করবো? আমি ভাবতেই পারি না চেনা নেই, শোনা নেই, হুট ক'রে একজন মেয়ের স্বামী হ'য়ে, অমনি আঙুলে ধ'রে নিয়ে আসবো বাড়িতে। অশ্লীল।'

'তবে একটা চেনা মেয়ে বার কর না খুঁজে, যাকে আঙুলে ধ'রে আনতে আপত্তি হবে না তোর।'

'না।'

'কেন?'

'বিয়ে আমি করবো না।'

এবার রাগ করলেন মা, ধমকে বললেন, 'করতেই হবে।'

'তোমার ইচ্ছে?'

'হ্যাঁ, আমারই ইচ্ছে।'

'কেন?'

'আমি তোমার মা। তোমাকে আমি অনেক করেছি, তোমার জন্য আমি অনেক ভেবেছি, তোমারও আমার ওপর একটা ঋণ শোধের পালা আছে।'

'ঋণ শোধ!' হা-হা ক'রে হেসে উঠলো বরুণ। 'আমি বৌ এনে তোমার ঋণ শোধ করবো? তা হ'লেই হয়েছে!'

'কেন?'

'স্বামীর সঙ্গে বনিবনাও ক'রেই থাকতে পারেন না মহিলারা, তা আবার শাশুড়ী।'

'বলেছে কে তোকে?'

'দেখছো তো সকলকে।'

'দেখছি তো। সকলেই তো সুখে আছে।'

'সুখ তো খুব। মারামারির কামাই নেই।'

'ওরা বলছে তোকে?'

'দুটি চোখ তো আছে, মা।'

'আমারও তো আছে।'

'তুমি এখন ঠুলি পরেছো ছেলের বিয়ে দেবার জন্য। বেশ তো আছি, তুমি রাঁধো আমি খাই, তুমি বিছানা পেতে দাও আমি শুই, কলেজ থেকে এলে তুমি কী সুন্দর চা ক'রে আনো, একদিন রাগ করো না, একদিন বিরক্ত হও না, একদিনও তোমার সঙ্গে ঝগড়া হয় না আমার।'

'ঐ ঝগড়ার জন্যেই তো বিয়ে করা দরকার।'

'ওরে বাবা, দু-চারটে ঝগড়ার নমুনা আমি দেখেছি, ওতেই আমার হ'য়ে গেছে।'

'সুবিনয় বিয়ে করেছে, ঝগড়া করে? চিন্ময়দের ঝগড়া হয়? এমন কি প্রশান্ত যে এত কাণ্ড করলো অপছন্দ বৌ নিয়ে, সেও তো এখন চোখে হারায়।'

'বেশ আছো। খবরাখবর তো আর রাখো না। বিয়ে করলে ঝগড়া অশান্তি হবেই, হবেই, হবেই। এ আমি তোমাকে ব'লে রাখলাম।'

'বয়স বেড়ে তুই কাপুরুষ হ'য়ে গিয়েছিস। কিন্তু আমি আর তোমার সেবা করতে পারবো না ব'লে দিলাম। তোমার যন্ত্রণায় আমার এক পা নড়বার সাধ্যি নেই বাড়ি থেকে।'

'আসল কথা বলো যে তোমার নিজের সেবাব দরকার হয়েছে। আমার বৌ তোমার সেবা করবে কেন?'

কেন কববে তার নিকেশ শুনতে হবে না তোমাকে, তুমি দয়া ক'রে বিয়ে করো এই হচ্ছে কথা।'

ছেলের জামাকাপড় ঠিক ক'রে দিতে এসেছিলেন সুহাসিনী, তা না দিয়েই চ'লে গেলেন রাগ ক'রে।

এই শূন্য বাড়িতে সত্যি আর টিঁকতে পারেন না তিনি। স্বামী মারা গেছেন কোন বিস্মৃতির যুগে, তার পর থেকে এই ছেলে আর তিনি, তিনি আর ছেলে। লেখাপড়া শিখলো, তিন বছর প্রোফেসরি ক'রে পাকা হ'লো, তবু বিয়ে করলো না এখনো। অথচ একটা মিষ্টি মেয়ে এসে ঘরে-ঘরে ঘুরে ফিরে বেড়ালে কতই না ভাল লাগতো। মা ব'লে ডেকে কাছে এসে দাঁড়ালে বুক ভ'রে যেতো সুহাসিনীর। কিন্তু সে-আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে-মনেই কেঁদে বেড়ায়। ছেলেকে দিয়ে যে পূরণ হবে এমন আশা হয় না।

সুহাসিনী কথা বন্ধ করলেন। বরুণ একগাল হেসে সেই রাগ তাঁর ভেঙে দিলো। তখন খুঁজে-খুঁজে এক পিসতুতো ভাইয়ের বাড়ি গিয়ে ডুব মারলেন। বরুণ অমনি দুই ধমক দিয়ে

ছোট মেয়ের মতো হাতে ধ'রে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে এলো বাড়িতে, তখন অশ্রুমোচন করলেন। তাতে তো বরুণের আরো সুবিধে হ'লো, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে উদ্দাম আড্ডা দিয়ে, চমৎকার অসময়ে স্নান-খাওয়া ক'রে মাকে উতলা করে দিলো। তখন সুহাসিনী এই সব পন্থা ছেড়ে ছেলেকে না-জানিয়েই বউ ঠিক করে ফেললেন। মেয়েটির নাম মল্লিকা। মল্লিকা ফুলের মতোই দেখতে, ছিমছাম একটি ছোট্ট বাড়িতে থাকে, বাপ মা চমৎকার মানুষ, ঘরদোর সুন্দর সাজানো, শিক্ষায় সুরুচিতে একেবারে ঠিক মনের মতো। শুধু লুকিয়ে-লুকিয়ে বিয়ে ঠিক ক'রেই ক্ষান্ত হলেন না, তাদের সঙ্গে বন্ধুতাও পাতালেন, বৌ-না-হ'তেই বৌকে ভালোবেসে উপহার দিতে লাগলেন ঘন-ঘন, ঘন-ঘন নিয়ে আসতে লাগলেন বাড়িতে, ছটফট করতে লাগলেন কাছে পাবার জন্য। আর তার পরে বললেন ছেলেকে—'তোর বিয়ে ঠিক করেছি।'

'কী?'

'দেখেছিস তো মেয়ে?'

'কবে?'

'ক'দিনই তো নিয়ে এলাম।'

'আমি দেখিনি।'

'না দেখিস নি, বাকি আছে। সেদিন যে ভদ্রলোক আলাপ করলেন তোর সঙ্গে, চা খেলেন এখানে, উনিই তো মেয়ের বাপ।'

'তবে যে বললে তোমার কবেকার আত্মীয়, নতুন দেখা হয়েছে?'

'আত্মীয়ই তো। ছেলের শ্বশুর আত্মীয় না তো কী? আত্মীয়ের বাড়া—কুটুম্ব।'

এবার গুম হ'লো বরুণ। অনেক পরে বললো, 'তাহ'লে পরশুদিন যে মেয়েটিকে দিয়ে আমার চা পরিবেশন করালে তিনি তাঁর কন্যা?'

'কী সুন্দর, না?'

বরুণ চুপ।

ছেলের থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে একটু বুঝি বা শঙ্কিত হলেন সুহাসিনী। বললেন, বিয়ের আগে সবাই অমন ঢং করে, তারপর তো—'

বরুণ একবার তাকালো শুধু।

সুহাসিনী ঝংকার দিলেন, 'কথা যখন দিয়েছি তখন বিয়ে তোমাকে করতেই হবে।'

'না।'

'মানে?'

'বিয়ে আমি করবো না।'

'তবে আমি কি ভদ্রলোকের কাছে ইয়ে হবো?'

'কথা তুমি দিলে কেন? আমার কাছে তোমার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিলো।'

'না। মা হ'য়ে ছেলের কাছে অত নতি স্বীকার করতে আমি পারবো না। আমি গুরুজন,

আমি তোমার কর্তা, তুমি আমার ছেলে, তুমি আমার অধীন। তোমার ভালোমন্দ আমার। আমি যা ভালো বুঝবো ঠিক তাই করবো।'

'তোমার নিজের জেদটা এতই বড়ো?

'হ্যাঁ।'

'এর ফলে যদি একটি মেয়ের জীবন আমি অতিষ্ঠ করে তুলি, তবুও?'

'তবুও।'

'মনে থাকবে?'

'থাকবে।'

'বেশ। কিন্তু এও আমি ব'লে রাখলাম তোমাকে তার পরের সব দায়িত্ব তোমার।'

'ঠিক আছে।' একেবারে কথা শেষ ক'রে উঠে গেলেন সুহাসিনী, আর বরুণও রাগে গরগর করতে-করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো অসময়ে।

উপায় কী। মায়ের সম্মানরক্ষার্থে শেষ পর্যন্ত মত দিতেই হ'লো বরুণকে। কিন্তু মনের ভার তার কাটলো না, ভারের চেয়েও রাগ বেশি। মা'র সঙ্গে সে কথা বলা বন্ধ ক'রে দিলো, যখন-তখন বাড়ি ফিরে আর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যথাসম্ভব উদ্‌ব্যস্ত করতে লাগলো। সুহাসিনী অস্থির বোধ করতে লাগলেন। ভেবে পেলেন না এতই কী তিনি অপরাধ করেছেন, যার জন্যে ছেলে এ-রকম করছে তাঁর সঙ্গে। একবার মনে করলেন, যাক গে, ভেঙে দিই বিয়ে, ওদের খুলে বলি সব। শেষে কি মেয়েটা কষ্ট পাবে আমার জন্য। এমন একটা অপদার্থ বিশ্রী স্বামী নিয়ে সারা জীবন জ্বলবে? ভাবতে-ভাবতেই সময় কাটলো, কিছুতেই পারলেন না। এক পাড়ার মানুষ, চেনাজানার মধ্যেই বলতে গেলে, মাঝে-মাঝে গেলেন, বসলেন, গল্প করলেন, মল্লিকার মিষ্টি আর দুষ্টু মুখের দিকে তাকিয়ে ফিরে এলেন। অবিশ্যি তাঁর ছেলের যে বিয়েতে একেবারেই মত নেই এ-কথা আভাসে ইঙ্গিতে অনেকবারই বোঝালেন তাঁদের, তাঁরা হাসলেন আর বললেন, 'ও-রকম সব ছেলেই ব'লে থাকে।'

দেখতে-দেখতে এগিয়ে এলো বিয়ের দিন, তিন দিন আগে মল্লিকার বাবা সপরিবারে দেশে চ'লে গেলেন। সেখানেই বিয়ে হবে। সেখানে তাঁদের মস্ত বাড়ি। মা বেঁচে আছেন, অন্যান্য জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, জ্যাঠতুতো খুড়তুতো সব ভাইবোন, খুড়িরা, জ্যেঠিরা, গমগম করছে একেবারে। প্রিয়রঞ্জনবাবুর এই প্রথম মেয়ের বিয়ে, ঘটাপটা করবেন তিনি অনেক। বরুণের মা শুধুমাত্র মেয়েটিকেই প্রার্থনা করেছেন, কিন্তু তিনি তো আর শুধু হাতে জামাই বরণ করতে পারেন না? আর অত পছন্দের জামাই। এই ছেলের উপর চোখ তাঁর তিন বছর যাবৎ। যতদিন এ-পাড়ায় প্রতিবেশী হয়েছেন। কিন্তু কে জানতো প্রজাপতির নির্বন্ধ এমন ক'রে ধরা দেবে। তাই অনেক সাধ আছে তাঁর মনে। আর শুধু কি ছেলে? তার মা

না? এতদিন তো ছেলেটিকে দেখেই লুব্ধ হয়েছেন, কিন্তু এমন মুগ্ধ হলেন তার মাকে দেখে। এমন ভাগ্য তাঁদের মেয়ের তা কি তাঁরা জানতেন? এমন শাশুড়ির হাতে ক'জন মেয়ে পড়ে?

কিন্তু তাঁরা যা-ই ভাবুন, সুহাসিনীর আর ঘুম রইলো না দু-চোখে। মা বলে অধিকার জাহির করতে গিয়ে তিনি যে কত অন্যায় করলেন, মর্মে-মর্মে অনুভব করতে লাগলেন প্রত্যেক মুহূর্তে। ছেলে তাঁর মান রাখলো বটে বিয়েতে আপত্তি না-ক'রে, কিন্তু তা করলেই যেন ভালো ছিলো।

অতএব বেশি আর হৈচৈ করলেন না, আত্মীয়-স্বজন কাউকেই ডাকলেন না, অতি নীরবে, অতি বিমর্ষমুখে নির্দিষ্ট তারিখে ছেলের কড়ে আঙুলে কামড় দিয়ে, দইয়ের ফোঁটা কপালে দিয়ে ভগবানের নাম স্মরণ ক'রে বাছা-বাছা কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে বরযাত্রী সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন বিয়ে করতে। তারপর খালি বাড়িতে লক্ষ্মীর আসনের সামনে উপুড় হ'য়ে কেঁদে ফেললেন ভুলে-যাওয়া স্বামীকে কতকাল পরে মনে পড়লো তাঁর।

এদিকে ট্রেনে উঠে যেন আক্রোশে জ্বলতে লাগলো বরুণ। কী যে তার বিশ্রী লাগলো, কী যে রাগ হ'লো তা আর বলা যায় না। মল্লিকাদের হ'য়ে যারা নিতে এসেছিলো, তাদের অতিরিক্ত যত্নে তার বিবমিসার উদ্রেক হ'লো। ফার্স্টক্লাশ কামরার গদিটা মনে হ'লো পৃথিবীর একটি সবচেয়ে অসুবিধের আসন। বৈশাখের পড়ন্ত বেলার গুমোট এত অসহ্য মনে হলো যে সারা জগতের উপরই তার বিরক্তির আর অন্ত রইলো না।

খানিক পরে সন্ধ্যার ধূসরতা যখন ঝাপসা ক'রে দিলো ট্রেনের কামরা, দূরের মাঠ-ঘাটের দিকে তাকিয়ে নিজের শেষ অবিবাহিত সুখী আর স্বাধীন জীবনটির কথা ভেবে বিধুর হ'য়ে উঠলো হৃদয়। কো-এডুকেশনাল কলেজের তরুণীকুলের একচেটে প্রিয় কিংবা প্রিয়তম প্রোফেসর বরুণ সেন কেবল কাঁদতে বাকি রাখলো।

সন্ধ্যা গাঢ় হ'য়ে উঠলো। বাইরে একখণ্ড মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছিলো এতক্ষণ, এবার প্রচণ্ড বেগে তুফান তুললো একটি। উড়লো ধূলো, খসলো পাতা, হাওয়ার ঝাপটায় ছোট-ছোট অসংখ্য বৃষ্টিবিন্দু ছিটকে এলো ভেতরে বন্ধু পূর্ণেন্দু তার আঙুলের ফাঁকে বই বন্ধ ক'রে আকাশে তাকালো। তার মোটা কাচের চশমা ঝিলিক তুললো একটি, স্বভাবতই মাথার এলো-মেলো চুল আরও অবিন্যস্ত হলো। একগাল হেসে বললো, 'এরই নাম পুষ্পবৃষ্টি হে। ভালো।'

সমীর রায়, বসনভূষণে টিপটপ, অনেকটা স'রে গেলো জানালা থেকে, থুৎনিটা কণ্ঠায় ছুঁইয়ে প্রথমে মাথা নেড়ে এ-পাশ ও-পাশ পর্যবেক্ষণ করলো তার কাপড় জামা ছাঁট লেগে কোথাও নষ্ট হয়েছে কিনা, তারপর আলগোছে চকচক জুতোটি ছেড়ে পা তুলে আঁট হ'য়ে ব'সে বললো, 'বৃষ্টিতে পুষ্প আছে কিনা জানি না, তবে ভেতরে যে বেশ মেঘ জমেছে তা তো দেখতেই পাচ্ছি।'

এ-কথায় বিমর্ষ বরুণ মুখ ফিরিয়ে আধখানা চোখে বন্ধুদের দিকে তাকালো, তারপর আবার দৃষ্টি ভাসিয়ে দিলো বৃষ্টির জলে। সহাস্যে শান্ত চোখে তাকিয়ে প্রশান্ত আস্তে হাত দিল তার পিঠে; 'কী ভাবছো?'

'ভাবছি?' বরুণ হাসলো একটু, 'কী আর—'

'আলোটা জ্বেলে দাও তো হে,' ঝাপসা আলোয় পূর্ণেন্দু আবার তার বইয়ের অক্ষর হাতড়াচ্ছে তখন।

'অন্ধকার তো বেশ লাগছে, একটা আবহাওয়া তৈরি হয়েছে।' আধ-খাওয়া সিগারেটটি পায়ের তলায় পিষে দিয়ে প্রশান্ত বললো, 'আমি বলি কী বরুণ, এখন যতটা খারাপ লাগছে, শেষ পর্যন্ত হয়তো মতটা বদলে যাবে।'

সমীর রায় মুখ টিপে হাসলো, 'আহা। বেচারা বহুবল্লভ বরুণ সেন! কোথায় কত তরুণীর হৃদয়ে কম্পন তুলে কলেজের করিডোর কাঁপিয়ে দিব্যি আবু হোসেনের পার্ট করছিলো, আর কোথায় হাওড়া থেকে তিন ঘণ্টা ঠেঙিয়ে এক গণ্ডগ্রামে—তা হৃদয়ে তো একটু আঘাত লাগবেই। একটু তো খারাপই লাগবে মনটা।'

পূর্ণেন্দু তার চিরাচরিত অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে খিঁচিয়ে উঠলো, 'আলোটা জ্বালবে কি জ্বালবে না বলো দেখি।'

'আজকের মতো এমন সুন্দর সন্ধ্যেটা তুমি আলো জ্বেলে নষ্ট করবে, পূর্ণেন্দু?' প্রশান্ত ওর হাত থেকে কেড়ে নিলো বইটা, 'আর না-ই-বা পড়লে।'

'তার বদলে কী করবো শুনি? যার জন্যে সব ফেলে কাজকর্ম কামাই ক'রে এই অসময়ে ট্রেনে চেপে দৌড়চ্ছি, তার মুখখানা দেখে তো মনে হচ্ছে যেন শশ্মানে চলেছেন।'

বরুণ ঘুরে বসলো, 'সত্যি-সত্যি এই মুহূর্তে আমার কী মনে হচ্ছে জানো?

'শোনা যাক!'

'ট্রেন থেকে লাফিয়ে পালাই।'

'মর্বিড।' খট ক'রে এবার পূর্ণেন্দু নিজেই উঠে আলো জ্বেলে দিলো। বললো, 'দ্যাখো, বরুণ বয়স ঢের হয়েছে বালকের ঢং ছাড়ো।'

'বিয়ে তো আমরাও করেছি—' সমীর রায় তার পরিপাটি ফুলকোঁচাটি নাড়ালো, 'কী আর এমন খারাপ অবস্থা দেখছো আমাদের?'

'বুকে হাত দিয়ে বলো না, বিয়ে না-করলে এমন বা কী ক্ষতি ছিলো? মিছিমিছি কতকগুলো ঝামেলা বাড়ানো ছাড়া আর কী সুখটা তোমাদের জীবনে বেড়েছে বলতে পারো?'

প্রশান্তর হাত থেকে বইটা টেনে নিয়ে বেগে পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে পূর্ণেন্দু রেগে বললো, 'বলতে পারি এই যে, তুমি একটি আস্ত বর্বর, তোমার সেই প্রস্তর যুগেই জন্মানো উচিত ছিলো।'

প্রশান্ত নখে সিগারেট ঠুকতে-ঠুকতে নিঃশব্দে হাসলো—'একটা গল্প শুনবে বরুণ?'

'বলো না।'

'আমার মনে হচ্ছে সেটা তোমার কাজে লাগবে।'

'সময়টা তো অন্তত কাটবে।'

'তোমারা কী বলো?' অন্য বন্ধুদের দিকে তাকালো প্রশান্ত।

সমীর বললো, 'খুব ভালো। বাইরে এইমাত্র ঝড় ব'য়ে গেলো একটা, আবার মেঘের ফাঁকে চাঁদও উঠছে গোল হ'য়ে, ফার্স্ট ক্লাশ কামরাটিতে আমরাই শুধু যাত্রী, ঠিক বইয়ের মতোই তো সব সাজানো। এমন সময়ে, এই ব্যাকগ্রাউণ্ডে একমাত্র গল্পই ভালো জমতে পারে।'

মাথা নেড়ে সায় দিলো পূর্ণেন্দু।

প্রশান্ত বললো, 'আশ্চর্য। সেই রাতটাও কিন্তু ঠিক এমনিই ছিলো।'

'কোন রাতটা?'

'যে রাত্তিরে ওদের বিয়ে হ'লো দু'জনের।'

'ও' গল্প আরম্ভ হ'য়ে গেছে?'

'জানো, ঠিক সেদিনও সন্ধ্যাবেলা এরকম ঝড় হয়েছিলো খানিকটা, তারপর, ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে গিয়েছিলো। বিয়ের লগ্ন প্রথম রাত্তিরেই ছিলো তাড়াতাড়িই সাঙ্গ হ'য়ে গেলো সব, কিন্তু দু'জনের কোনো আলাপ হ'লো না।'

'কেন, আগে আলাপ ছিলো না?'

'না। বিয়ে ঠিক করেছিলেন বাবারা দু'জনে, অতএব—'

'ও। তারপর?'

'তারপর দিন তো বাসি বিয়ে। সেদিনের কথা আলাদা। কিন্তু ফুলশয্যার দিনও ছেলেটি সারারাত জানালার কাছে ব'সে একটার পর একটা সিগারেট খেলো। একটা টিন খালি হ'য়ে গেলো। আর মেয়েটি ফুলের মধ্যে ডুবে গিয়ে শুয়ে রইলো চুপচাপ। ঘুমুলো কিনা কে জানে।'

'অর্থাৎ অনিচ্ছার বিয়ে? মানে, এই রকম?'

'ঠিক তাই। অবিশ্যি প্রথম রাত্রিতে অপর্ণার মনে কিছুই হয়নি।'

'অপর্ণা কে?'

'তুমি একটা আস্ত ইডিয়ট, এটুকুও বোঝ না। নাও, তুমি ব'লে যাও।'

ঈষৎ ভুরু কুঁচকে সমীরকে ধমকে দিয়ে গল্পের গন্ধে গুটিসুটি এগিয়ে বসলো পূর্ণেন্দু।

মৃদু হেসে প্রশান্ত বললো, 'ফুলশয্যার দিনই তার একটু অদ্ভুত লাগলো লোকটির ব্যবহার। যেন এর মধ্যে অন্য কোনো ইঙ্গিত দেখতে পেলো সেদিন। অবিশ্যি রাত্রিগুলোই যে একমাত্র কথাবার্তা বলবার উৎকৃষ্ট সময় এবং সুযোগ ছিলো সেই বাড়িতে তা নয়। ইচ্ছে করলে অতীন (সমীর রায়ের দিকে তাকিয়ে) অর্থাৎ অপর্ণার নববিবাহিত স্বামী—

অনেকবারই অনেক সময়েই দেখা করতে পারতো তার নববিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে। দু-চারবার যে তারা একেবারে মুখোমুখি না-প'ড়ে গেছে এমনও নয়, কিন্তু অতীন স'রে গেছে ব্যস্ত পায়ে। প্রথমে অপর্ণা ভেবেছিলো লোকটি তো আচ্ছা লাজুক। এখন মনে হ'লো ঠিক তা নয়, এর মধ্যে আরো কিছু লুকোনো আছে।

অপর্ণার বাবা থাকেন ময়মনসিংহে। সামান্য স্কুল মাস্টারি করেন. এই মা-মরা মেয়ে নিয়েই তাঁর সংসার। অপর্ণা বৃত্তি-পাওয়া ছাত্রী, আধুনিক হালচাল না জানলেও লেখাপড়া শিখেছে মনোযোগ দিয়ে, সৌজন্য শিখেছে, সুরুচি আয়ত্ত করেছে। তাদের বাপবেটির নির্ঝঞ্ঝাট সংসারে একা একাই বড় হ'য়ে উঠেছে সে। আসলে সেখানে বইয়েরই প্রাধান্য বেশী, শিক্ষাদীক্ষার ধ্যানধারণা বই প'ড়ে-প'ড়েই। বাপের সঙ্গে আর বইয়ের সঙ্গে খুব সুখেই ছিলো সে। বিয়েটা হ'লো একেবারে হঠাৎ।

ঘটনাটি এই রকম ঃ

কোথা থেকে এক কর্নেল মুখার্জি এসে একেবারে তোলপাড় করলেন ময়মনসিংহ শহর। চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রায় ঈশ্বর তিনি। বৃদ্ধ মরণাপন্ন জমিদারের অসুখ উপলক্ষে কলকাতা থেকে তাঁকে আনানো হয়েছিলো। অসুখ সারিয়ে দিয়ে ফিরে যাবার সময় পুত্রবধূ নির্বাচন করে গেলেন তিনি অপর্ণাকে। অর্থাৎ ইনি, এই কর্নেল মুখার্জি ময়মনসিংহেরই ছেলে। প্রিয়নাথের মানে অপর্ণার বাবার এককালের বন্ধু। ছাত্রজীবনে এই নিরীহ মাস্টার প্রিয়নাথের মগজের চাইতে আর সকলের মতো ইনিও অনেক খাটো ছিলেন। সারাদিন প্রিয়নাথ যেমন বই মুখে নিয়ে একটা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ রাখতো নিজেকে, তিনি তেমন সকালে সাঁতার, দুপুরে স্কুল পালানো, বিকেলে ফুটবল, বাদবাকি আর সব সময় উদ্দাম আড্ডায় আকাশের তলায় দিন কাটাতেন। কিন্তু দুই প্রকৃতির এই দু'জন মানুষের মধ্যে কোথায় একটা গভীর মিল ছিলো। কিংবা একে অপরের কাছে নিজের-নিজের অভাবটুকু মেটাবার খোরাক পেতেন ব'লেই হয়তো এই আকর্ষণ। কে জানে। মোট কথা দু'জন নিতান্ত অন্তরঙ্গ ছিলেন। কিন্তু বিদ্যায় বুদ্ধিতে বন্ধুর চেয়ে খাটো থাকলে কী হবে, বড় হয়ে ডাক্তারি পড়তে এসে দেখা গেলো কর্নেল মুখার্জির সমস্ত প্রতিভা তাঁর সেই ক্ষণটুকুর জন্যেই অপেক্ষা করছিলো। অর্থাৎ ডাক্তারি পাশে তিনি প্রথম নম্বর হলেন। এখানে তো হলেনই, বিলেত থেকেও লম্বা লম্বা পাশ দিয়ে লম্বা-লম্বা ডিগ্রী নিয়ে এলেন অনায়াসে। কলকাতা শহরে দেখতে-দেখতে তাঁর নাম-ডাক ছড়িয়ে পড়লো, দেখতে-দেখতে তাঁর বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়ি, ছোট বড় মেজো, তিনখানা গাড়ি সব উল্লেখযোগ্য হ'য়ে উঠলো।

তারপর বহুকাল প্রবাসী। মুঠো-মুঠো উপার্জন করা ছাড়া আর কোনো দিকেই তিনি তাকাবার অবকাশ পেলেন না। শৈশবের সুখে শ্যাওলা জমলো, যৌবনের স্মৃতি ফিকে হ'লো, একেবারে জীবনের অপরাহ্নে পৌঁছিয়ে কতকাল পরে আবার এলেন তিনি ময়মনসিংহে, তাও টাকা রোজগারের মোহেই। কিন্তু এসেই মনে প'ড়ে গেলো সব। সবুজ

গাছপালার দিকে তাকিয়ে মনখানাও যেন সবুজ হ'য়ে উঠলো। আর প্রিয়নাথকে দেখেই জড়িয়ে ধরলেন বুকের মধ্যে। প্রিয়নাথের মেয়েকে দেখে মুগ্ধ হলেন।

লাজুক প্রিয়নাথের ততোধিক সলজ্জ শান্ত মেয়ে মধুর হেসে প্রসন্ন অভ্যর্থনায় ভ'রে দিলো তাঁকে, পাকা গিন্নির মতো কাছে বসিয়ে তালপাতার পাখায় হাওয়া করতে-করতে অনেক রান্না করে খাওয়ালো। তাদের একতলা বাড়ির বই-ঠাসা বসবার ঘরের আড্ডাটি বেশ জমলো ক'দিন। কাকাবাবুর পাকা চুল তোলার বাবদ এক টাকা রোজগার হ'লো, তার বাগানের সবচেয়ে সুন্দর গোলাপ ফুলটি ছিঁড়ে ফেলার অপরাধে কর্নেলের ফাইন হ'লো আট আনা, প্রিয় লেখক নিয়ে ঝগড়া হ'লো খেতে ব'সে। সাহিত্যের খবরে আনাড়ি পিতৃবন্ধুকে অনেক শিক্ষিত করলো অপর্ণা। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার স্বীকার করলেন যে যৌবনে তিনি কয়েকটা প্রেমের কবিতা লিখেছিলেন বটে, কিন্তু প্রিয়নাথ বলেছিলো সব ক-টাই রাবিশ। সেই দুঃখেই আর এ-জগতের খবর তিনি রাখেননি।

যাবার সময় এই কাণ্ডটি ক'রে গেলেন। প্রিয়নাথের হাত ধ'রে প্রার্থনা করলেন মেয়েটিকে। বললেন, অতীন অযোগ্য নয়। ছেলের সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বলা অশোভন, কিন্তু সে তারই যোগ্য। বি.এস-সি. পাশ ক'রে ইঞ্জিনিয়ার হ'য়ে এসেছে বিলেত থেকে। বিদেশের ডিগ্রী তার জোরালো। বয়স কম হ'লে হবে কী—উপার্জনে তার বাপকে সে ধরলো ব'লে।

প্রিয়নাথ আর কী বলবেন? কুণ্ঠিত মুখে হাসলেন, একটু ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন হঠাৎ, তারপর দু-বার কাশলেন অকারণে। যখন একা হলেন আকাশের দিকে তাকিয়ে ভগবানকে মনে পড়লো তাঁর। আরো অনেকবারের মতো আবারও তাঁর দয়ায় বিশ্বাসী হলেন।

মেয়ে তাঁর যোগ্যই, তাই ব'লে ভাগ্য এমন অনায়াসে দরজায় এসে মুঠো ভ'রে দেবে তা তিনি আশা করেন নি।

অপর্ণা শ্বশুরবাড়ি এলো। অর্থাৎ তার ডাক্তার কাকাবাবুর বাড়ি। কিন্তু কাকাবাবুকে দেখে তার যা মনে হয়েছিলো তার সঙ্গে এ বাড়ির কিছুরই মিল খুঁজে পেলো না সে। তাঁর ছেলের সঙ্গেও অবিশ্যি পায় নি — চারপাশে তাকিয়ে ভারি বেমানান মনে হ'লো তার। এখানকার হালচালের সঙ্গে তার আটপৌরে জীবনের কোনই সম্পর্ক ছিলো না, নিজেকে মেলাতে তার কষ্ট হ'লো। কিন্তু লোক ওঁরা সবাই ভালো। সবাই শান্ত, ভদ্র, চুপচাপ। তাই খুব কিছু-একটা খারাপও লাগলো না। তাছাড়া এ-বাড়িতে সকলেই একা, কারো সঙ্গে কেউ তেমন মেলামেশা করে না। তাতে অপর্ণা একা থাকার অবকাশ পেয়েও খানিকটা হাঁপ ছাড়লো।

শাশুড়ী যেমন রূপসী তেমনি বিদুষী। বয়স হয়েছে, কিন্তু আঁটো গড়ন। চলেন ফেরেনও একটু অন্যভাবে। এখনও রঙিন শাড়ি ঘুরিয়ে পরেন, সারাদিন হিলতোলা চটিতে খুটখুট ক'রে চলেন, কথা বলেন নরম গলায়, বাংলা বলেন ইংরিজি সুরে। তা মন্দ কী! যাঁর যেমন অভ্যেস। বরং ভালোই লাগলো অপর্ণার এই নতুন জগতের অধিবাসীদের।

কেবল রং মাখাটাতেই মনে মনে আপত্তি করলো সে। শিক্ষা সভ্যতার সঙ্গে ওটাকে খাপ খাওয়াতে তার ভালো লাগলো না। কেমন কুরুচির ধার-ঘেঁসা লাগলো ব্যাপারটা।

ননদ আছে একটি। তার বিয়ে হ'য়ে গেছে। তারা আবার এদের চেয়েও আধুনিক। সাজে-সজ্জায় এদের চেয়েও পটু। পেট-খোলা কাঁচুলিতে, পাতলা শাড়িতে, হোয়াইটেক্সের শাদায়, কিউটেক্সের লালে, লিপস্টিকের পাকা পটলে, কার্ল-করানো বাবরি চুল নিয়ে মাঝে-মাঝেই বেড়াতে আসে সে। হয়তো একটু অবহেলা করে ভ্রাতৃবধুকে, কিন্তু তবু ভালো। হাসি-খুশি, মনখোলা, প্রাণখোলা, অনেকটা যেন কাকাবাবুর মতো। তা সাজ-সজ্জাতে কী এসে যায়? মনে-মনে ভাবে অপর্ণা—মানুষটাই আসল।

কাকাবাবু বললেন, 'এ-বাড়ি কেমন লাগছে মা-মণির?' অপর্ণা মিষ্টি হেসে শ্বশুরের দিকে তাকালো, কথা বললো না। 'বই চাই না? আজই তোমাকে নিয়ে আমি বেরুবো, দোকান উজাড় ক'রে দেবো। আচ্ছা, কোন লেখক তোমার সবচেয়ে প্রিয় বলো দেখি।'

'নাম বললেই যেন কেউ বুঝতে পারবে।' সেই মিষ্টি হাসিটি কালো কালো চোখের তারায় ভাসিয়ে দিয়ে শ্বশুরকে ঠাট্টা করলো অপর্ণা, 'যদি বলি ভরদ্বাজ পত্রনবীস একজন মস্ত লিখিয়ে তাহ'লেও যা, আর এদিকে—'

'আর এদিকে নিশীথ সেন, সুপ্রিয়া বসু, চঞ্চল মিত্র, সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত ঘোষ—তারাও তাই না?' পুত্রবধুর উপর খুব একহাত নিলেন কর্নেল মুখার্জি। আধুনিক লেখকদের সব নাম একদিনে গড়গড়িয়ে মুখস্থ করেছেন তিনি।

দু-জনেই হেসে উঠলো একসঙ্গে। অপর্ণার মন থেকে একটা গুমোট হাওয়া নেমে গিয়ে যেন হালকা রোদের ছোঁয়া লাগলো।

শাশুড়িও একদিন অবিশ্যি নরম আর মিহি গলায় বললেন, 'এখানে কোন কষ্ট হচ্ছে না তো?'

অপর্ণা মুখ নিচু ক'রে বললো, 'না কষ্ট কেন হবে?' তিনি একমুহূর্ত তাকিয়ে থেকে আবার বললেন, 'তোমাকে নিয়ে একটু বেরুতে হবে। কয়েকটা শাড়ি আর কয়েক জোড়া জুতো কেনা দরকার তোমার।'

'আমার?'

'হ্যাঁ। কিছু কস্‌মেটিক্সও কিনতে হবে সেই সঙ্গে।'

'আমার জন্য।'

'হ্যাঁ। বাড়িতে লোকজন আসেন, তাঁরা তোমাকে দেখতে চান।'

কথাটা বুঝলো অপর্ণা। একটু আরক্ত হ'লো, কানের কাছটা গরম হ'লো একটু। খুব ভদ্র এই ভদ্রমহিলা, বরং একটু বেশি। এর চেয়ে বেশি বলা তাঁর অভ্যেস নেই। অপর্ণার মতো বুদ্ধিমতী মেয়েরই বা এর চেয়ে বেশি শোনার দরকার কী?

রাত্রিবেলা শুতে এলে অতীন জিজ্ঞেস করে, 'আমি যদি একটু আলো জ্বেলে পড়ি কিছু কি অসুবিধে হবে?'

সমস্ত দিনান্তে এই তার নতুন স্ত্রীর সঙ্গে প্রাত্যহিক আলাপ। ধবধবে বিছানার নরম গদিতে নিজেকে প্রায় লুকিয়ে ফেলে অপর্ণা অস্ফুটে বলে, 'না।'

গম্ভীর মুখে অসহ্য সুন্দর চেহারা নিয়ে টেবল-ল্যাম্পের তলায় তখন বই পড়ে অতীন, কাগজের উপর পেনসিল দিয়ে কী যেন আঁকে। হঠাৎ একবার একদিকে তাকিয়ে একটা বই দিয়ে আড়াল ক'রে দেয় আলোটা। অনেক পরে চেয়ার ঠেলে উঠে ড্রেসি-গাউনটা খুলে ব্রাকেটে রেখে দেয়। বলিষ্ঠ শরীরে গেঞ্জিটা আঁটো হ'য়ে বসে থাকে ; আর সেই ঘরোয়া চেহারাটুকু মুহূর্তের জন্য দেখতে-দেখতে অপর্ণার বুকের মধ্যে ঢেউ ব'য়ে যায়। ভীষণ ইচ্ছে করে—কী ইচ্ছে করে জানে না, একটা অদম্য কোনো আশা উদ্‌ভ্রান্ত করে তাকে।

অতীন টিপ ক'রে আলো নিবিয়ে ঘর অন্ধকার ক'রে শুয়ে পড়ে নিজের খাটে।

দিনের বেলা সাড়ে-আটটা পর্যন্ত বাড়ি থাকে সে। এদিকের অংশটা সবটাই অপর্ণার, ওদিকটা শাশুড়ীর। বাইরের মহলটা শ্বশুরের। ময়মনসিংহে বাবার ওখানে সকাল থেকে কত কাজ থাকতো। ঘর গুছোনো, বাবার সব ঠিক ক'রে দেওয়া, পান সাজা, বাজার হিশেব, ময়লা কাপড় কাচা, রান্নার তদারক, তারপর বাপে মেয়ে একসঙ্গে খেয়ে বেরিয়ে যাওয়া। ফেরাটাও প্রায় তা-ই হ'তো। এসেই সে লেগে যেতো চায়ের যোগাড়ে, নিত্য নূতন জলখাবার তৈরী ক'রে তাক লাগিয়ে দিতো বাবাকে, তারপর বই। এখানে আর কী কাজ। সারা বাড়িতে তারা সব সুদ্ধু চারিটি মানুষ, অথচ বাবুর্চি, বেয়ারা, মালি, দাসী, কত তার ইয়ত্তা নেই। শাশুড়ির কাছে সমস্তক্ষণ ব'সে আছে নেপালী মেয়েটা, এই তাঁর চুল আঁচড়াচ্ছে, নখ পালিশ করছে, চায়ের বাটি এগিয়ে দিচ্ছে, আর সারাক্ষণ অপেক্ষা করছে কখন তিনি কী বলবেন। এদিকে অতীন যতক্ষণ ঘরে আছে তার পেছনে ঘুরঘুর করছে একটা বেয়ারা, এগিয়ে দিচ্ছে জামাটা, জুতোটা, মুছে দিচ্ছে টেবিলটা, নয়তো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে চুপচাপ।

গাড়ি ধোবার লোকটা কেবল তিনটে গাড়িকেই আয়না করছে সারাদিন। তারই মধ্যে অপর্ণা টুকটাক অতীনের কাজগুলো হাতে তুলে নিলো। প্যান্টে বকলস পরানো, শার্টের বোতাম লাগনো, নিত্যি নতুন রুমাল বের ক'রে দেওয়া, কোন্-কোন্ বইগুলো সঙ্গে যাবে (এটা সে বুঝে ফেলেছে কয়েক দিনের মধ্যেই) সে-সব ঠিক করা, টেবিল গুছিয়ে রাখা—তাছাড়া অতীন মানুষটি অমনযোগী, চশমাটা কতবার হারায় তার ঠিক নেই। হাতের ঘড়িটা এই মুহূর্তে কোথায় রাখে তার পরেই খুঁজে লণ্ডভণ্ড, দরকারি কাগজ মুহুর্মুহু হারিয়ে যায়, সে-সব দিকেই সতর্ক নজর রাখলো অপর্ণা। বেয়ারা ব'সে থাকে দরজার বাইরে, ঘরের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে অপর্ণা এই সব করে। অতীন ততক্ষণে বাথরুমে সুগন্ধি সেন্টের জলে, আধঘণ্টা ধ'রে স্নান সেরে সারা গায়ে বাথ-পাউডারের সৌরভ ছড়িয়ে হাতের কাছে সমস্ত প্রস্তুত পায়।

এতখানি সময়ের মধ্যে স্ত্রীর সঙ্গে সে একটাও কথা বলে না। শুধু যাবার সময় বিদায়

নেয় একটু ফিরে তাকিয়ে। এরা যে ভদ্র!

ক্রমে এটা বুঝতে পারলো অপর্ণা যে শ্বশুরের কাছে তার যে-মূল্যই থাক, এ-বাড়িতে সে নিতান্ত অবহেলার পাত্র। শাশুড়ি বা তাঁর পুত্রের কাছে নেহাৎ নগণ্য। তুচ্ছ। কৃপার যোগ্যমাত্র। এঁদের দু'জনের মনপ্রাণ একতারে বাঁধা। অপর্ণার মতো শান্ত ধীর আটপৌবে মেয়েতে তাঁদের মন ভরানো শক্ত।

শাশুড়ি অবিশ্যি হাল-চাল শেখবার জন্যে গভর্ণেস রেখে দিয়েছিলেন একজন। কিন্তু একটা অর্ধ শিক্ষিত অ্যাংলো-ইণ্ডিযান মেয়ের কাছে অপর্ণা কী শিখবে? কেবল রং মাখাব পটুতা, আর চলাফেরাব চাপল্য? রাজি হ'লো না সে। শাশুডি সেদিন গম্ভীব মুখে বলেছিলেন, 'এ-বাড়ির এই নিয়ম।' অপর্ণাও গম্ভীর মুখে বলেছিলো, 'যে-নিয়ম ভালো নয় সেটার আয়ু বাডিয়ে লাভ কি?' অবাক হ'য়ে দিঘির মতো দুই বিশাল চোখ তুলে এতদিনে পুত্রবধুর মুখের উপর তিনি যেন সম্পূর্ণ দৃষ্টিপাত করলেন। তারপব অবাক হ'য়ে একটু মুখ খুললেন ঃ

'অতীনের মতামতটা তুমি বোধহয় জানো?'

'তিনি আমাকে কিছু বলেন নি।'

'বলার আগেই তোমাকে তার যোগ্য হ'য়ে নিতে হবে।'

'পোশাকটাই কি বড যোগ্যতা?'

'সমাজে চলতে-ফিরতে হ'লে তাকেও মূল্য দিতে হবে বৈকি। নিজেকে সাজানো কিছু দোষের নয়।'

অপর্ণা এবার মাথা নিচু ক'রে রইলো, আর কোনো জবাব দিলো না।

কয়েকদিন পরে হঠাৎ শ্বশুর তাকে ডেকে পাঠালেন তাঁর ঘরে। পর্দা সরিয়ে এক পা ঢুকতেই তিনি বললেন, 'এসো।'

অপর্ণা এলো।

'বোসো।'

অপর্ণা বসলো।

'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'বলুন।'

'ভেবে দেখেছি এ-বাড়ি তোমার যোগ্য নয়, তুমিও তাদের [illegible]। দুটোতে বেশ খানিকটা গরমিল হচ্ছে।'

অপর্ণা মাটির দিকে তাকিয়ে রইলো।

'সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত তোমাকেই করতে হচ্ছে।'

অপর্ণা চোখ তুলে মৃদু গলায় বললো, 'এ-সব কেন বলছেন?'

ডাক্তাব অপর্ণার ঘন লম্বা কোমর-ছাড়ানো ঢেউ-তোলা চুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'স্নান করেছো?'

'হ্যাঁ।'

'আমার মা'র চুল ঠিক তোমার মতো ছিলো। বেশ সুন্দর।' একটু চুপ ক'রে কী ভাবলেন, তারপর আবার বললেন, সত্যি ক'রে বলো তো মা, তুমি কি সুখী হয়েছো এখানে এসে?'

অপর্ণা চুপ ক'রে রইলো।

'আমার মনে হচ্ছে তুমি বরং প্রিয়নাথের কাছেই চ'লে যাও। আবার পড়াশুনো করো। তোমাকে আমি বিলেত পাঠাবো।'

অপর্ণা চুপ।

'আমার স্ত্রীর একান্ত অমত ছিলো এই বিয়েতে। তাঁর সমাজ—আর তোমাদের সমাজ দুই জগৎ। কিন্তু আমার মধ্যে দেশের জন্য, নিজের শৈশবের জন্য কোথায় একটা হাহাকার ছিলো। আমি যে-ভাবে বেড়ে উঠেছিলাম সেই স্মৃতি আমার কাছে সুখের ছিলো। আর তোমার মধ্যে সেই সবের একটা পরিপূর্ণ তৃপ্তি দেখেছিলাম আমি। মনে হয়েছিলো এ-বাড়িতে তুমি এলে আমার বুক ভ'রে যাবে, আমার হারানো ছেলেবেলা আমি পাবো আবার। এদের কথা ভাবিনি, আর-কিছুই ভাবতে আমার ভালো লাগেনি, কথা দিয়ে এসেছিলাম প্রিয়নাথকে।'

'আমি বুঝেছি, কাকাবাবু—'

'সবটাই শোনো। আমি জানতুম না যে অতীন মনে-মনে আর-একটি মেয়েকে পছন্দ করেছে। তাছাড়া সেই মেয়ে পছন্দের যোগ্যও ছিল না। এরা পুতুলের মতো শুধু সাজেই না, নিষ্প্রাণও ঠিক পুতুলের মতো। যেটুকু প্রাণশক্তি তা বোধহয় এরা স্বামী-শিকারেই ব্যয় করে। আমি দেখেছি কোনো একটি যোগ্য ছেলে দেখলে এদের মধ্যে যেন একটা কাড়াকাড়ির ধুম পড়ে যায়। ভাল লাগার। কিন্তু কি করবো। এই নিয়মেই আমার জীবন-যাপন। কিন্তু যাক সে সব, মোট কথা এ-সংসারে আমার সবই আছে, নেই শুধু প্রাণ। সেই প্রাণই আমি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম, তোমাকে দিয়ে। জীবন ভ'রে আমি এদের কথাতেই উঠেছি বসেছি, মাত্র এই একবার আমি বলেছিলাম। অতীনকে বলেছিলাম আমার ঋণ তোমাকে কড়ায় ক্রান্তিতে শোধ করতে হবে। যতক্ষণ তা না পারো, ততক্ষণ তুমি আমার অধীন। পুত্রবধূ আমি নির্বাচন করবো, তুমি নয়। আমার বাড়িতে আমার হুকুমই একমাত্র। তোমাদের নয়। আমার চ্যাঁচামেচিতে ওরা মা আর ছেলে চুপ ক'রে গেলো। ওরা নিঃশব্দে রক্ত শুষে নেয় শরীরের। আমি বুঝেছি সেই প্রতিশোধই ওরা নিচ্ছে তোমার উপরে।'

অপর্ণা চুপ।

সেইরাত্রে অপর্ণার একটুও ঘুম হ'লো না। সারারাত সে কী জানি ভাবলো। কী যে ভাবলো, আর কত কিছু যে ভাবলো তার অবিশ্যি কোনো মাথামুণ্ড নেই। আরো এ কথা ভেবেই আত্মধিক্কারে জর্জর হ'লো, শ্বশুরকে এ-সব বলতে হ'লো কেন? সে কি নিজে

বোঝেনি এঁদের ব্যবহার? এঁদের অবহেলার নিঃশব্দ ভঙ্গি? এ-বাড়িতে এই ভঙ্গিই কি তার প্রত্যেক মুহূর্তের বেদনা নয়? এঁরা যে কেউ তাকে পছন্দ করেন না, তা কি এঁরা কখনো লুকিয়েছেন? তবে?

অতীন তাকে একদিনের জন্যও তাঁর স্ত্রীর মর্যাদা দেয়নি, তার কোনো অস্তিত্বই সে স্বীকার করেনি, তাও কি সে বোঝেনি? আর এও সে জানে যে কখনো করবেও না।

অতীন কোথাও নিয়ে যায় না তাকে, কেউ এলে ডাকে না, সেই অবিবাহিত জীবনই সে যাপন করছে এখনো। ঋণ শোধ করছে বাপের। মিসেস মুখার্জিও তো তাকে এ-বাড়ির বধূর পদ দেন নি। তিনি পার্টিতে যান, বন্ধুবান্ধব এলে ড্রয়িং রুমে বসেন, সাহেবসুবোকে ডিনার খাওয়ান, কখনো তো তাকে পরিচয় করিয়ে দেন না কারো সঙ্গে। সে থাকে অন্তঃপুরে, অন্তরালে। যেন তাকে বার করলে এ-বাড়ির মান মর্য্যদা সব ভেসে যাবে। অথচ এ-বাড়িতে তার আসনও তো কিছু কম নয়।

ছি ছি। তবু সে এদের সঙ্গেই জড়িয়ে রেখেছে নিজেকে? এদের সুখ সুবিধের ব্যবস্থাতেই ঢেলে দিয়েছে মন? ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত এদের কথাই ভাবে?

শাশুড়ির প্রয়োজন বুঝে নিজে গিয়ে সে তাঁর ঘরে দাঁড়ায়, বাবুর্চিখানায় গিয়ে তদারক করে রান্নাবান্নার। অতীনের যখন যা দরকার তার জন্যে সে এক পায়ে খাড়া।

ছি ছি!

এ-সংসারে শৃঙ্খলা নেই। শ্বশুর উপার্জন করেন দু-হাতে, শাশুড়ি খরচ করেন দশহাতে। তাই কিছুতেই কুলোয় না। বাড়ি পরিষ্কার করবার লোক আছে দুটি, তবু কার্পেটের তলায় পৃথিবীর নোংরা। দামি দামি আসবাব যত্নের অভাবে মলিন। অমন সুন্দর লনটা, ঘাসগুলো জল না-পেয়ে ধূসর। আর বাগানের কী হাল। অথচ ফটকের কোণে সুন্দর একতলা ঘরটিতে মালি বাস করে সপরিবারে। শ্বশুর বুড়ো হয়েছেন, এজন্য তাঁর শৈশবের মতোই স্নেহ মমতা সেবা যত্নের দরকার, সেই ভৃত্যদের হেপাজতেই প'ড়ে আছেন ভদ্রলোক। মিসেস মুখার্জি নিজের সুখ সুবিধের দিকে নজর রেখে আর কোনোদিকে তাকাতে পারে না। ভালোবাসেন না ঘেঁষা-ঘেঁষি বাড়াবাড়ি। সন্তান দুটিকেও তিনি সেই রকম ছাড়া-ছাড়া ভাবেই মানুষ করেছেন। নিজের ঘরে নিজের সাজসজ্জা, আর বাইরে বড়-বড় পার্টি নিয়েই তাঁর জীবন।

ছেলেবেলায় অতীন থেকেছে দার্জিলিং পাবলিক স্কুলের বোর্ডিংয়ে। মেয়ে মুসৌরিতে। ষোলো বছর বয়সেই বিলেত চ'লে গেলো ছেলে, আর তার কয়েক বছরের মধ্যেই বিয়ে হ'য়ে গেলো মেয়ের। মা'র সঙ্গে আর কখন দেখা হ'লো তাদের? পরস্পরের উষ্ণতায় তাই তারা কেউ হৃদয়বান নয়। সবাই একা, সবাই ছাড়া-ছাড়া, যার-যারটা নিয়ে সে-সে ব্যস্ত। একজনের জন্য যে আরেকজনের ব্যাকুলতা সেটা যেন এ বাড়িতে কেউ বোঝেই না।

আর কর্নেল মুখার্জি। তাঁর পদমর্যাদা তো প্রায় অপর্ণার মতো। তিনি স্যুট পরলে কী

হবে? কথা বলেন চেঁচিয়ে, হাসেন খোলা গলায়, মেশেন সকলের সঙ্গে। হাজার-হাজার টাকা উপার্জন ক'রেও সমকক্ষতার ধার ধারেন না। ভালো লাগলেই হ'লো। সে-ই তাঁর বন্ধু। কোনো-কোনদিন মনের আনন্দে যদি সহসা হা-হা ক'রে হেসে ওঠেন, মিসেস মুখার্জি তাঁর কাজল-মাখা দুই হরিণ চোখ তুলে একবার মাত্র তাকান স্বামীর দিকে, কর্নেল মুখার্জি চুপ।

তাঁর যেমন বাঘের মতন গর্জন-গলা, মিসেস মুখার্জির তেমনি সিল্কের মতো নরম। কর্নেল মুখার্জি হাতের কাছে কলিং-বেল থাকা সত্ত্বেও চেঁচিয়ে ডাকবেন, 'ওরে রামা, ও'রে, নিবারণ—

আর মিসেস মুখার্জি নিঃশব্দে উঠে যাবেন সেখান থেকে। তাঁর মাথা ধ'রে যাবে সেদিন। তিনি কেমন সুন্দর গোল ক'রে, মিষ্টি ক'রে ডাকেন 'আয়রা', ডাকেন 'ব্যেরা', ডাকেন 'বেবায়'। তবে কোন দিক দিয়ে মিলবেন তাঁরা? অথচ কর্নেল মুখার্জি বিলেত থেকে আসবার পরে এই মানুষের সঙ্গেই নাকি প্রেমে পড়েছিলেন এই মহিলা। কী ক'রে সম্ভব হয়েছিলো?

তবে অতীনের সঙ্গে তারই বা মিলবে কোন দিকে দিয়ে? অতীন তো তার মায়েরই ছায়া কী চেহারায়, কী চরিত্রে। আর তাছাড়া—তাছাড়া—এখানে এসে অপর্ণার সব ভাবনা গুলিয়ে যায়। এ-কথা ভাবতে ভীষণ কষ্ট হয় যে অতীন অন্য কোনো মেয়েকে ভালোবাসে। তাকে না বাসুক এটা সহ্য হয়, কিন্তু অন্যাকে বাসবে এটা ভাবতে বুক ভেঙে যায়।

হায়! হায়! এই তিন মাসের অবহেলার বিনিময়ে অপর্ণা কি তবে অতীনকে ভালোবেসেছে? ভাবতে-ভাবতে শিরশির ক'রে উঠলো বুকের ভেতরটা, হঠাৎ অন্ধকার ঘরে চারদিক তাকিয়ে উঠে বসলো। নিজের একক শয্যা থেকে নেমে দাঁড়লো সবুজ-রং-লাল-ফুল গালিচার নরমে। বিরাট ঘর। দুই প্রান্তের দুই জানালা ঘেঁষে দুই খাট, মাঝখানে কার্পেটের উপর শ্বেতপাথরের গোল টেবিল। কাশ্মিরী ফুলদানিতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। অতীনের মাথার কাছে তার কাজের টেবিল, পায়ের কাছে বেড-সাইড টেবিলে রুপোর গ্লাসে জল ঢাকা।

অপর্ণা রেখে দেয় রোজ। শোবার আগে, প্রথম প্রথম সে লক্ষ্য করেছে, রোজই এজন্যে বেয়ারাকে ডাকাডাকি করতে হয়েছে অতীনকে। অপর্ণা উঠে এসে নিঃশব্দে জল ভ'রে দিতো। ব্যস্ত হ'য়ে, অন্যদিকে তাকিয়ে অতীন বলতো, 'না, না, ওঠবার কী দরকার ছিলো? বেয়ারা তো আছে।' অপর্ণা জবাব দিতো না, গম্ভীর মুখে জলটা হাতে তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো।

এরকম হাজারো কাজের ডাকাডাকি ওদের সারাদিন। হাজারো বার বেল টেপা। কিছুই ঠিক থাকে না। কিছুই ঠিকমতো পায় না। ডজন-ডজন রুমাল কোথায় যে হারিয়ে যায়। দামি-দামি টাই, কাল যেটা পরেছে আজ সেটা খুঁজে পায় না। মাসে-মাসে জুতো কিনতে

হয়, মূল্যবান স্যুটগুলো যে হঠাৎ-হঠাৎ কোথায় উধাও হয় তার পাত্তা থাকে না। আপিশে যাবার সময়ে রোজ হুলুস্থূল। আর আশ্চর্য! এত কাণ্ডের মধ্যে মা নেই কোনোখানে। সেটা কেউ আশাও করে না; ভাবে না পর্যন্ত। লোকজন যথেষ্ট আছে, তবে আর তাঁকে দিয়ে কী প্রয়োজন?

রোজ আসছে জিনিস, রোজ টান পড়ছে দরকারের সময়। কী শ্বশুরের, কী অতীনের, এই অবস্থা দুটি পুরুষের।

সব ভার অপর্ণা তুলে নিয়েছে নিজের মাথায়। কেউ তাকে বলে নি, কেউ তাকে অধিকারও দেয় নি, তবু যেচে সেধে কখন যে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে কে জানে।

কিন্তু কেন? কেন এটুকু আত্মসম্মান সে বজায় রাখলো না নিজের জন্য। ঐ প্রান্ত থেকে এই প্রান্তরে হেঁটে এলো সে। একেবারে অতীনের বিছানার কাছে। গেঞ্জি গায়ে পাশ ফিরে শুয়ে আছে, জানালা দিয়ে আকাশের আলোয় ধোয়া মুখের আধখানা চাঁদের মতো সুন্দর। থমকে দাঁড়িয়ে রইলো অনেকক্ষণ, আর দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে কখন যেন নিচু হ'য়ে খাটের কাছে মেঝেতে হাঁটু ভেঙে ব'সে পড়লো। আর তারপর—তারপর—তারপর সে তাই-ই করলো যা সে কখনো ভাবতে পারে নি। অতীনের এলিয়ে থাকা ঘুমন্ত হাতের উপর মুখ ঘষে-ঘষে আকুল আবেগে কাঁদতে লাগলো।

অবাধ্য হৃদয়ের কোনো অসতর্ক মুহূর্তের এই অসংযমকে একটু পরেই সে শাসন করলো। ভয়ে, লজ্জায়, দুঃখে, ক্ষোভে, আধখানা হ'য়ে দ্রুতপায়ে স'রে এলো নিজেব বিছানার কাছে। বালিশে মুখ ঢেকে বললো, 'ঈশ্বর। বাঁচাও। বাঁচাও। আমাকে তুমি বাঁচাও এই লজ্জা থেকে, এই দৈন্য থেকে। এই কাঙালপনা থেকে তুমি আমাকে রক্ষা করো।'

তার পরের দিন অতীনের ঘুম ভাঙার আগেই অপর্ণা অদৃশ্য হ'লো সেই ঘর থেকে। সে আপিশ থেকে ফেরার আগেই রওনা হ'য়ে গেলো ময়মনসিং।

কর্নেল মুখার্জি বলেছিলেন 'আজই যাব?'

মৃদু অথচ দৃঢ় গলায় সে বললো, 'আজই, কাকাবাবু। আর সঙ্গে আপনিই যাবেন।'

ডাক্তার ব্যথিত গলায় বললেন, 'তবে তাই হোক।'

শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি তিনি যেতে পারলেন না সঙ্গে। ডাক্তার মানুষ, পরের ইচ্ছেয় বন্দী। একটি রোগী এখন-তখন হ'লো। কিন্তু পুত্রবধূকে তিনি নিজে স্টেশনে নিয়ে এলেন, তুলে দিলেন ফার্স্ট ক্লাস কামরায়, সঙ্গে অ্যাসিসটেণ্ট মৈত্রকে দিয়ে দিলেন। ট্রেন ছাড়বার মুখে শ্বশুরকে প্রণাম ক'রে চোখভরা জল নিয়ে অপর্ণা বললো, 'ভালোমতো থাকবেন। আমি সব ঠিক ক'রে রেখে গেলাম। রাত্রিবেলা ঘুমের আগে ওরা ওভালটিন ক'রে দেবে, খেতে যেন ভুল না হয়। আর ঐ পিঠে ব্যথাটার জন্যে তারপিন মালিশই ভালো—'

'দ্যাখো কাণ্ড।' অ্যাসিসটেণ্টের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার হাসলেন, 'তোমরা তো আমাকে একটা মস্ত কিছু ভাবো, কিন্তু আমার মা যে আমার চাইতেও দিগ্বিজয়ী ডাক্তার সে-কথাটি

বুঝেছ কী?'

পকেট থেকে মস্ত রুমাল বার ক'রে ঘন-ঘন মুখ মুছতে লাগলেন তিনি।

বাড়ি ফাঁকা হ'য়ে গেলো।

কেন হ'লো কে জানে। মানুষটা তো নিতান্ত নিঃশব্দ ছিলো। হাঁক-ডাক, কোলাহল, ফাই-ফরমাস কিছুই তো তার ছিলো না। তবু বাড়ির প্রত্যেকটি লোক অনুভব করলো সে নেই। খেতে ব'সে ভৃত্যেরা তার কথা ভাবলো, বাগান খুঁড়তে-খুঁড়তে মালি আর ছোট্টো নাতি তার কথা ভাবলো, অতীনের বেয়ারাটা ভাবলো, ডাক্তারের দু'জন সহকারী পর্যন্ত না-ভেবে পারলো না।

মিসেস মুখার্জিও অসময়ে ঘর থেকে বেরুলেন। কী যেন কী কারণে—লম্বা বারান্দাটা পার হ'য়ে একবার উঁকি মারলেন অতীনের ঘরে, আবার ফিরে এলেন এদিকে, কেমন বিমনা কাটলো সারাটা দিন। চাল চলন না-ই বা জানলো—ভাবলেন মনে-মনে—কিন্তু বেশ ছিলো মেয়েটা। বুকের মধ্যে কোথায় যেন ছোট্ট কাঁটা ফুটলো বেদনার। অতীন বিলেত যাবার সময় যেন এ-রকম লেগেছিলো একবার। আর একবার মেয়ের বিয়ের দিন।

আর এদিকে অতীন প্রথম দিন জানতেই পারলো না তার তিন মাসের নিঃসঙ্গ চুপচাপ সঙ্গিনীটিকে কেন সে আজ একবারও দেখতে পেলো না। কথাবার্তা না-ই-বা হ'লো, সে যে আছে এটা অনুভব না-ক'রে তো উপায় ছিলো না। টুকটাক এটা করছে, ওটা করছে, হাতের কাছে জোগান দিচ্ছে সব! সকালে দাড়ি কামাবার গরম জলটি থেকে রাত্তিরে ঘুমোবার পোষাকটিতে পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে তার অস্তিত্ব।

রাত্রিবেলা কাজ করতে ব'সে অভ্যাসমতো আলোটা আড়াল করতে গিয়ে থমকালো। অপর্ণার শূন্য শয্যার দিকে তাঁকিয়ে অবাক না-হ'য়ে পারলো না। তবে কি সে এখানেই নেই, এ-বাড়ীতে নেই। কোথায় গেলো? চুপ ক'রে তাকিয়ে রইলো। জানালা দিয়ে একফালি চাঁদ এসে ছড়িয়েছে বালিসের ঝালরে, বিছানার চাদরে।

সহসা মনে পড়ে গেলো কাল রাত্তিরের কথা, যে-যা তাকে আজ সারা দিন উতলা ক'রে রেখেছে। ঘুম ভেঙে কাল এই চাঁদের আলোতেই মেয়েটির আনত মাথার কালোচুলের রাশির দিকে তাকিয়ে অবাক হ'য়ে গিয়েছিলো। এমন কি হাতের উপর তার কান্না-ভেজা নরম মুখের স্পর্শটা অনুভব ক'রে নড়াচড়ার ক্ষমতা পর্যন্ত ছিলো না। একটি মেয়ে—মনের এই উত্তাপ, এই বানডাকা নিঃশব্দ ভালোবাসার গোপন প্রকাশ, কিছুক্ষণের জন্য তাকে অভিভূত ক'রে রেখেছিলো। বাকি রাত আর ঘুমুতে পারেনি সে।

আবেগহীন মায়ের কাছে সে এই অনুভূতি নিয়ে বড় হয়নি, বরং মায়ের চেয়ে যে-বাবাকে সে অনেক স্থূল, অনেক অযোগ্য ভেবেছে। তাঁর কাছ থেকেই এ-রকম দু-একটি ধু-ধূ স্মৃতির বিন্দু ঝাপসা-ঝাপসা তার মনে পড়লো। পাঁচ বছর বয়সে দার্জিলিং বেড়াতে নিয়ে গিয়ে মা যখন তাকে রেখে এলেন বোর্ডিংয়ে, ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলো। আঁচল ধ'রে। হঠাৎ বাবা ব্যাকুল হাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিলেন তাকে। তাঁর পুরুষ-চোখ

ভিজে উঠলো জলে। আজ এতকাল পরে সেই স্পর্শের স্মৃতিটাই মথিত হ'য়ে উঠে এলো অতীনের চেতনায়।

অতীন আজ আর কাজ করতে পারলো না।

কিন্তু তার পরেব দিনও তো সে নেই, তাব পরের দিনও নেই। পৃথিবী তো তেমনিই চলছে, তেমনি সূর্য উঠছে, অস্ত যাচ্ছে, রাত হচ্ছে, ঘুমিয়ে পড়ছে প্রাণীকুল। আবার সকালে উঠে কিচিরমিচির। একদিন আরেক দিনেরই পুনরাবৃত্তি। মাঝখান থেকে মাত্র এই একফোঁটা ব্যতিক্রম, সে নেই। অতীনের ঘরে অতীনের অবাঞ্ছিত মেয়েটি নেই। কী এসে যায়? সে যখন ছিলো, কে তাকে লক্ষ্য করেছে? কে তাকিয়েছে সেই রং-না-মাখা কচি পাতার মতো চিক্কণ-কোমল-ত্বক ঈশ্বর-সৃষ্ট মুখের দিকে? সরোবর-সজল, কাজলহীন চোখের অতলে? মেঘের মতো ঢেউ-ঢেউ ঘন সুগন্ধি চুলের অরণ্যে? সাদা রঙের সাধারণ লাল-পাড় কালো পাড় তাঁতের শাড়ি-জড়ানো ছিপছিপে অপর্ণাকে কে দেখেছে তখন?

যখন চুপচাপ বিমর্ষ মুখে সে আকাশে চোখ পাঠিয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে থেকেছে কেউ তার মনের কথার খোঁজ নেয়নি। কত হয়তো তার কথা ছিলো, ব্যাথা ছিলো, এখানকার আদরহীন, অভ্যর্থনাহীন নিরানন্দ জীবনে সেই বিপত্নীক লাজুক ভদ্রলোকের অতি যত্নে লালিত মেয়েটির হয়তো কত কষ্টই হয়েছে। হঠাৎ অতীন বড় অস্থির বোধ করলো। সব সংকোচ ঝেড়ে সকালে উঠেই সেদিন মা'র দরজায় গিয়ে টোকা দিলো আস্তে।

মিসেস মুখার্জি মুখ-হাত ধুয়ে সবে আয়নার কাছে বসেছেন প্রাতঃকালীন প্রসাধনে। তাঁর প্রলেপহীন রুক্ষ চামড়া, রংহীন বিবর্ণ ঠোঁট, আঁটো কাঁচুলিহীন ঢিলে ব্লাউজের তলাকার গড়নহারা বৃদ্ধ বক্ষস্থল, সব মিলিয়ে তাঁকে যেন একেবারে অন্য মানুষ ব'লে মনে হ'লো অতীনের। হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা হিম বিকর্ষণে মনটা ধাক্কা খেলো জোরে। সভ্য সমাজে যেমন বসনহীন মানুষ নেই তাদের সমাজেও তেমনি প্রলেপহীন মেয়ে নেই। সন্তান হ'য়ে মাকেও সে সহজ চেহারায় দেখেনি কোনদিন। কিন্তু প্রলেপের তলায় এই যে মৃত হাড়ের বরফ-স্তূপ তা তো অতীন জানতো না।

কিছুই জিজ্ঞেস করলো না, কিছুই বললো না, যেমন এসেছিলো তেমনি ফিরে গেলো আবার। সেদিন তার ঘরে মন লাগলো না, আপিশে মন লাগলো না, বান্ধবীদের কাছে আনন্দ করতে গিয়ে আরো তিক্ত হ'য়ে ফিরে এলো। ক্লাবে গিয়ে বিশ্রী লাগলো। তার চব্বিশ বছরের সুকুমার চিত্তে একবিন্দু সুখ রইলো না কোথাও। অবশেষে টিঁকতে না পেরে সন্ধ্যাবেলা পায়ে-পায়ে বাবার ঘরের দরজাতেই দাঁড়ালো এসে।

নিচু হ'য়ে মনোযোগ দিয়ে কাকে চিঠি লিখছিলেন তিনি, সাড়া পেয়ে পেছন ফিরে তাকালেন। তারপর ছেলেকে দেখে একটু অবাক হলেন বোধ হয়। চশমাটা নাকের ডগায় নামিয়ে নিয়ে বললেন, 'কম্ ইন।'

'তুমি কাজ করছিলে?'

পরিষ্কার বাংলায় বাপের সঙ্গে কথা বলা বোধহয় এই তার প্রথম। কর্নেল একটু অবাক হ'য়ে ছেলের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর তিনিও বাংলায় বললেন, 'কিছু বলবে?'

'না, মানে, তেমন—,

'ও, ভালো কথা—' ডেস্কের দেরাজে হাত দিয়ে একখান ধূসর রঙের শৌখিন খাম বার করলেন তিনি, 'এ-চিঠিটা তোমাকে পড়তে পাঠাবো ভেবেছিলাম। তা তুমি এলে ভালোই হ'লো।'

বুকটা ধ্বক-ধ্বক করলো অতীনের। বাবার প্রসারিত হাত থেকে অতি সংকোচে খামখানা নিজের হাতে নিলো সে। কর্নেল মুখার্জি আবার তাঁর স্বভাবোচিত চঞ্চল ভঙ্গিতে খামখানা টেনে নিয়ে এলেন নিজের কাছে, ফস ক'রে খাম থেকে চিঠিখানা বার ক'রে ফেলে বললেন, 'না, সবটা তোমাকে কষ্ট ক'রে পড়তে হবে না, এই যে এই জায়গাটা পড়ো।'

অতীন পড়লোঃ

—'ওঁর ঘরের পূবদিকের জানালার কাছে ছোট শেলফ থেকে ক্যাথারিন ম্যান্সফিলডের দু'খানা গল্পের বই, একখানা মোপার্সাঁ, গীতবিতান প্রথম খণ্ড (পুরোনো সংস্করণ) আর নিশীথ সেনের 'প্রথম রোদ' ও 'বিপাশা' বই ক'খানা অবকাশ-মতো আমাকে পাঠিয়ে দিলে ভালো হয়। আর আমার শাড়ি-টাড়ি-গুলো থাকার দরুন, ও-ঘরটা ব্যবহারে কারো যদি অসুবিধে হয় বা অপরিচ্ছন্ন লাগে তাহ'লে সে-সব আপনি ঐ ওয়ার্ডরোব থেকে খুলে আপনার নিজের আলমারিতে এনে রেখে দেবেন, আমি আর ফিরে যাবো না ব'লেই মনস্থির করেছি। আমাকে নির্বাচন ক'রে আপনি আপনার পুত্রের যে মনোকষ্টের কারণ হয়েছেন, তা থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেবার জন্য যদি আমার আরো কিছু করণীয় থাকে তা হ'লে তার জন্যেও আমি প্রস্তুত আছি জানবেন। তাঁকেও জানাবেন আপনার জন্যে মন-কেমন করে। ওখানকার সকলের জন্য, সব-কিছুর জন্যই আমার মন-কেমন করে। কেন?—'

চিঠিটা ফিরিয়ে দিয়ে অতীন নিজের ঘরে ফিরে এসে অন্ধকারে ব'সে রইলো চুপচাপ। তারপর আলো জ্বেলে হঠাৎ কাগজকলম নিয়ে এই ক'টা লাইন লিখলো ঃ

'দেবী,

জানতে চেয়েছেন এখানকার সকলের জন্য আপনার মন-কেমন করে কেন। তবে ধৈর্য ধ'রে একটু দয়া ক'রে শুনুন, এখানকার মানুষরাও এমন কিছু পাষণ্ড নয় যে তাদেরও কারো জন্যে কিছু মন-কেমন করে না। বেশ করে, খুব করে। ভীষণ, ভীষণ খারাপ লাগে—' এই পর্যন্ত লিখেই ধা ক'রে ছিঁড়ে ফেললো কাগজটা। দারুণ লজ্জা পেলো একা-একাই নিজের ঘরে। ঘাম মুছলো কপালের, গুম হয়ে ব'সে থাকলো খানিক, তারপর আবার লিখলো, 'কাকাবাবুর পুত্রের মনোবেদনার জন্য আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না, দয়াবতী মহিলা। তার কথা সে নিজেই বুঝবে। আপনি নিজে তো কারো কথা না-ভেবে,

একবারও দেখা না-ক'রে পিত্রালয়ে গিয়ে খুব সুখে আছেন? তাহ'লেই হ'লো।'

তৎক্ষণাৎ কুটি-কুটি ক'রে সে-পাতাটি ছিঁড়ে ফেললো সে, হঠাৎ চকিত হ'য়ে উঠে গিয়ে ঠাস ক'রে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে এলো। তারপর আবার লিখলো, 'শোনো, তুমি যদি এক্ষুনি চ'লে না আসো তাহ'লে সত্যি-সত্যি তোমার সব জিনিস-পত্র আমি এঘর থেকে ফেলে দিয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নিজেও অন্য কোথাও চ'লে যাবো।'

তার দু-দিন পরে কাল রাত্তিরের বৃষ্টি-ধোয়া সকালে, যখন নরম রোদ উঠলো চিকচিক ক'রে, তখন একখানা ট্যাক্সি এসে থামলো কর্নেল মুখার্জির লোহার ফটকে। কর্নেল মুখার্জি অনেক রাত অবধি কাজ করেছিলেন, উঠতে একটু বেলা হয়েছিলো সেদিন, সবেমাত্র লনে এসে দাঁড়িয়েছেন একটি পাইপ ধরিয়ে। সকালের শিশিবে খালি পায়ে খানিকক্ষণ বাগানে পাইচারি করা তাঁর অভ্যেস। গাড়ির শব্দে চকিত হ'য়ে ফিরে তাকালেন, আর তাকিয়েই অবাক হ'য়ে বললেন, 'এ কী! তুমি! আরে প্রিয়নাথ যে? কী ব্যাপার?' দ্রুতপায়ে ব্যস্ত ভঙ্গিতে শ্বশুরের কাছে এগিয়ে এলো অপর্ণা—'তাহ'লে আপনি ভালো আছেন?'

খুশিতে উদ্বেল হ'য়ে হাসলেন কর্নেল, 'তুমি কি ভেবেছিলে ম'রে গেছি?'

'তবে-তবে যে—'

এতক্ষণে কর্নেল মুখার্জি লক্ষ্য করলেন উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় শুকিয়ে গেছে অপর্ণার মুখ। নিচু হ'য়ে প্রণাম করলো সে।

প্রিয়নাথবাবু বন্ধুর হাত চাপলেন, উষ্ণতায় দু'জনে ভ'রে উঠলেন মুহূর্তে। বললেন, 'ব্যাপারটা কী তবে বলো দেখি? তুমি তো বেশ ভালোই আছো দেখছি। আর এদিকে মেয়ে কাল টেলিগ্রাম পেয়ে থেকে তো কেঁদে-কেটে খুন।'

'টেলিগ্রাম?'

'দ্যাখো না। তোমার অসুখের জন্যেই তো টেলিগ্রাম।' পকেটে হাত দিয়ে একখানা আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম বার করলেন প্রিয়নাথবাবু। 'বাবার ভীষণ অসুখ। এখুনি চ'লে এসো অতীন।'

কর্নেল মুখার্জি সেই টেলিগ্রামের শব্দ ক'টির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর মুখ তুলে হাসলেন। একবার প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে, একবার অপর্ণার দিকে তাকিয়ে। তারপর বললেন, 'তা হ'লে যাও মা যার অসুখ তাকেই দেখ গিয়ে তাড়াতাড়ি।'

অপর্ণা প্রথমটা অবাক হ'লো, তারপর নিচু করলো মুখ। সকালের সূর্য রক্তিম আলো ফেললো তার সেই নত মুখের উপর।

প্রশান্ত গল্প শেষ ক'রে লজ্জা-লজ্জা মুখে হাসলো একটু। বরুণের দিকে তাকিয়ে মৃদু গলায় বললো, 'তা হ'লেই বুঝতে পারছো, বিরাগটা অনুরাগেরই ভূমিকামাত্র?'

বরুণও চোখে চোখে হাসলো। বললো, 'গল্পটা বেশ ভালোই বলেছো। শুনতে অন্তত মন্দ লাগছিলো না।'

'তাই বলছিলাম,' প্রশান্ত বাইরে তাকালো, 'এ-সব ব্যাপারে প্রথমটায় যত ভয়াবহ ব'লে আমরা আঁতকে উঠি, ঠিক তা নয়।'

বরুণ ঠোঁট বাঁকালো, 'অভয়দানের জন্য ধন্যবাদ।' সমীর প্রায় অভিভূতের মতো শুনেছিলো গল্পটা, হঠাৎ মৌজ ভেঙে ন'ড়ে-চ'ড়ে বললো, 'অভয়দান মানে? বলতে চাও কী তুমি? তুমি কি ভেবেছ এ-সব বুজরুকি? মিথ্যে কথা? আমি বলছি এই-ই আমাদের জীবন। এই হাসি কান্না দুঃখ ভালোবাসা নিয়েই আমরা বাঁচি!' প্রায় দার্শনিক হ'য়ে উঠলো সে।

বরুণ হেসে উঠলো জোরে।

'দ্যাখো, ও-সব ওস্তাদি ছাড়ো', বেশ রাগ করলো সমীর। 'অকপটে স্বীকার করাই ভালো যে মেয়েরা না-থাকলে সংসার চলে না।'

বরুণ কৌতুক করলো, 'তাই নাকি? কেউ-কেউ তো আবার মাঝে-মাঝে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বন্ধুর বাড়ি রাত কাটাতে আসে কিনা, তাই বলছিলাম। আর এমনও তো ইচ্ছে মাঝে-মাঝে কারো হয় যে খুন্-টুন ক'রে না হয় ফাঁসিই যাই।'

'আহা! ও-রকম রাগারাগি সকলেরই হয়। আর সব পুরুষই জানে স্ত্রীহীন জীবন নিতান্ত মরুভূমি।'

এবার হা-হা ক'রে সকলেই হেসে উঠলো। মোটা চশমার ফাঁকে জ্বলজ্বল চোখে তাকিয়ে পূর্ণেন্দু বললো, 'মরুভূমির নমুনা জানা থাকলে একখানা শোনাও না?'

'একখানা কেন? পঞ্চাশখানাও বলতে পারি। এই ধরো, চিন্ময়ী যখন আত্মহত্যা করলো—'

'চিন্ময়ী আত্মহত্যা করলো? সে আবার কে?'

'কে আবার। গল্পের মধ্যে তোমরা যাকে নায়িকা বলো।'

'ও। বেশ। বেশ। তারপর?'

'তারপর সকালে মাথার কাছে লিখে রাখা একটি কাগজ পাওয়া গেলো, 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।'

বরুণ বাধা দিলো এখানে—'গোয়েন্দা-গল্প নাকি হে?'

'আরে না, না। আগেই তড়পাচ্ছো কেন। শোনাই না খানিক,' কাপড়ে টোকা দিয়ে ধুলো ঝাড়লো সে। 'তারপর দ্যাখো না রক্তের গন্ধই পাও না বেশ কামিনী ফুটে ওঠে কাঁটা ঝোপের মধ্যে।'

'সুন্দর বলেছেন।' প্রশান্ত মধুর ক'রে হাসলো।

পূর্ণেন্দু আগ্রহ ভরা গলায় বললো; 'তারপর?'

'তারপর বুঝতেই পারো, এমন একটা মর্মবিদারক অবিশ্বাস্য ঘটনা যে কখনো ঘটতে

পারে এটা ভাবতে বা কল্পনা করতেও মানুষের কতটা সময় লাগে। কেননা স্বামী হিসেবে মৃন্ময় এমন কিছু মন্দ লোক তো ছিলো না যার যন্ত্রণায় বৌ একেবারে বিষ খেয়েই প্রাণ ত্যাগ করবে।'

'কী খেয়েছিলো? আফিং?'

সমীর রায় চোখে বিরক্তি ফুটিয়ে বললো, 'এত যদি কথা কাটো—'

বরুণ মৃদু হেসে বললো, 'ঠিক আছে, তুমি ব'লে যাও।'

সমীর বললো, 'মৃন্ময় তো তখন অবাক হ'য়ে তার চিন্ময়ীর, চিনুর ঠাণ্ডা আর শক্ত শরীরটাকে বারে-বারে নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগলো, বারে বারে নাম ধরে ডাকতে লাগলো। কিন্তু সেই নিষ্ঠুর অসাড় শরীর থেকে এক ফোঁটা প্রাণের সাড়া পাওয়া গেলো না।

'খবর পেয়ে, (অবিশ্যি কেমন ক'রে খবর পেয়েছিলো তা মৃন্ময় জানে না) শ্যামবাজার থেকে বড়দি এলেন, টালিগঞ্জ থেকে দাদা বৌদি এলেন, ছোটপিসি এলেন দমদম থেকে, পাড়া থেকে উৎসাহী লোকেরা খোঁজ নিতে এলো, পুলিশ এলো ভ্যান ক'রে, আরো যে কোথা-কোথা থেকে স্রোতের মতো সব লোক জমা হ'লো বাড়িতে কে জানে। হর্ন বাজিয়ে ডাক্তার ফিরে গেলেন, লোকেরা হা-হুতাশের গুঞ্জনে বাতাস ভারি করলো, মৃন্ময় কেবল চিনুর মাথার কাছে ব'সে বোকার মতো তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলো সব।

'বৌদি চোখের জল মুছতে-মুছতে একখানা সাদা চাদরে ঢেকে দিলেন চিনুকে। বড়দি চন্দন ঘসলেন, কাজল পরালেন, জলভরা চোখে শেষবারের মতো সুন্দর ক'রে সাজিয়ে দিলেন তাঁর বড় আদরের ভাইয়ের বৌকে। ছোট পিসি বললেন, 'আমার সতী লক্ষ্মী চ'লে গেলো, ওরে টুকটুকে ক'রে আলতা দিয়ে দে, সিঁদুর লেপে দে, আর ওর বিয়ের বেনারসী খানা পরিয়ে দে।'

'লম্বা ঘন কালো চুল ছড়িয়ে রইলো বালিশে, সুন্দর মুখ চন্দনে কাজলে অপরূপ দেখালো। মনে হ'লো কি জানিস? এ তো তার মৃত্যু নয়, এ যেন বিয়ে। বিয়ের সময় তো ঠিক এমনিই দেখিয়েছিলো তাকে। তবে আর কান্না কিসের? দুঃখ কী? মৃন্ময় যেন কেমন আচ্ছন্নের মতো স্ত্রীর মুখের উপর মুখ নিচু করলো, তার বরফের মতো ঠাণ্ডা মরা ঠোঁটের স্পর্শে ছিটকে সে যেন সেই বিয়ের সময়কার উষ্ণতাই পেলো।

হাত ধ'রে কান্নাভরা গলায় বড়দি বললেন, 'আয়' উঠে আয় ভাই। বিদায় দে শান্ত মনে। কী আর করিবি?'

তারপরে অনেকক্ষণ সব ঝাপসা। মৃন্ময়ের অর্থহীন উদ্‌ভ্রান্ত চোখের সামনে দিয়ে সব কারা যেন ওকে ঘর থেকে বার ক'রে নিয়ে চ'লে গেলো। কোথায় নিলো? কেন নিলো? কিছুই সে বুঝে উঠতে পারলো না।

আত্মীয় বন্ধুরা দু' একদিন কাছে-কাছে রইলো, দিদি বৌদি অনেক সান্ত্বনা দিলেন তাকে, ছোটপিসি সংসারের অনিত্যতা সম্পর্কে একটা ছোট খাটো বক্তৃতা দিলেন, তারপর একদিন যে যার বাড়ি চ'লে গেলো তাকে ঐ নিঃশব্দ বাড়িটায় একলা রেখে। কী আর করবে বলো? তার নিজের কপালই না হয় ভেঙেছে, তাই ব'লে সকলে তো আর আপনার ঘর-সংসার ফেলে প'ড়ে থাকতে পারে না?

খাঁ খাঁ শুণ্য বিছানাটায় শুয়ে এইবার সে সত্যি সত্যি পরম দুঃখের সঙ্গে মুখোমুখি হ'লো। বালিশের নরমে মুখ ডুবিয়ে এতদিনে সে ফুঁপিয়ে উঠলো। এই তো চিনুর চুলের গন্ধ, রাগ ক'রে সে যে দু'দিন আগে কেঁদেছিলো এই তো সেই জলের স্পর্শ। তবে চিনু গেলো কেন? আর কোনো স্বামী-স্ত্রী কি ঝগড়া করে না? তাই ব'লে কে এমন অভিমানভরে চ'লে যায়?

বেশ তো। মৃন্ময়ের রাগটা না-হয় একটু বেশিই, সে না-হয় একটু অসহিষ্ণু মানুষই, একটু আড্ডাবাজও, কিন্তু তাই ব'লে এত বড় শাস্তি? আর রাগের মাথায় সে যদি বা কিছু ব'লে থাকে চিনুও কি কিছু বলেনি? বেশ বলেছে। খুব বলেছে। যথেষ্টই বলেছে। বাকি রেখেছে কী? অকৃতজ্ঞ বেইমান, নিষ্ঠুর, কপট—কী? কী না সে বলেছে তাকে? সমস্ত দিন সব কাজ তো আমার তোমার জন্যই—বেশ রূঢ় গলাতেই চিনু বলেছে একথা। আর তার উত্তরে সে যদি একটু চিৎকার ক'রে বলেই থাকে কী করো? কী করো তুমি? রাতদিন ব'সে ব'সে তো কেবল ঝি চাকরের উপর ফোঁপর দালালি আর সারা দুপুর প'ড়ে-প'ড়ে ঘুমোনো।'

কী এমন অন্যায়?

'ফোঁপরদাদালি?' অমনি ভারি হ'য়ে উঠলো চিনুর গলা, প্রায় বন্ধ হ'য়ে গেলো।

'নিশ্চয় ফোঁপরদালালি!' সমান গর্জনে মৃন্ময় বললো, 'দিই তো উঠিয়ে একদিন কাজের লোক, দেখবো তখন নাকের জলে আর চোখের জলে একাকার হও কিনা।'

'চাকর কি কোনোদিন চলে যান নি?' চিনুর গলা একেবারে ভেঙে খানখান—'বোমা পড়বার সময় কি একটা ঠিকে ঝিও ছিলো বাড়িতে? রোজ ইস্তিরি-করা জামা আর চকচকে পালিশ জুতো প'রে যখন আপিশ করেছ তখন কি একবারও ভেবেছ ধোপারাও পলাতক? আর এদিকে রান্না করা, বাসন মাজা, মশলা পেশা—সব কাজই কি—'

'ঐ তো, ঐ তো একটা শোনাবার মতো কথা পেয়েছো!' গোঁয়ার চিন্ময় খিঁচিয়ে উঠলো, 'ক'রে যদি এতই শোনাও তাহ'লে আর করার কোনো মানে থাকে না। বুঝলে?

তখন একটুখানি চুপ ক'রে রইলো চিনু। পরিষ্কার মাজা গলায় খানিক পরে বললো, 'তা হ'লে আমি তোমার ভার ছাড়া আর কিছু না? এই—এই তো বলতে চাও তুমি?'

মৃন্ময় ঠোঁট বাঁকালো—'যাও, যাও, ন্যাকামি কোরো না। স্ত্রীরা যে চিরকালই স্বামীর ভার ছাড়া আর কিছু নয় এ-কথা সবাই জানে।'

'তাহ'লে এই ভার দূর হ'লেই তুমি বাঁচো?'

ইচ্ছে করছিলো না, তবু রাগের মাথায়, জেদের বসে মৃন্ময় বললো, 'বাঁচিই তো। এইসব ঝামেলার জন্যেই তো আমি বিয়ে করতে চাইনি। মা তো শুনলেন না। ভাবলেন ছেলের না জানি কী একখানা হিত করছেন। যত সব—'

একথার পরে চিনু একবার চোখ তুলে তাকালো, তারপর একদম চুপ হ'য়ে গেলো।

কিন্তু বলো দেখি তোমরা, চিনু কি তার মুখের কথাটাই শুনতে পেলো? মনের কথাটা সে এই পাঁচ বছরের মধ্যেও জানতে পারলো না? সে কি একথাটা এতদিনে অনুভব করেনি যে মৃন্ময় যতই আস্ফালন করুক না কেন মুখে, চিনু ছাড়া তার জীবনে আর-কিছু নেই, কোনো আলো, আশা কিছু নেই? এদিকে তো মৃন্ময়ের একটু সর্দি হ'লেও তার উদ্বেগের অন্ত থাকে না, এই বাড়াবাড়ির জন্যে কত বকুনি খেতো, আর তাকে এখন এমন ক'রে পরিত্যাগ করতে চিনুর কি একটুও কষ্ট হ'লো না?

চোখের জলে সারারাত বালিশ ভেজালো মৃন্ময়। তারপর শেষ রাত্রির দিকে কখন ঘুমিয়ে পড়লো।

বেলায় ওঠা মৃন্ময়ের চিরকালের অভ্যেস। অথচ খুব বেশি বেলা হ'লেও মাথা ধরে। চিনু থাকতে নির্দিষ্ট সময়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিতো। চোখ খুললেই খড় রং গরম সুরভি চা এগিয়ে দিতো মাথার কাছে, আধা-সেদ্ধ ডিমের তরল অংশে নুন গোলমরিচ ছিটোতে-ছিটোতে বলতো, 'এ-অভ্যেস ছাড়ো। রোজ-রোজ কে তোমাকে ডেকে তুলবে, বলো তো?' প্রসন্ন হাসিতে মুখ ভ'রে যেতো মৃন্ময়ের। কথা না-ব'লে সে হাত বাড়িয়ে দিত চিনুর কোলের উপর আর সে-হাতের স্পর্শ চিনু তার উত্তাপ দিয়ে গ্রহণ ক'রে লজ্জা পেতো।

আজ কিন্তু যতক্ষণ খুশি ততক্ষণ মৃন্ময় ঘুমোলো। ঘুম যখন ভাঙালো কড়া রোদে সমস্ত বিছানা আগুনের মতো তেতে আছে। শরীরে যেন একশো-দশ ডিগ্রী জ্বর। লাফ দিয়ে উঠে বসলো সে। মুহূর্তে বিগড়ে গেলো মেজাজ। চা কই? ডিম কই? ডেকে দাওনি কেন? আর তারপরেই বুক ভেঙে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। সে তো নেই।

তখন আর কাকে কী বলবে, চুপচাপ বিছানা থেকে নেমে মুখ ধুতে এলো বাথরুমে। কল ঘুরিয়ে হাত পাতলো, জলও নেই কলে। ইলেকট্রিক পাম্পে সারাক্ষণই জল পাওয়া অভ্যেস, আজ এ কী হ'লো? অনর্থক কলটাকে আরো খানিকক্ষণ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সে বাইরে এলো। বসবার ঘর পেরিয়ে রান্নাঘরের দরজায় এসে রাগি গলায় ডাকলো, 'কেষ্ট।'

গনগন ক'রে উনুন জ্ব'লে যাচ্ছে, চায়ের জলের কেটলিটি বসানো, কিন্তু জল শুষে গিয়ে কেটলিটি বোধহয় ফাটো-ফাটো। দেয়ালে ঠেসান দিয়ে ঘুমুচ্ছে কেষ্ট। ধড়মড় ক'রে উঠে ব'সে বললো, 'আজ্ঞে।'

'কলে জল নেই কেন? আর চা কই?'

'চা?' চমকে উঠে তাড়াতাড়ি শুকনো কেটলিটা ধপ ক'রে নামালো মাটিতে, ভয়ে-ভয়ে মুখ তুলে বললো, 'এই—এই দিচ্ছি, বাবু।'

'কলে জল নেই কেন?' মৃন্ময় চোখ লাল ক'রে আবার বললো কথাটা।

মুখ কাঁচুমাচু ক'রে অস্ফুট গলায় কেষ্ট বললো, 'আজ্ঞে পাম্প ছাড়তে তো মনে ছিলো না।'

'ও, মনে করিয়ে দেবার জন্যে বুঝি আর একজন লোক চাই তোমার?

'আজ্ঞে মা থাকতে—'

'চুপ কর। কেটলি বসাবার জল পেয়েছো কোথায়?'

'কলসিতে কালকের জল ছেল—'

'ঐ কলসি থেকে এক ঘটি জল আমাকে বাথরুমে দিয়ে এসো।'

অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে কেষ্ট দৌড়ে এক ঘটি জল দিয়ে এলো বাথরুমে। কিন্তু ঘটিটার দিকে তাকিয়ে মৃন্ময়ের'আর মুখ ধোবার প্রবৃত্তি হ'লো না। চিরকাল ঘটিটার, সোনার মতো রং দেখে এসেছে সে, কিন্তু কেন দেখেছে সে-কথা আজই প্রথম মনে পড়লো। বাথরুমের চারদিকে একবার ঘুরে-ফিরে বেড়ালো তার চোখ। বলতে গেলে এ-ক'টাদিন তার এমন একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে কেটেছে যে কোনদিকেই দৃষ্টি দেবার মতো মনের বা শরীরের অবস্থা ছিলো না। কিন্তু আজ সচেতন হ'য়ে বাড়ি-ঘরের হাল দেখে তার হাত-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে এলো। সেই তো সব আছে, কেবল কয়েকদিন যাবৎ ঐ ছোট্ট একমুঠো একটা মানুষের ঠিকানা মুছে গেছে এখান থেকে, তাইতেই এমন হ'লো? যখন সে ছিলো তখন তো কই বুঝিনি! কোণের দিকের অপরিসর সিমেন্টের তাকটিতে দুটি টুথব্রাশ, টুথপেস্ট, নিকেলের ঝকঝকে সোপ-কেসে সাবান, কোনাচে ক'রে রাখা এক বোতল লক্ষ্মীবিলাস তেল, টুকিটাকি আরো দুটো জিনিস এমন সুন্দর ক'রে গুছিয়ে রাখা থাকতো—মনে পড়ে না মৃন্ময় একদিনও সে-জিনিষগুলোকে এদিক-ওদিক হ'তে দেখেছে। আজ সে হাত বাড়িয়ে ব্রাশটি পেলো না, পেস্টের টিউবটা মুখ-খোলা দেখে পিত্তি জ্বলে গেলো। অথচ কালও তো সে দাঁত মেজেছে। কিন্তু ব্রাশটা রাখলো কোথায়? তেলের বোতলটা গলা ভাঙা, গায়ে দেবার সাবান কেসসুদ্ধু উধাও।

সজোরে ঘটিটা ঠেলে দিয়ে মৃন্ময় ঘরে চ'লে এলো। ভেবেছিলো আজ আপিশে যাবে। ক'টা বাজলো? এনেক খোঁজাখুঁজির পরে টেবিলের উপরকার এতদিনের না-গুছোনো আবর্জনার স্তূপ থেকে বেরুলো ছোট হাত-ঘড়িটা। চাবির অভাবে নিশ্চল হয়ে আছে। কাগজপত্র ঘাটাঘাঁটি করে একবার টেবিলটা ঈষৎ ভদ্রস্থ করবার চেষ্টা করলো, তারপর

হতাশ গলায় ডাকল, 'কেষ্ট!'

'এই যে, বাবু!' অমনি এক কাপ চা হাতে ক'রে ঘরে ঢুকল কেষ্ট। পেয়ালার তলায় ছলকে এক গাদা চা পড়েছে, যা মৃন্ময় দুই চোখে দেখতে পারে না, আর মুখে দিয়েই কাপড়-কাচা জলের গন্ধে প্রায় শিহরিত।

সহসা মনে হ'লো বড় খিদে পেয়েছে। চিনুকে বিদায় দিয়ে এ ক'দিন তার খিদে তৃষ্ণা ছিলো না, কিন্তু প্রকৃতি নিষ্ঠুর, সব অবস্থাতেই তার সব চাহিদা সমান। তাকে মেটাতেই হবে তোমার। যেন মনের শোকের চেয়ে এখন তাই তার দেহের কষ্টটাই প্রবল হ'যে উঠলো। রেগে উঠে বললো, 'ইডিয়ট! এতকাল চা করতে দেখছো আর এখনো তুমি শিখতে পারলে না?'

'আজ্ঞে, মা থাকতে—

'চুপ, রাস্কেল!'

ভীতচকিত কেষ্ট তৎক্ষণাৎ চায়ের পেয়ালা নিয়ে অন্তর্হিত।

এবার শুষ্ক মুখে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে রইল মৃন্ময়। আপিশ তো দূরের কথা সাধারণ দুটি সেদ্ধভাত আর মাছের ঝোল রান্না হ'তেই বেলা দুটো বাজলো। কোথায় কাপড়, কোথায় জামা, কোথায় বা জুতো। সকাল থেকে বিছানা প'ড়ে আছে তেমনি। ঘরের ধুলো এক আঙুল পুরু।

সেই কুচকানো বাসি বিছানার একপ্রান্তে শুয়ে কপালে হাত রেখে মৃন্ময় ছাতের সীলিংয়ে তাকিয়ে রইল। সাতদিনের না-মাজা গ্লাশে জল খেয়ে আর গলা ভাতের মণ্ড গলাধঃকরণ ক'রে তার বমি-বমি করছিলো। একবার উঠে বসবার চেষ্টা করলো, পারলো না, মাথা যেন ছিঁড়ে পড়ছে। দু'বার কেষ্টকে ডাকতে চেষ্টা করলো, পারলো না, স্বরই বেরুল না গলা দিয়ে। এ কী হ'লো? কিছুতেই তো গলার স্বর ফুটছে না। দুটো হাত তুলে দিলো উপরের দিকে, হাত দুটোও উঠলো না। তবে? তবে কী হ'লো? হঠাৎ একটা কান্নার ঢেউ তার বুক গড়িয়ে গলা পর্যন্ত উঠে এলো, পরমুহূর্তেই মনে হ'লো চিনু এসে দাঁড়িয়েছে মাথার কাছে। পরিষ্কার গলায় সে বললো, 'আমি তো তোমার কিছুই করি না, একটা ভার মাত্র। চাকর বাকর তো রয়েইছে, তবে কেন—'

'চিনু, চিনু, আমাকে তুমি ক্ষমা করো। দয়া করো আমাকে।' মৃন্ময় পাগলের মতো দু'হাত বাড়িয়ে দিলো তার দিকে, গলা দিয়ে ঘড়ঘড় ক'রে অদ্ভুত একটা আওয়াজ বেরুলো শুধু।

*　　*　　*　　*

'এই, শুনছো কী হয়েছে? ও-রকম করছো কেন?' প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে ঘুম ছুটে গেলো মৃন্ময়ের। ধড়মড় ক'রে চোখ ঘষতে-ঘষতে উঠে ব'সে সে বিহ্বল চোখে চারদিকে তাকাতে লাগলো। ও মা, এই তো চিনু দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঝুঁকে রয়েছে মুখের কাছে।

পরিপাটি সুদৃশ্য ঘর, বেডকভারে ঢাকা পরিষ্কার বিছানা। বেলা পড়ে এসেছে, আমার কাছে ট্রে ভর্তি চায়ের সরঞ্জাম। তবে? তবে কী—

তাকে উঠে বসতে দেখেই চিনু ভারি মুখে সরে দাঁড়ালো। ব্যাপার বোধগম্য করতে একটু সময় লাগলো মৃন্ময়ের। পরমুহূর্তেই তার সকল হৃদয় মন যেন হাওয়ার মতো হালকা হয়ে গেলো। মনে পড়লো আজ রবিবার ভাত খেয়ে উঠে চিনুর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে অথবা তাকে অনেক কটু কথা ব'লে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। সত্যি, নিজের সামান্যতম অসুবিধে সইতে পারে না মৃন্ময়। অথচ তার আরামবিধানের পিছনে যে আর একটা মানুষের কতখানি মনোযোগ, যত্ন আর পরিশ্রম লুকোনো থাকে তা তো কই কখনো ভেবে দেখেনি। অনুতপ্ত হ'য়ে সে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামলো, আর তারপর ব্যাকুল আগ্রহে স্ত্রীকে টেনে নিয়ে এলো নিজের কাছে, আর তারপর ইত্যাদি, ইত্যাদি—'

হাসিমুখে টিপটপ গল্প শেষ করলো সমীর রায়।

প্রশান্ত মৃদু হাস্যে আন্দোলিত করলো মাথা। সিগারেট নেবাতে-নেবাতে বললো, 'ক্লেভার।'

বরুণ বললো, 'মিলনটা বেশ ভালোই হলো। কী বলো?'

পূর্ণেন্দু নাক কুঁচকে বললো, 'আরে দাম্পত্য কলহের ঐটেই তো সবচেয়ে মজার অংশ।'

'তা হ'লে আমার স্টকেও সেই সব কলহের দু'একটি নমুনা জমা আছে, কী বলো?' বরুণ উৎসুক চোখে হাসলো, 'বেকার ব'সে-বসে মন খারাপ করার চেয়ে তোমাদের গাঁজাখুরি ভালোবাসার গল্পগুলো নেহাৎ মন্দ লাগছে না দেখছি।'

সমীর রায় ঘাড় কাৎ করলো, 'হ্যাঁ—এ—এ। ভালো আরো লাগবে।'

এও জানি যে কাল সকালেই তুমি অন্য কথা বলবে।'

বরুণ কাঁধ ঝাঁকালো, হাসল ঠোঁট বেঁকিয়ে।

প্রশান্ত বললো, তাহ'লে পূর্ণেন্দু আরম্ভ করো।'

'আহা, ভাবতে দাও একটু।' পূর্ণেন্দু যেন অনেকদূরে চোখ পাঠিয়ে দিলো।

'এ আর ভাববে কী! যে-কোনো একদিনেরটা ব'লে দাও না।'

'আমি কি তোদের মতো আত্মজীবনী বলবো না কি? আমারটা হবে একেবারে খাঁটি গল্প।'

'আমরাই কি সত্য বলেছি ব'লে তোমার ধারণা?' প্রশান্ত হাসলো।

'দ্যাখো, অপর্ণাকে না-দেখলেও বাসন্তীকে দেখেছি, অতীনকে না-চিনলেও প্রশান্তকে তো চিনি? কর্নেল মুখার্জিও আমাদের অচেনা নন। একটু যা ওলোটপালট। তোমার বাবা ডাক্তার না হ'য়ে ডাক্তার তুমি নিজে, আর তুমি দিগ্বিজয়ী ইঞ্জিনিয়র না হয়ে ইঞ্জিনিয়র তোমার বাবা। এই তো তফাৎ? আর—সমীরের তো—'

সমীর রায় ব্যস্ত হয়ে ট্রেনের জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বললো, 'তোমাদের যত ব্যক্তিগত কথা টেনে আনার দোষ। সুন্দর গল্প শুনবে তা নয় কেবল হিজিবিজি। বলো, বলো—মনে হচ্ছে আমাদের পৌঁছবার সময় হ'য়ে এলো, আর বরুণকান্তিরও বেশ মৌতাত লেগেছে—'

'তা-ই মনে হচ্ছে তোমার?'

'মনে আবার হবে কী হে। সে তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'তা হলে দ্যাখো।'

'অনেক দেখেছি।'

'কী দেখেছো?'

'তোমার মতো সব ফষ্টিনষ্টি ঢংঢাং আরে আমিই তো বাপু মাসিমাকে আরো জোর দিয়েছি এই বিয়ের জন্য, বলেছি, কিচ্ছু শুনবেন না, তিন দিনে ঠিক হয়ে যাবে। ভুক্তভোগী তো? জানি তো সব!'

বরুণ গম্ভীর হলো।

প্রশান্ত বললো, 'ঠিক আছে সমীব যা হবার তা তো হবেই, এখন পূর্বের গল্পটা শোনা যাক।'

'তা শোনো। কিন্তু এই আজকে হ'লো গিয়ে তোমার সতেরোই বৈশাখ সন্ধ্যা সাতটা, এই ট্রেনে ব'সে আমিও বলে রাখলুম কয়েক দিনের মধ্যে আমাদের শ্রীমান বরুণকান্তিও ব'সে ব'সে এ সব গল্প ফাঁদবেন। বাজি রাখতে পারি।'

'কত টাকা?' বরুণ চোখে চোখ রাখলো।

সমীর রায় বললো, 'টাকা দিয়ে কী করবো, সকলের সামনে হার স্বীকার করবে নাক-কান মলে।'

'ঠিক আছে।'

'তা হ'লে তোমরা সব সাক্ষী থাকলে কিন্তু।'

'তা থাকলাম। কিন্তু পূর্ণেন্দু, তুমি গল্পটা বলো।'

পূর্ণেন্দু নিজের পিঠের দিকের জানালাটা টেনে তুলে দিয়ে হেলান দিলো, চশমার মোটা কাচ কোঁচার খুঁটে পরিষ্কার করতে করতে বললো, 'না'।

সমীর বললো, 'কী, না?'

'অর্থাৎ সত্যেন বললো, 'না।' সত্যেন মানে আমার গল্পের নায়ক।'

'ও, গল্প তুমি শুরু করে দিয়েছ?

প্রশান্ত মৃদু হাসলো—'আরম্ভটি ভালো।'

পূর্ণেন্দু বললো, 'হ্যাঁ।'

সমীর বললো, 'হ্যাঁ মানে?'

'হ্যাঁ মানে—সবিতা বললো—হ্যাঁ। মানে আমার গল্পের নায়িকা।'

'ও। বেশ, বেশ, বেশ। তারপর?'

'তারপর আবার না।'

'তারপর?'

'তারপর আবার হ্যাঁ।'

'তারপর?'

'না, না, না।'

'তারপর?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

আর তারপর?

'আর তারপর সত্যেন মানে আমার নায়ক মানে সবিতার নতুন বিয়ে করা স্বামী একটি সাংঘাতিক কর্ম করলো।'

'কী?'

'হাত থেকে প্রকাণ্ড মোটা ওয়ার অ্যাণ্ড পীস বইটা, যেটা সে সেই মুহূর্তে পড়ছিলো সেখানা ছুঁড়ে মারলো প্রচণ্ড জোরে।'

'ওরেব্ বাবা!'

'তা তাকটা নেহাৎ মন্দ হয়নি। প্রথমে সেটা সবিতার কপালে লেগে চশমাটা ছিটকে দিলো মেঝেতে—'

'ভাগ্যিশ চোখটা বেঁচেছে। তুমি দেখছি কম গোঁয়ার নও হে? পূর্ব বাংলা বুঝি?'

পূর্ণেন্দু হেসে বললো, 'আমি মানে? আমাকে তুমি পাচ্ছো কোথায় এই গল্পে?'

'পাচ্ছি না বুঝি?'

'না।'

'তুমি ছাড়া আর কার মেজাজ অত বেয়াড়া তবে?'

'গল্প গল্প। যদি শোনো তা হ'লে বলি, আর নয়তো—'

'বলো! বলো! আর ন্যাকামি করো না। চশমাটা তো ভাঙলো তারপর?'

'তারপর মাঝখানকার গোল টেবিলের উপরকার ফুলদানিটা উল্টে দিয়ে—'

'ঈশ্! সেটাও ভাঙলো?'

'হয়তো ভাঙলো হয়তো ভাঙলো না, মোটমাট সত্যেন দেখলো পরিষ্কার শুকনো জায়গাটা ফুলে জলে একাকার হয়ে গেলো, দামি কাশ্মিরী টেবিলক্লথ ভিজে একেবারে ন্যাতা। জলন্ত দৃষ্টিতে সবিতা তাকিয়ে থাকতে-থাকতে দাঁতে দাঁত পিষে বললো—ব্রুট!

নির্বিকার চিত্তে বইখানা তুলে নিয়ে আবার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে সত্যেন বললো—বীস্ট!'

'বাঃ, বাঃ। চমৎকার পেয়ারটি তো।'

'তা হ'লে বুঝতেই পারছো, আর একদণ্ড এ-বাড়িতে থাকা যায় না। অতএব সবিতা

হনহন ক'রে শোবার ঘরে এলো। তড়বড় ক'রে আলমারি খুলে যা পেলো সবক'টা টাকা হাতের মুঠোয় নিয়ে সোজা সত্যেনের নাকের উপর চাবিটা ছুঁড়ে দিয়ে দরজার ছিটকিনি খুলে বেরিয়ে গেলো রাস্তায়।'

'সাবাশ! কিন্তু এত ঝগড়া কী নিয়ে তাই তো বললে না।'

'কী আর! কিছুই না। নতুন বাড়িতে এসেছে ক'দিন আগে, ঘরের ব্যবস্থা নিয়ে ঝগড়া। সবিতা ভালো কথাই বলেছিলো। তার মত হ'লো এই যে এ-ঘরটায় যখন আলো হাওয়া বেশি, দক্ষিণটাও সামান্য খোলা, তখন এটা শোবার ঘর ক'রে ওটা বসবার ঘর করি।'

'ভালোই তো বলেছিলো।'

'হয়তো। কিন্তু সত্যেন ভুরু কুঁচকে বললো—কেন, বসার ঘরে আলো হওয়া থাকলে কি তোমাকে কামড়ায়?'

'তোমার সত্যেন লোকটা তো ভারি বেয়াড়া।'

'আরে সত্যেন কেন—' মোটা চশমার ফাঁকে পূর্ণেন্দু হাসলো, 'সত্যি বলতে আমরা পুরুষরা কিন্তু সবাই বেশ বেয়াড়া। বেয়ারাও।'

'দয়া করে রসিকতা করো না'। বরুণ হাসলো, 'আবার 'পান্' করছো।'

'ওটা থাক। তারপর কী হলো?'

'তারপর সবিতা বসলো—এ আবার কামড়ানো না কামড়ানোর কথা কী? যে-ঘরটা ভালো, মানুষে সেটাই শোবার ঘর করে। বিশেষত অসুবিধে নেই যখন।

তা হ'তে পারে, কিন্তু ঘাড় বেঁকিয়ে সত্যেন বললো, 'না। সবাই ভালো ঘরটাকেই বসবার ঘর করে।

সবিতা বললো, 'ওটা তো কিছু খারাপ নয়।'

সত্যেন বললো, 'এটার চেয়ে তো খারাপ।'

'আগের বাড়ির চাইতে ভালো।'

'আগের বাড়ির চাইতে ভালো দিয়ে আমি কী করবো? এ বাড়িতে এসেছি, এ বাড়ির ভালো মন্দই সব।'

তখন সবিতা জেদ করলো, 'আমি করবোই ওটা শোবার ঘর, দেখি তুমি কী করতে পারো।'

'কখনোই দেবো না, দেখি তুমি কেমন ক'রে পারো।'

'এটা কি তোমার বাড়ি?'

'তোমারও নয়।'

'নিশ্চয়ই আমার। বাড়ি মেয়েদেরই হয়, তারাই বাড়ির প্রাণ।'

'ঠিক বলেছে।' (এটা সমীরের মন্তব্য)

সত্যেন হাত থেকে সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো, 'ঈশ!'

'ভজুয়া!' সরু গলায় ছোকরা ভৃত্যটিকে ডাকলো সবিতা, 'এ কুর্সিউর্সি সব লে যাও

ঐ কামরামে।'

গর্জে উঠলো সত্যেন, 'হাত লাগাও মাৎ।'

ভজুয়া ভেকু-ভেকু চোখে একবার মাইজীর দিকে তাকালো, একবার বাবুজীর দিকে তাকালো। তারপর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

এবার ঠাণ্ডা গলায় তাকে বিদায় দিলো সবিতা।

এখানে বিদ্রূপে মুখ টিপে হাসলো বরুণ, 'কী, এতেও তোমাদের বোধহয় ঝামেলা মনে হয় না, না?'

পূর্ণেন্দু বললো 'ঝামেলা! ঝামেলার তুমি এখানেই দেখেছো কী?'

সমীর রায় বললো 'মেয়েটি, যাই বলো, ওয়ার্থলেস। অমন স্বামীটাকে ওঁর দু'ঘা মারা উচিত ছিলো।'

পূর্ণেন্দু তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়লো। মারেনি কি ছেড়ে দিয়েছে? তিনি তেমনি মেয়েই কিনা। মারার বাড়া হলো তারপরে।'

প্রশান্ত সহাস্যে বললো, 'ইণ্টারেসটিং।'

বরুণ পা নাচালো, 'বটে?'

সমীর বললো, 'এখানে তুমি মেয়েটার দোষ দেখছো কোথায়? হতচ্ছাড়া তো ঐ সত্যেনটা। আমি বলবো দোষ সবটাই ওর।'

পূর্ণেন্দু হাসলো, 'তা অবিশ্যি বলতে পারো। আমিও পরে ভেবে দেখেছি দোষটা বোধকরি সত্যেনেরই ছিলো। কেননা সমস্ত পরিশ্রমটা বলতে গেলে ওর স্ত্রীই করতো, অর্থাৎ সংসারের যতসব ঝক্কি আর কি। আর সত্যেন মোটামুটি বইয়ের পাতা উলটিয়ে স্বামীত্ব ফলাতো। এটা হয়তো অন্যায়ই।

বাড়ি বদলানো নিয়েও ওদের ঠিক এই একই ব্যাপার হয়েছিল। সত্যেন কিছুতেই বদলাবে না, সবিতা বদলাবেই। এদিকে না বদলালে ঠিক চলতোও না। কী বিশ্রী যে ছিলো আগের বাড়িটা তা আর কহতব্য নয়। একতলা, সারাদিন স্যাঁৎস্যাঁৎ করতো, একফোঁটা রোদ ছিলো না। অথচ ভাড়ার বেলা রামকিঙ্কর। খুঁজে-খুঁজে যখন এই সুন্দর ছিমছাম দোতলার ফ্ল্যাটটি আবিষ্কার করলো সবিতা, সত্যেন বললো, 'বাজে।' রাগ ধরে না? গা জ্বলে না? এই লোক নিয়ে মানুষ ঘর করতে পারে?—সবিতা ভুরু কুঁচকে তখন ভেবেছিলো মনে মনে। কে জানতো এমন একটা কাঠগোঁয়ারের সঙ্গে সে দুটি বছর প্রেম করেছে। তখন তো মনে হ'তো যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না। আসলে পাজি। দারুণ পাজি। একদম মিটমিটে শয়তান। বিয়ে করবার জন্য ভেক ধরেছিলো। এখন আর ভাবনা কী? কিন্তু ভুল ভেবেছে সত্যেন। সবিতাকে সে মোটেও বাংলার বধূ বুকে তার মধু পায় নি। সে ললিত লবঙ্গলতা ললনা নয় যে তিনি যা করবেন, যা বলবেন অমনি সে তা নেমে নেবে।

না, না, অত না।

'বেশ। বেশ। তারপর?'

'তারপর রাস্তায় এসে মন স্থির করতে বেশি সময় নিলো না সবিতা। সোজা যে ট্রাম পেলো সেই ট্রামেই চেপে বসলো।'

'গুড! তারপর।'

'গনগন করতে কবতে একজন নিরীহ ভদ্রলোকের পা মাড়িয়ে দিয়ে লাল মুখে 'সরি' বলে বসলো গিয়ে লেডিস সীটে।'

'তারপর?'

'তারপর চিন্তা করতে লাগলো এবার যায় কোথায়? দিদির বাড়ি গেলে তো লোকটা কাল সক্কাল না হ'তেই ঠিক হাজির হবে এসে। মাসিমাব বাড়িও চেনে, খুড়তুতো জা থাকেন হাজরা রোডে, সেখানে অসম্ভব। তাঁরা হাজারো প্রশ্নের ঠেলায় আমিই বুঝি পাগল হ'য়ে ফিরে আসবো। তাই এমন জায়গায় যেতে হবে যেখানে সত্যেন আর পাত্তাই পাবে না, আর আমিও ফিরে আসবো না। অবিশ্যি সত্যেন যে দেশে নেই আসলে তাব সে দেশে যাবারই লোভ হয়েছিলো মনের বিবাগে—কিন্তু আত্মহত্যা মহাপাপ, নরকে গমন। আর তাছাড়া এই একটা চণ্ডালের জন্য আত্মহত্যাই বা কে করবে কোন দুঃখে? ঈশ্‌। জীবন যেন তার জন্যেই বিকিয়ে রেখেছি আর কি!

'ঠিক!' (সমীরের উক্তি)

'অতএব সোজা ব্রিজ ছাড়িয়ে টালিগঞ্জে সুমিতার কাছে গিয়ে থাকাই স্থির করলো।'

'সে আবার কে?'

'সবিতার সঙ্গে একই আপিশে কাজ করছিলো, এক সঙ্গে পাশও করেছিলো দু'জনে। সুতরাং তার কাছেই একমাত্র মনের কথা বলতে পাবে। দুজনে ভাবও খুব। সেখানে আরো গুটি পাঁচ ছয় মেয়ে আছে। একসঙ্গে থাকে। মেসের মতো ক'রে নিয়েছে আর কি।'

'সবিতা বুঝি আবার কাজ করে?'

হ্যাঁ তারপর সবিতা ভাবলো, বেশ তো, আমিও সেখানে সেই মেসে খরচ দিয়ে থাকবো। বন্ধুদের সঙ্গি দিব্যি আরামে দিন কাটবে পায়ের উপর পা দিয়ে।

তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে, ট্রামের জানালা দিয়ে রাত-নামা ধূসর শহরের দিকে তাকিয়ে কেন জানি তবু বারে বারে ঢোঁক গিললো সবিতা। তবু বারে-বারে এদিক-ওদিক তাকালো। কিসের আশায় কে জানে।'

তারপর ভাবলো, সত্যি বুড়ো বয়সে বিয়ে করবার কি শাস্তি। কেন সে নিরুদ্বিগ্ন জীবনে আবার এই ঝামেলাটা বাধাতে গিয়েছিলো। এম. এ. পাস করে দিব্যি একখানা দামি চাকরি ক'রে হঠাৎ কেন তার এই দুর্মতি হ্লো? জীবনের তেইশটা বছরই যদি কাটাতে পারলো এই লোকটাকে ছাড়া বাকি ক'টা বছর কী আর কাটতো না নাকি? চমৎকার হেসে

খেলেই চলে যেতো দিন। সুমিতা আছে না? মঞ্জুশ্রী আছে না? অনিন্দিতা আছে না? মাঝখান থেকে তার এ বিকার উঠতে গেলো কেন?

আর তখন? ভুরু কুঁচকে মাত্র কিছু দিন আগের কথা মনে করলো সবিতা। তখন এই লোকটার কী-ই না আদিখ্যেতা। যেন সবিতাই তার ভূমণ্ডল। সবিতাই তার চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা। জীবন-মরণ। আহাহা, কী আমার প্রেমিকপ্রবর! শঠ। প্রবঞ্চক। প্রতারক। আসলে পুরুষগুলোই এ-রকম।

না, আর আমি তার মুখ দেখবো না। দেখতে চাই না। যেন আর কোনদিন দেখতেও না হয়।

না, না, দেখতে না হয় কেন? 'আবার তখুনি মনে মনে সে সংশোধন করলো। পরের ছেলে ভগবানের দয়ায় বেঁচে-বর্তে থাকুক, দীর্ঘজীবী হোক, আমার কী। নিজেরই অজান্তে বদ লোকটার জন্য ঈশ্বরের কাছে পরমায়ু ভিক্ষা করতে করতে কখন যেন ঝাপসা হ'য়ে উঠলো চোখ।'

'বাঃ। বেশ।' সমীর রায় হাঁটু চাপড়ালো এখানে।

'এদিকে সবিতা বেরুনো মাত্রই লাফিয়ে উঠলো সত্যেন।'

'কেন?'

'কেন আবার? বৌ চ'লে গেলো, আর সে বসে থাকবে?'

বরুণ বললো, 'এতই যদি পত্নীপ্রেম তবে বাবা ঝগড়া কেন?'

'তাই তো। শুধু তাই নাকি? সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হাতের বইটা নিজের কপালে তিনবার ঠুকলো? ব্যাথাও পেলো। সত্যি বলতে শারীরিক কষ্ট একেবারেই সইতে পারে না সে, তোমার মতোই আর কি।'

সমীর রায় হাসলো।

'আবার এদিকে আলস্যও প্রচুর। নিজের কাজটিতে যাওয়া—'

'কী করে রে?'

'ঐ কলেজে টলেজে পড়ায় আর কি। রাতদিন বই মুখে নিয়ে থাকে, আর কোনো বিষয়ে উদ্যমও নেই, উৎসাহও নেই। অথচ সুবিধের অভাব হলে সে অন্য মূর্তি।'

'যাক। নিজের বিশ্লেষণটি ভালোই দিয়েছিস।'

পূর্ণেন্দু হাসলো, চশমার কাচটা ঝলসে উঠলো মুহূর্তের জন্য, তারপর বললো, 'আসলে কী জানো, ঐ সত্যেন লোকটার তখন বেশ কষ্ট হতে আরম্ভ করলো বৌ'র জন্য। ভাবলো, সত্যি বলতে কী এমন অন্যায় কথা বলেছিলো সে? সত্যি তো—শোবার ঘরটাই সবচেয়ে ভালো হওয়া উচিত। সারারাত সেখানে শোওয়া, দিনের বেশির ভাগ সময়টা সেখানে থাকা, আর আলোর হাওয়ার অভাবে খুঁতখুতোনিটা তো তার নিজের দিক থেকেই সব বিষয়ে বেশি।

সবিতা খাটতে পারে, অল্প আয়ে চালাতে পারে, সুন্দরভাবে থাকতে পারে (যার একটাও সত্যেন পারে না। খাটাখাটনি তার ধাতে নেই, অপব্যয় সে সদা উৎসুক, সিগারেটের ছাই দিয়ে, এলোমেলো বই দিয়ে ঘর নোংরা করতেও তার জুড়ি নেই), অথচ কর্তালি করবার বেলায় সাত কাহন।

বউয়ের গুঁতো-খাওয়া কপালে হাত বুলিয়ে যেন সবিতার সব দুঃখই সে বুঝতে পারলো। আর অমনি মনে হ'লো সবিতাই যে এই ত্রিভুবনে সবচেয়ে সুন্দর আর সবচেয়ে গুণী মেয়ে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'

এইখানে বরুণ হো-হো ক'রে হেসে উঠলো, 'হাউ সিলি!'

সমীর বাঁ হাত বাতাসে সঞ্চালন করলো, 'আর হেসো না। বিয়ে করবে না করবে না ক'রে এখন তো সেই গোয়ালেই চলেছো, আবার বৌ নিয়ে যখন ফিরবে তখন কথা বোলো।'

'গল্পটি বেশ। ঝগড়াটি মনোরম। শেষটুকু নিশ্চয় আরো জমবে।'

সুশ্রীমুখে প্রসন্ন হাস্যে প্রায় উত্তর তিরিশ একজন ভদ্রলোক উল্টোদিকের আসন থেকে নিক্ষেপ করলেন কথা ক'টি। এতক্ষণ খেয়াল করেনি কেউ মানুষটিকে। কখন যে কোন ষ্টেশন থেকে তিনি উঠেছেন তাও কেউ জানে না। সবাই অবহিত হ'য়ে তাকালো তাঁর দিকে তারপর ঈষৎ অপ্রস্তুতের হাসি হাসলো। বিগলিত হ'য়ে পূর্ণেন্দু বললো', 'তা হলে গল্পটা শুনেছেন আপনি?'

'তা শুনছি। মন দিয়ে শুনছি। এ তো আমাদের সকলেরই জীবনচরিত। কেবল যা একটু রঙের তফাৎ।'

'বাঃ বাঃ। বেশ বলেছেন। বরুণ শুনছো তো?'

বরুণ সহাস্যে মাথা নাড়লো, 'শুনছি এবং বুঝতে পারছি তোমার গল্পই আমাদেব আজকের আসরেই শেষ গল্প নয়। আরো একখানা জমা হয়েছে।'

'নিশ্চয়ই।' সমীর রায় রুমালে মুখ মুছলো, 'এক যাত্রায় কি আর পৃথক ফল হয়?'

ভদ্রলোক হাসলেন, 'আমার সঞ্চয় অতি সামান্য, আপনাদের মতো অভিজ্ঞতার প্রসারও এখন পর্যন্ত খুব কম বিস্তৃত, কাজেই—'

'সেই কমটুকু পরিবেশন করলেই আমাদের কাজ আর একটু এগুবে মিষ্টার—'

'নন্দী। আমার নাম নির্মলকুমার নন্দী। কিন্তু পরিচয়ের আদান-প্রদান এই মুহূর্তে থাক, আপনি আপনার অতি সুন্দর দাম্পত্য-লীলাটি শেষ করুন।'

হেসে পূর্ণেন্দু আবার তার চশমার কাচটি মুছে সোজা হয়ে বসলো, আর শেষ মশাই, সত্যেনের, মানে সেই স্বামী নামক গর্দভচন্দ্রটির প্রাণ—আসলে ততক্ষণে রীতিমতো অস্থির হয়ে উঠেছে আর কি, মানে স্ত্রীর জন্য—'

'আজ্ঞে বুঝেছি।'

'কিন্তু ছুটে-ছুটে সে যখন রাস্তায় এসে পৌঁছলো হুশ ক'রে ছেড়ে দিলো ট্রামটা।

বুঝলেন! কেবল সবিতার শ্যামলা মুখটা একবার ভেসে উঠলো জানালায়। তার অনেকক্ষণের জন্যে সব ঝাউপাতা।'

'চমৎকার বর্ণনা। তারপর?'

তারপর সেই অন্ধকারে যে পাড়ায় এসে ট্রাম থেকে নামলো সবিতা সেখান থেকে সুমিতার মেসে যেতে বেশ খানিকটা হাঁটতে হয়। বাগের মাথায় এসেছে বটে, কিন্তু এ পাড়াটা তার তেমন সড়গড় ছিলো না। এই মেসে মাত্র একদিনই এসেছিলো সে, তাও সুমিতার সঙ্গে কোনো রোববারের দুপুরে। তখন কেমন নির্জন আর অন্ধকারে গা ছমছম করলো। আসলে পাড়াটাই ছমছমে। এখানকার রাত সন্ধ্যাতেই গভীর, এখানকার আকাশ ঢের বেশি কালো, তারারা অনেক উজ্জ্বল। আকাশের বিস্তৃতিটাও লক্ষ্য করবার যোগ্য। বাতাসটি ঠাণ্ডা, মধুর। অন্য সময় হ'লে কবিত্ব করা যেতো, কিন্তু এখন ভয় ভয় করলো। একদল বাবরি-ছাঁটা, জ্যাকেট আঁটা কাবুলি রাস্তায় ব'সে গব গব গবাস গবাস ক'রে কী কথা বলছে, তিনটে গেঞ্জিপরা, লুঙ্গিপরা লোক শিস দিয়ে গা ঘেঁসে চলে গেলো, একটা ফিটন গদাই লস্করি চালে পাশ দিয়ে যেতে-যেতে কোচম্যানটা গান ধরলো, 'বুকে ছোরা। মেরে পালিয়ে গেলে মেরি বিবিজান।' হাহা ক'রে কোথায় হাসল কারা বড় একটা বাদাম গাছ থেকে কিচির মিচির ক'রে উঠলো একদল পাখি। আর সব ছাপিয়ে নিজেব বুকের কাঁপুনিটাই বড় করে শুনতে পেলো সবিতা। সে থমকে দাঁড়ালো। পাশ ঘেঁষে রিকশা চলে গেলো টুংটাং করতে করতে। সাইকেল গেলো দুটি প্যাঁ-প্যাঁ হর্ন দিতে দিতে, সারা অঙ্গ নাচিয়ে লরি গেলো পকর-পকর, হুশ করে ট্যাক্সি চলে গেলো। সবিতার মনে হলো সবাই যেন যড়যন্ত্র করেছে আজ তার বিরুদ্ধে। সকলেরই যেন কী একটা কু-মতলব আছে আজ। মনে হ'লো এক দৌড়ে আবার ছুটে যায় ট্রামলাইনে, তারপর একেবারে সোজা নিজের বাড়িতে গিয়ে চুপ ক'রে বিছানায় ঘুম। আর নয়তো চট ক'রে ঢুকে পড়ে কোনো গৃহস্থের বাড়ি।

হঠাৎ অনুভব করলো পেছনে যেন কে তাকে অনুসরণ করছে। পিঠের শিরদাঁড়াটা অমনি খাড়া হয়ে উঠলো, খোঁপার তলায় ঘাড়ের কাছটা শির শির করে উঠলো ভয়ে।

লোকটাকে ডিভোর্স করবো আমি। এত ভয়ের মধ্যেও ভাবলো সবিতা। রেজিস্ট্রি ক'রে বিয়ে করেছি, অসুবিধে কী? আর অসুবিধে হলেও আমি ছাড়তুম না।'

'ঠিক।'

এখানে সমীর বললো, 'তা হ'লে মেয়েরা আজকাল একটু মানুষ হচ্ছে, কী বলো?'

পূর্ণেন্দু হাত দিয়ে তার কপালের উপরে এসে পড়া একগুচ্ছ চুল উপর দিকে তুলে দিয়ে বললো, 'কেনই বা হবে না। যে লোক স্ত্রীকে মারে সে আবার একটা মানুষ নাকি? কপালে হাত দিয়ে দেখলো সুপুরির মতো ফুলে গেছে সেখানটা। চশমাটা ভাঙলো না

কেন? তবে আরো ভালো হতো, জোরালো প্রমাণ দেওয়া যেত যে কী সাংঘাতিক মানুষের হাতে সে পড়েছে। এখুনি গিয়ে সব খুলে বলবে মেসের মেয়েদের। তারা সব্বাই সাক্ষী থাকবে কোর্টে। বড়দা তো আগেই বলেছিলেন, 'কী তুই পছন্দ করলি একটা? বই-পড়া পোকা। বিদ্বান না হাতি। এ রকম ঢের-ঢের দেখেছি। চেষ্টা করলে দু'চারটে পাস দিতে অমন সব্বাই পারে।' (বড়দা অবিশ্যি পারেন নি। তিনি দু'বার ফেল ক'রে ম্যাট্রিক পাস। তাই পড়াশুনোওলা লোকের প্রতি তাঁর বিষম রাগ!) আজকে কিন্তু সবিতার বড়দার কথাটা বেশ খাঁটি বলেই মনে হলো। মনে হ'লো তাঁর উপদেশটা বেশ সারগর্ভ ছিলো। সেজমামা রাগারাগি করেছিলেন বাড়ির অবস্থা নিতান্ত খারাপ ব'লে, আর জ্যাঠামশাই তো একেবারে টং। কথাই বন্ধ ক'রে দিলেন। তখন ভারি রাগ ধরেছিলো সবিতার। খুব দু'একখানা মুখের মতো জবাব দিতে ইচ্ছে করেছিলো প্রাণ খুলে। রীতিমতো একটা অসম্মান করবার লোভ হয়েছিলো এই সব ফোঁপরদালাল, স্বার্থপর গুরুজনদের। বলতে ইচ্ছে করেছিলো তেইশ বছর পূর্ণ ক'রে তো চব্বিশ বছর বয়স হ'লো, কই এতদিনে এর চেয়ে একটা ভালো পাত্র কি তোমরা জোগাড় করতে পেরেছো কখনো? যা দু'একখানা নমুনা এনেছো শ্মশান থেকে তুলে, তা দেখলে স্বয়ং যমও ভির্মি খাবেন। কী? না, নেই বাপ নেই, টাকা দেবার বেলায় কেউ নেই, তবে আর এর চেয়ে জুটবে কী? পড়িয়েছি শুনিয়েছি তাই না ঢের? তা সবিতারও বলতে ইচ্ছে করতো, বাবার লাইফ ইনসিওরের তিন হাজার টাকা গেলো কোথায়?

কপাল ঠুকে রক্ত বার করলেও এমন একজন তুখোড় ছেলে বার করতে পারতেন তাঁরা? (তুখোড় না হাতি, এক নম্বরের চালাক) আর সত্যেনের কী নেই? চেহারা? অমন সুন্দর বলিষ্ঠ যুবক তাঁরা ক'টা দেখেছেন বাংলা দেশে শুনি! (ইঃ। সুন্দর না আরো কিছু! তবু যদি রংখানা মেঘের মতো না হ'তো)। বুদ্ধিতে উজ্জ্বল চোখ দুটির দিকে তাকালে কোন মেয়ের না মাথা ঘোরে? (ঐ তো আছে শুধু। মেয়ে-ভুলোনো পাজিগুলোর তো ঐ সম্বল।) আর অবস্থা? কেন, সে কি পথের ভিখিরি? চাকরি নেই? (ওঃ, কী আমার চাকরেখানা রে। তবু যদি টিকিস-টিকিস ক'রে একটা ফোর্থরেট প্রাইভেট কলেজে না পড়াতো। তার আবার অত।) চরিত্র? এমন সৎ সজ্জন, দৃঢ়চেতা মানুষ তাঁরা ক'টা দেখেছেন জীবনে, ক'জনের সঙ্গে মিশেছেন? (আহাহা। কী আমার সতী রে। তবু যদি না বৌ কিলোতো।)

'শোনো।'

আস্তে একটু হাতের ছোঁয়ায় পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হ'য়ে উঠলো সবিতার। অন্ধকারে, এই জনহীন রাস্তাটার চারপাশে তাকিয়ে বুকের ভেতরকার যন্ত্রপাতি বন্ধ হয়ে গেলো এক মুহূর্তে। একটু থমকে থেকে হঠাৎ হন্‌হন্‌ ক'রে প্রায় ছুটতে লাগলো সে। পেছনকার পায়ের শব্দও রাস্তার নীরবতাকে চকিত করে আবার ধ'রে ফেললো তাকে। আবার সেই দুটি শব্দ, 'শোনো। এবার চাপা গলায় যেন আর্তনাদ ক'রে উঠলো

সবিতা—কে?'

'চ্যাচাও কেন? আমি।'

'তুমি।'

সবিতা নিমেষে ঘুরে দাঁড়ালো। ঘন অন্ধকারে চেহারা দেখা গেলো না। নাই বা গেলো তাই ব'লে বুঝতে দেরী হ'লো না একটু। ভয়-ডর অমনি কোথায় গেলো তার। হন্‌হন্‌ ক'রে এগিয়ে গেলো সামনের দিকে। এবার তার চেয়ে লম্বা পা ফেলে সত্যেন তার পাশাপাশি হ'লো। নির্বিকার গলায় বললো, 'রাস্তায় অত জোরে-জোরে হাঁটাটা আমি পছন্দ করি না। ওটা শালীনতা নয়।'

রাগে ব্রহ্মতালু জ্ব'লে গেলো সবিতার, জবাব দিলে না।

সত্যেন বললো, 'আর তার উপর এত রাত্রে, এই নির্জন রাস্তায়। বেশ তো। কোথায় যাবে বলো না, আমি এখুনি তোমাকে গাড়ি ক'রে সেখানে পৌঁছে দেবো।'

'তুমি কি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করতে এসেছো?'

আগুন হ'য়ে থামলো সবিতা।

সত্যোন পকেট থেকে দেশলাই বার ক'রে সিগারেট ধরাতে গিয়ে সেই আলোয় স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো, তারপর লম্বা একটা টান দিয়ে বললো, 'ছি, ছি, তা কখনো পারি?'

'পারো না তো যাও।'

'কোথায় যাবো?'

'দ্যাখো, রাস্তায় দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে আমি বচসা করতে চাই না। আমার পথ ছাড়ো।'

'ঠিক বলেছো। আমারও বিশ্রী লাগে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে। আর তার মধ্যে এই রাত ক'রে, শরতের হিমে দাঁড়িয়ে—'

সবিতার ইচ্ছে করলো ঠাশ্‌ ক'রে একটা চড় মারে গালে। ফাজিল।

পাশ দিয়ে লোক চ'লে গেলো একজন। অন্ধকারে দুটি স্ত্রী-পুরুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হয়তো সন্দিগ্ধ হ'লো একটু, ফিরে ফিরে তাকালো যেতে যেতে সবিতা বললো, 'তুমি যদি এই মুহূর্তে চ'লে না যাও আমি চ্যাঁচাবো।'

'আমি মুখ চেপে ধরবো।'

'ভেবো না কলকাতার রাস্তার তুমিই মালিক। আরো লোকজন আছে শহরে। আইন আছে, আদালত আছে। একজন স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দেওয়া অত সহজ নয়।'

'উঁহু। মোটেই নয়। কিন্তু কী জানো? স্ত্রীর গায়ে হাত দিলে কেউ কিচ্ছুটি বলবে না।'

'স্ত্রী। কে তোমার স্ত্রী?'

দারুণ একখানা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো সত্যেন। বললো, 'যে হতভাগিনীর আমি স্বামী।'

'কোনো হতভাগিনীর তুমি স্বামী নও। তুমি যাও।'

'তবে ভৃত্য।'

'আমি চেঁচিয়ে লোক জড়ো করলে কি খুব ভালো হবে?'

একমুখ সিগারেটের ধোঁয়ায় সবিতাকে আচ্ছন্ন ক'রে সত্যেন বললো, 'আমি তোমাকে পাঁজাকোলা ক'রে নিয়ে ট্যাক্সিতে চাপালেই কি খুব ভালো হবে?'

সবিতা তিন হাত ছিটকে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললো. 'ট্যাক্সি এই তল্লাটে নেই সে আশা দুরাশা।'

'না, এ তল্লাটে তো নিশ্চয়ই নেই। কিন্তু আমাব সঙ্গে তো আছে।'

'তোমার সঙ্গে?'

'একটু তাকিয়ে দ্যাখো না ওদিকে।'

'তুমি কি ট্যাক্সি করে এসেছো?'

'উপায কি?'

'মানে?'

'ট্রাম তো আর আমার জন্য অপেক্ষা করলো না? তুমিও না।

'তোমার জন্য আমি কেন অপেক্ষা করবো?'

'তবে আর আমি ট্যাক্সি ছাড়া কেমন করে আসবো?'

'তা মন্দ লাগছিলো না। নিজেব স্ত্রীকে অনুসরণ করাতেও বেশ রোমাঞ্চ আছে দেখছি।'

'আর তোমার এটা খেয়াল নেই এটা মাসের শেষ?'

'আর তোমার এটা খেয়াল নেই তাতে তোমার কিছু এসে যায় না?'

'তবে কার এসে যায় শুনি? কী দিয়ে কী হয় জানে কেউ? বোঝে কেউ? বাবুগিরিখানা তো ওদিকে সাড়ে-ষোলো আনার জায়গায আঠারো আনা। এটা চাই, ওটা চাই, সেটা হয়নি কেন—'

'না, তবু তোমার কিছু এসে যায় না আজ।'

'তবে কার এসে যায়?'

'যার সংসার, তার।'

'সংসারটা কার?'

'সংসার যে ত্যাগ কবে তার অন্তত নিশ্চয়ই নয়। কী বলো?'

'ও।' অপ্রস্তুত হ'য়ে গেলো সবিতা। সত্যিই তো মাসের শেষ হোক আর প্রথম হোক তাতে তার কী! কালকের বাজার চলুক বা না চলুক তার তো মাথা-ব্যাথার দরকার নেই। সে তো চলেই এসেছে ও-বাড়ি থেকে। স্বামীকে ত্যাগ করবে সংকল্প ক'রেই এসেছে। কিন্তু তবু খচখচ করে বুকটা। একটু চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ বলে, 'টাকা পেলে কোথায়?'

'আমি কি টাকা নিয়ে এসেছি?'

'ট্যাক্সি ভাড়া দেবে কী দিয়ে?'

'তার আমি কী জানি?'

'তবে জানে কে?'

'খরচ তো তোমার জন্যেই হ'লো, তুমি জানো।'

'আমি আর ফিরে যাবো না।'

'তাহলে আমিও থাকি।'

'তুমি! তুমি কোথায় থাকবে?'

'তুমি কোথায় থাকবে?'

'সে আমার ঠিক আছে।'

'আমারও ঠিক আছে।'

হঠাৎ সবিতার মনে হ'লো. লোকটা বাড়িঘর সব খুলে-টুলে রেখে চ'লে আসেনি তো? চকিত হ'য়ে বললে, 'আলমারির চাবি নিয়ে এসেছো?'

'চাবি আমি কোথায় পাবো?'

মানে?

'মানে, বাড়িটি চোরদের সুবিধের জন্য একটু ফাঁকা রেখে চ'লে এসেছি। চাবিটি তুমি যেখানে ফেলেছো সেখানেই প'ড়ে আছে।'

'কী সব্বোনাশ'।

'বুদ্ধি থাকলে আমাদের ভজুয়া বাবাজিও সুবিধেটুকু নিতে পারেন।'

'কী কাণ্ড। অ্যাঁ! বাড়ি-ঘর সব খোলা? নিমেষে রাগ-টাগ ভুলে সবিতা প্রায় কাঁদে আর কি। 'যাবে, সব যাবে। গয়নাগাঁটি, কাপড়-চোপড়, বই-পত্র—ছি, ছি, ছি। এমন একটা অপদার্থ লোকের সঙ্গে দেখা হবার আগে আমার মৃত্যুই তো ভালো ছিলো।'

'সেটা খুব সত্যি কথা। কিন্তু ট্যাক্সির ওয়েটিং চার্জ কি আর খুব বেশি বাড়ানো উচিত?'

'নির্বোধ! মুর্খ! ইডিয়ট!' দাপাতে-দাপাতে সবিতা দু' পা পিছিয়ে উঠলো গিয়ে ট্যাক্সিতে।

আর খানিক পরে, গাড়ির অন্ধকারে স্ত্রীর কাঁধের উপর হাত রাখল সত্যেন, আস্তে ডাকলো, 'সবু। সোনা।'

সবিতা একটু স'রে গেলো ওধারে।

'এখনো রাগ?'

চুপ।

'বইটাতে কি খুব লেগেছিলো?'

চুপ।

'শোনো,' এবার হাতের উপর হাত—'রাগ কোরো না। তুমি তো জানো আমি কত অযোগ্য—'

চুপ।

সবিতার হাতখানা তুলে এবার সত্যেন নিজের কপালে ছোঁয়ালো, 'দ্যাখো তো প্রতিশোধটা ঠিক হয়েছে কিনা। তারপর তুমি আমাকে যত খুশি শাস্তি দাও।'

ঈশ্! ভেতরে-ভেতরে প্রায় আঁতকে উঠলো সবিতা। ও-রকম ক'রে আবার কপাল ফোলালে কী ক'রে, প'ড়ে-ট'ড়ে গিয়েছিলে নাকি? মুহূর্তে সব ভুলে গভীর মমতায় হাত বুলোলো—'এ কী! কী হয়েছে?'

'সামান্য প্রায়শ্চিত্ত।'

'প্রায়শ্চিত্ত!'

'বইটা ঠুকে দেখলাম, সত্যি তোমাকে অবুঝের মতো কতটা ব্যাথা দিয়েছি।'

'তুমি কি আমাকে পাগল ক'রে দেবে? তুমি একটা কী? কী বলো তো?'

একটু আগে যে-লোকটার উপর সবিতার বিতৃষ্ণার অন্ত ছিলো না, রাগের অবধি ছিলো না, তারই দু'খানা হাতে মুখ ঢেকে তেইশ-পূর্ণ চব্বিশ বছরের মেয়ে, শ্রীমতী সবিতা দেবী এম. এ, সওয়া-দু'শো টাকা মাইনের চাকুরে, ঠিক তেরো বছরের কিশোরীর মতোই আত্মসমর্পণের কান্নায় ভেঙে পড়লো।

'বলতে বাধ্য হচ্ছি,' ঠোঁট বেঁকিয়ে মুচকি হাসলো বরুণ, 'আমার মা'র উকিল হ'য়েই তোমরা তিনজনে এইসব গল্প আজ আগে থেকে সাজিয়ে এসেছো। বিবাহিত জীবনের জয়গান করাই তোমাদের উদ্দেশ্য ছিলো। তা ভালো, সময় তো কাটলো! 'এবার আপনিও—' ভদ্রলোকের দিকে তাকালো সে।

পূর্ণেন্দু খিঁচিয়ে উঠলো, 'তবে উনি আর কেমন ক'রে বলবেন, উনি তো আমাদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে গল্প সাজিয়ে আসেন নি।' প্রশান্ত পাইপের ধোঁয়া বুকের ভেতরে নিতে নিতে কাশলো, তারপর মৃদু হেসে মাথা নেড়ে বরুণের দিকে তাকিয়ে আস্তে বললো, 'হেরে গেছো।'

'মানে?' রীতিমতো ভ্রূকুটি করলো বরুণ।

'মানে, এ গল্প তোমাকে নেশা ধরিয়েছে—'

'মানে তুমি একটি আস্ত জলহস্তী। জীবনের সূক্ষ্মতার ধার ধারো না।' প্রশান্তকে কথা শেষ করতে না দিয়েই সমীর রায় কোঁচা নাড়া দিলো, 'সেতার নামক একটি যে যন্ত্র তৈরি হয়েছে জগতে জানো তো সে কথা?'

সমীরের রাগে কৌতুক বোধ করলো বরুণ, হেসে বললো, 'বেশ তো, বক্তব্যটা বলে যাও না।'

'বক্তব্য হচ্ছে অতগুলো যে তার বাঁধা আছে তাতে ঐ সব ক'টা তারই বিছানা বাঁধা

দড়ি হ'য়ে যেতে পারতো যদি না তাতে ঝংকার তুলবার জন্য মিজরাব নামক আঙুলে ধারণ করবার তারের অঙ্কুশটির জন্ম হতো।'

একথায় একসঙ্গে হেসে উঠলো সবাই। ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন,'ঠিক। ঠিক বলেছেন। মেয়েরা অনেক সময়ে ঐ মিজরাবের পার্টটি ক'রে থাকেন পুরুষের জীবনে।

হেসে বরুণ বললো, 'আগেই বলেছি, আপনি আমার এই তিনটি বন্ধুরই সমধর্মী। তবে আর সময় নষ্ট ক'রে লাভ নেই, আপনার মিজরাবের গল্পটিও শুনে ফেলি এই ফাঁকে।' ভদ্রলোকের মুখে যুবক-সুলভ লজ্জা ছড়ানো, নরম গলায় বললেন, 'আমার অবিশ্যি নিজের কোনো গল্প নেই—'

'বা রে, আমরাই কি আমাদের নিজেদের গল্প বললাম নাকি এতক্ষণ?'

প্রশান্ত এবং সমীরের দিকে পলকপাত করলেন ভদ্রলোক, 'যে-গল্পটি আমি এইমাত্র শুনলুম, মনে হচ্ছে তার আগে আরো দুটি গল্প আপনারা দু'জনে বলেছেন এবং আমি তা মিস করেছি। নেহাৎ দুর্ভাগ্য। কিন্তু এর পরে আমাকে যদি বলতে বলেন, সে-গল্প দুটি না শুনলেও আমি বলতে পারি এতক্ষণকার সুরে বাঁধা এই একটানা একখানা উপন্যাসের আস্বাদ থেকে আপনারা বঞ্চিত হবেন।'

'কেন?'

'আমার গল্পে কোন দাম্পত্যখবর নেই। ঐ যে বললেন মিজরাব, শুধুমাত্র তাই।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ ঐ সেতারের মতোই একটা মানুষের ভেতরে কতকগুলো অচেতন স্নায়ু কোনো একদিন এক পলকে বেজে উঠেছিলো।'

'বেশ। বেশ। তারপর?'

'আসলে গল্পটা হলো এইঃ একটি ছেলে ছিলো। ছেলেটি এমনিতে বেশ। ন্যাকা, বোকা বা আহাম্মক এ সব আখ্যা তাকে মোটেই দেওয়া যায় না, অথচ কোথায় যে তার কী অভাব কে জানে, কোনো কাজে কর্মে একেবারে মন ছিলো না।'

'বুঝেছি, তারপর বিয়ে করা মাত্রই একেবারে সোনার কাঠির স্পর্শে ঘুমন্ত রাজকন্যা জেগে উঠলেন, না?' বরুণ শব্দ করে হাসলো।

পূর্ণেন্দু তার বোতলের মতো মোটা কাচওয়ালা চশমার ভেতরে দুই চোখের আগুনে ভস্ম করলো তাকে, এলোমেলো চুলে ঝাঁকি দিয়ে বললো, হ্যাঁ, তাই। কী করতে পারো?'

ভদ্রলোক নরম ক'রে হাসলেন, 'না, একেবারে ঠিক তা-ই নয়,মানে ব্যাপারটা হ'লো কি অবন্তীর, পয়সা রোজগারের দিকে একেবারেই মন ছিলো না, উপরন্তু ঘুমটি ছিলো সাধা আর না ঘুমোলেও অবিরত শুয়ে থাকার দক্ষতা প্রায় প্রদর্শনযোগ্য।'

'চমৎকার।'

'অথচ ছাত্রজীবনে আর পাঁচটা ছেলের মতোই লেখাপড়া করেছে, আড্ডা দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে, পাস-টাশও করেছে কায়ক্লেশে কিন্তু সংসারে ঢুকে যে সে কেন অমন

সকলের অধম হ'য়ে নিরুদ্বেগে শুয়ে ব'সে বাপের পয়সায় ভাত খেতে লাগলো সেটাই আশ্চর্য।'

'চেহারাটা কেমন বলুন তো?' সমীর রায় ভদ্রলোকের মুখের উপর তার তীব্র দৃষ্টি স্থাপন করলো। ভদ্রলোক বললেন, 'চেহারার বর্ণনা দিয়ে লাভ নেই, স্বভাবের সঙ্গে মিল ছিলো না। কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমিয়ে, ইঁদুরের মতো সারাদিন কুটকুট এটা ওটা খেয়ে, কচ্ছপের গতিতে চলাফেরা ক'রেও দেহটি তার ঋজু ছিলো, হাতের পেশি চ্যাপ্টা ছিলো, মুখের কাঠামোতে দৃঢ়তা ছিলো।'

'তার মানে আপনার চেহারার সঙ্গে বেশ মিল ছিলো।'

'কি যে বলেন। আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধই নেই কোনো।'

অসহিষ্ণু পূর্ণেন্দু রেগে গেলো এবার, দ্যাখো বরুণ, তুমি যদি কেবল বক বক করবে তা হ'লে তাই করো, আমি বই পড়ি। আর নয়তো চুপ ক'রে গল্পটা শুনতে দাও।'

'ঠিক আছে, প্রশান্ত হাসলো, 'আপনি বলুন।'

'বলবার অবিশ্যি খুব বেশি কিছু নেই,' ভদ্রলোক স্মিতহাস্যে ন'ড়ে-চ'ড়ে গুছিয়ে বসলেন, 'বয়স তখন নেহাৎ কমও নয় ছেলেটির। দায়িত্বজ্ঞান না থাকার মতো অপরাধ করবার সময় তার অনেকদিন অতিক্রান্ত। বি, এ, পাস ক'রে ব'সে আছে প্রায় চার বছরের উপর।'

'ও, বি. এ-টা তাহ'লে পাস করেছিলো? তবে আর কি? কেরানিগিরি তো বাঁধাই ছিলো।'

'বাঁধা অনেক কিছুই ছিলো। কিন্তু সেই বন্ধন সে মানলে তো এই গল্পটাই আর জন্মাতো না।' মাথার পাতলা চুলে ভদ্রলোক হাত বুলোলেন, 'তার কারণ তার বাবা আনন্দবাবু এগ্রিকালচার ফার্মে বেশ ভালো কাজ করতেন, সততার জন্যে সুনাম ছিলো, ভালো কাজের জন্য খ্যাতি ছিলো, স্বভাবের জন্য প্রিয় ছিলেন সকলের কাছে। ডিরেক্টার হেস্টার সাহেবের প্রায় ডান হাত বাঁ হাত। সর্বদাই সে 'বাবু বাবু করতো, বাবু ছাড়া তার কোনো কাজ চলতো না। সেই সুবাদে আনন্দবাবু হেস্টরের অনেক সহায়তা পেয়েছিলেন। বেশ ভালো ভালো জায়গায় দু'বার কাজ জোগাড় ক'রে দিয়েছিলেন ছেলের, কিন্তু একটিও সে রাখতে পারেনি। কয়েকদিন পরেই ছেড়ে দিয়ে দিব্যি ঘরে এসে কান-কাটা সেপাই হ'য়ে বসেছে। মা তো ছেলের স্বভাব জানেন? সকালের চা খেয়ে আবার বিছানাতেই গড়াতে দেখলে হুতাশে তাঁর দুই চোখ কপালে উঠেছে।

তাড়া দিয়ে বলেছেন, 'ওকি, এক ঘুম দিয়ে উঠে আবার বিছানাতে কী? ওঠ, ওঠ, বেলা কি কম হ'লো? আপিস যাবি না?'

পাশ ফিরে অবন্তী আরো একটু নিবিড় ক'রে শুয়ে একখানা বই উল্টোতে-উল্টোতে বলেছে, যাবো যাবো, অস্থির কেন এত?'

ছেলের মতলবখানা বুঝতে পেরে মা'র-কান্না আসে। নরমে-গরমে গায়ে মাথায় হাত

বুলোন কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা, ছেলে আর বিছানা ছেড়ে উঠে আপিস যায় না।'

'বাঃ বাঃ সাবাশ।'

'সাবাশই বটে।' হাসলেন ভদ্রলোক, 'নৈলে গঞ্জনা তো বড়ো কম চলতো না? মা-বাপের মনস্তাপ, আত্মীয়দের গায়ে পড়া উপদেশ, সমবয়সীদের টিটকিরি, অতিথি অভ্যাগত, প্রতিবেশী পরিজনের করুণা নিক্ষেপ—কিছুই তাকে বিচলিত করতে পারেনি। কেউ তাকে এতটুকু প্রেরণা জোগাতে পারেনি যাতে ক'রে মনোযোগ দিয়ে সে একটা কাজে লাগতে পারে।'

বরুণ হাসলো, 'বুঝেছি। শেষে নিরুপায় হ'য়ে বাপ মা পাঁচজনের পরামর্শে একখানা বিবাহৌষধি প্রয়োগ করলেন, আর তক্ষুনি—' সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণেন্দু তার বাঁ হতের উল্টোপিঠ শূন্যে ঝাপটালো, 'আবারো সেই বাজে কথাটা বলছো?'

ভদ্রলোক হাসলেন, 'আসলে কী জানেন? আলস্যই ছিল তার প্রধান শত্রু। বাড়ি ব'সে থাকতেই তার কেবল ভালো লাগে। অমন স্বাস্থ্যবান আস্ত একটা জলজ্যান্ত যুবক যে কী ক'রে ওরকম শুয়ে ব'সে দিন কাটাতে পারতো সে কথা ভাবতে এখন তো আমার রীতিমতো অবাক লাগে।'

'কী করতো সারাদিন?'

'কী আবার! এই ছোটদের সঙ্গে একটু দুষ্টুমি, বড়দের সঙ্গে দুটো ফাজলেমি, মা'র সঙ্গে খুনসুটি—এই করতে পারলেই ব্যস।

আনন্দবাবুর একেবারে চক্ষুশূল হয়ে উঠল এই ছেলে। তাতে কী। ছেলেও পারতপক্ষে বাপের সঙ্গে চোখাচোখি করে না। অসুবিধে তো নেই কিছু? সকালবেলা তার যখন ঘুম ভাঙে আনন্দবাবুর তখন বাজার করা সারা, আপিশের তাড়ায় দৌড়ে স্নানে যান, স্নান ক'রে পোশাক চড়াতে চড়াতেই ভাত নিয়ে ব'সে থাকেন অবন্তীর মা, দুটি নাকে মুখে গুঁজে পানের ডিবেটি নিয়ে সাড়ে ন'টাতেই তিনি ছোটেন রোজগারের ধান্দায়। কাজেই সকালের দিকে তো বাপের সঙ্গে দেখা হবার কথাই ওঠে না। আর বিকেলেও এদিক-ওদিক ক'রে শান্তিতেই কেটে যায়। কেবল মুখোমুখি বসতে হয় রাত্তিরের খাবার আসনে।

মাঝে মাঝে মা অতিষ্ঠ হ'য়ে বলেন, 'বিধবা মেয়ের মতো আর কতকাল তুই ঘাড়ে ব'সে খাবি বলতে পারিস? তোর কি একটু লজ্জাও হয় না?'

'নাও চুপ করো।' ছেলে সে সব কথা গায়েই মাখে না মা রেগে উঠে বলেন চুপ আবার করবো কী? আমার হয়েছে মরণ। বলবার বেলা তোকে তো আর কেউ বলবে না, সে সাহসটুকুও নেই, কেবল উঠতে বসতে আমাকেই খোঁটা দেওয়া—'

'কেউ মানে আনন্দবাবু। অবন্তী সেটা জানে। তবু ভুরু কুঁচকে বলে, কে তোমাকে খোঁটা দেয় বলতো মা—' হাত টাত গুটিয়ে এমন ভঙ্গী করে যেন সে এখুনি সেই শত্রুটিকে নিধন না ক'রে ছাড়বে না, পরক্ষণেই ছোট ছেলের মতো হাত রাখে মা'র কাঁধে, গলায় মধু ঢেলে বলে; 'মা, রাগ করেছো?

অবন্তীর মা'র মুখের বেদনা আর বিরক্তির সব রেখাগুলো মুছে যায় ঐটুকুতেই, তবু গাম্ভীর্য বজায় রেখে তিনি কাঁধ থেকে সবেগে ছেলের হাতটি সরিয়ে দিয়ে বলেন, 'সর, ঢং ভালো লাগে না।' অবন্তী নির্লজ্জের মতো হাসতে থাকে।

এদিকে সবাইর যখন দশটার মধ্যে খেয়ে-দেয়ে আপিশে যাবার তাড়া লাগবে, অবন্তীরও খিদে পাবে সেই সময়ে। ভাতের নয়, দ্বিতীয় দফা চায়ের খিদে। ঘুরঘুর করবে মায়ের পিছনে-পিছনে, 'মা, লক্ষ্মীটি—'

'মা মুখে যতই রাগ দেখান, যতই বুরু কুঁচকে 'না হবে না' বলে হটিয়ে দেন কিন্তু একটু পরেই এদিক ওদিক তাকিয়ে ফাঁক বুঝে হাজির হন গিয়ে রান্নাঘরে, খোসামোদ করেন ঠাকুরকে। 'দে বাবা যদু, কড়াটা নামিয়ে এট্টু ফুটিয়ে দে জলটুকু।' এই উপার্জন অক্ষম নিষ্কর্মা দাদাবাবুটির জন্য যদু আপিশ স্কুলের রান্না কামাই করতে নারাজ হয়। পুরোনো লোক, লজ্জাও কম, ভয়ও কম, রীতিমতো মুখ ঝুলিয়ে ভার গলায় বলে, 'এমন করলে তো মা আপিশের রান্না সেরে ওঠা যায় না।' মা তক্ষুনি একেবারে সংকোচে এতটুকু হ'য়ে যান। ব্যস্ত হ'য়ে বলেন, 'তাই তো। সে তো ঠিকই কথা। থাক বাবা থাক।' জলের কেটলিটি হাতে এবার নিয়ে গিয়ে বিধবা ননদের দরজায় দাঁড়ান। কী করবেন। তাঁর ছেলের যে খিদে পেয়েছে। শুয়েই থাক আর ব'সেই থাক তাই ব'লে খিদে পাবে না এমন তো কোনো কথা নেই। লেপে পুঁছে এইমাত্র চাকর আগুন দিয়ে দিয়েছে তাঁর উনুনে, প্রথম আঁচটা একেবারে গনগন করছে টকটকে হ'য়ে। রান্না তখনো চাপেনি, অবন্তীর মা জানেন চাপতে দেরিও আছে ঢের। এখন আরো পঁচিশ মিনিট মালা জপ করবেন তিনি। একটু দাঁড়িয়ে থেকে বলেন, 'এখানে কেটলিটি বসিয়ে দিই দিদি?'

'আবার চা?' চোখের তারা তিনি ঊর্ধ্বে ওঠান, 'ঐ ক'রে ক'রেই তুমি ছেলেটার মাথা খেয়েছো বৌ। আনন্দ বললে রাগ করো বটে, কিন্তু কথা সে খাঁটিই বলে। মা হ'য়ে তুমিই ওকে নষ্ট করছো, শত্রুর কাজ করছো।' এ-কথায় অবন্তীর মা একটু উষ্ণ হন। যেখানে ঘা ঠিক সেই খানেই ব্যাথাটি লাগে তাঁর। উঠতে-বসতে ঐ তো ওঁদের এক কথা। কত আর ভালো লাগে? যতই অধম হোক, অর্কমা হোক, তাঁর তো সন্তান? এঁদের কাছে তার মূল্য যতই ছোট হোক তাঁর স্নেহে সে-কথা মানবে কেন? ধপ ক'রে কেটলিটা মাটিতে ফেলে রেখে নিজের অসন্তুষ্টি জ্ঞাপন ক'রে তিনি সোজা ছেলের মুখোমুখি দাঁড়ান, 'সতেরোবার যে তোর পেটে খিদে লাগবে, কে কে জোগাবে শুনি?' করবার কিছু নেই, হাতের কাছে যে-বই পেয়েছে তাই নিয়েই হয়তো নাড়াচাড়া করছিলো অবন্তী, মা'র অতর্কিত আক্রমণে মুখ ফিরিয়ে ব্যাপারটা আঁচ ক'রে নেয়, তার পর সহাস্যে বলে, 'কী হ'লো?'

'কী আর হবে। চার-চারটে বছর ঢেঁকির দুলাল হ'য়ে বাপের উপর ব'সে খাচ্ছিস, তোকে কি ঈশ্বর একটু চক্ষুলজ্জাও দেননি?' অবন্তী একেবারে গাছ থেকে পড়ে, 'ওমা, সে কী কথা। বাপের উপর ব'সে খাবো না তো পরের উপর খাবো নাকি? এ দেখছি আচ্ছা ব্যাপার—'

মা'র নরম গলা চ'ড়ে ওঠে. কেন? নিজের হাত পা নেই? বিদ্যে বুদ্ধি তো সবই আছে, নিজে ক'রে খেতে কী হয়? নিত্যি-নিত্যি পরের খোঁটা?'

বাধা দিয়ে অবন্তী বলে, 'বুঝেছি। বুড়িটার কর্ম। ও-বুড়িই আমাকে খেলে। না, এই বুড়োবুড়িদের যন্ত্রণায় আর সুখ রইলো না।'

মা এবার সত্যি রেগে যান. 'দ্যাখ অবন্তী. গুরুজনদের ওরকম যা-তা বলবি নে আমার সামনে। ব'সে থেকে-থেকে মান্য-মাননাও কি গুলে খেয়েছিস?'

ইতিমধ্যে পিসিমা হাঁক দেন নিচে থেকে. 'ও বৌ. জল ফুটে শুকিয়ে গেল—বলি কেটলিটা এসে নামাবে না আমি রান্নাবান্না না ক'রে উনুনে জল ঢেলে ব'সে থাকবো?' খরগোশের মতো কান খাড়া হ'য়ে ওঠে অবন্তীর, 'যাও মা. যাও। লক্ষ্মী তো। পিসিমা ডাকছেন। সকালবেলা তোমার সঙ্গে যতসব বাজে ব'কে-ব'কে আমার গলা একেবারে শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে, শিগ্‌গির চা দাও।'

মা যেতে-যেতে ক্রন্দনবিজড়িত গলায় বলেন, 'আমার মরণ হ'লেই বাঁচি।'

এর পরে অবন্তী যেন কত পরিশ্রম করেছে এই ভাবে ধপাস ক'রে বিছানায় শুয়ে অপেক্ষমান অবস্থায় বিশ্রাম করতে থাকে। পরিত্যক্ত বইটা হাতে তুলে নিয়ে আবার চোখ বুলোয়। আর তার একটু পরেই মা তাঁর দুমদাম রাগ-রাগ পায়ের শব্দে পৃথিবীর বিরক্তি আর অভিযোগ ঢালতে-ঢালতে ধোঁয়া-ওঠা সোনা রং এক পেয়ালা চা, ছোট প্লেটে ক'রে খানিকটা গরম হালুয়া আর খান কয়েক লুচি নিয়ে ঘরে ঢোকেন। এই লুচি হালুয়া তৈরী হয়েছে যারা স্কুল আপিশে যাবে তাদের টিফিনের জন্য। অবন্তীর টিফিন নেই, অতএব তার ভাগেরটা মা তাকে এই সময় এনে দেন। ঠকাস ক'রে প্লেটটা কাপটা সামনে ফেলে দিয়ে বললেন, 'নাও, খাও। আমাকে উদ্ধার করো।'

অবন্তী খুশিভরা চোখে তাকায়। হঠাৎ সারা গায়ে যেন মা'র অপরিসীম স্নেহের স্পর্শ পেয়ে অভিভূত হ'য়ে ওঠে, কিছু বলতে পারে না, কেবল তাঁর শ্যামলা রঙের সিঁদুর মুখের দিকে ছোট ছেলের মতো নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকে।'

এখানে ভদ্রলোক থামলেন, একটু, একটু ভাবলেন। কে জানে সেই মা'র কথাই ভাবলেন কিনা, বরুণ উৎসুক হ'য়ে বললো, 'তারপর?'

সমীর বললো, 'এটা আপনার কত বছর আগের ঘটনা বলছেন আপনি?'

'আমার নয়।' মৃদু হেসে ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, 'এটা গল্প।' সমীর রায়ও হাসলো, 'তাই তো।' পূর্ণেন্দু কখন নিজের আসন ছেড়ে এপাশে এসে বসেছে, ভুরু কুঁচকে বললো, 'কলকাতায় আপনি কোন্ পাড়ায় থাকেন?'

'আলাপ আলোচনা পরে করবেন পূর্ণেন্দুবাবু।' প্রশান্ত বাইরের দিকে তাকলো, 'আমাদের গন্তব্য কিন্তু আর মাত্র দুটোই স্টেশন। গল্প শেষ করতে হ'লে—'

'কিছুকাল পরে, ভদ্রলোক সহাস্যে আবার তাঁর কথার খেই ধরলেন, 'গঞ্জনার চাপেই

হোক অথবা যে মাকে সে অত ভালোবাসে কিংবা যে মা তাকে অত ভালোবাসেন তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েই হোক, কিংবা এই নিষ্ক্রিয় জীবনে নিজেই অতিষ্ঠ হ'য়ে হোক, হঠাৎ একদিন ছেলেটি তার বাবার কাছে গিয়ে মাথা নিচু ক'রে দাঁড়ালো। পিতাপুত্রে বাক্যালাপ বলতে গেলে নেই-ই একরকম, আর বাক্যালাপ কেন, তাদের চোখাচোখিও হয় না কখনো। সহসা সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অবনত পুত্রটির দিকে তাকিয়ে ভীষণ অবাক হলেন আনন্দবাবু। কেমন যেন একটু অস্বস্তিই বোধ করলেন। উশ্ খুশ ক'রে বললেন, 'কিছু বলবে নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'বলো।'

ভূমিকা করলো না অবন্তী, বললো, 'আমি একটা ছাপা-কাপড়ের দোকান দেবো ঠিক করেছি।'

আনন্দবাবু প্রায় চমকে উঠে ন'ড়ে বসলেন, চশমাটা তাড়াতাড়ি খুলে সাদা চোখে একবার দেখে নিলেন ছেলেকে, তারপর বললেন, 'হঠাৎ?'

'আমার এক বন্ধু খুব ভালো রঙের কাজ আর ছাপার কাজ জানে।'

'ও।'

'সে আমার সঙ্গে কাজ করতে চায়।'

'ও।'

'তাছাড়া আরো দু'জন আছে, তার মধ্যে একজন অনেকদিন মিলে কাজ করেছে, জানাশুনা আছে অনেক। সে বলেছে—কাপড়-চোপড়ের জোগান দিতে পারবে সে।'

'তা তো বেশ।'

'তাই আমরা ভাবছি একই সঙ্গে ছাপার কাজ আর ছাপানো শাড়ি, কিছু মিলের শাড়ি আর তাঁতের শাড়ি এ-সব দিয়ে ছোট একটা দোকান খুলি, তারপর আস্তে-আস্তে কিছু ফ্যান্সি জিনিস রাখবো—এই যেমন চায়ের সেট, রঙিন বেতের মোড়া, কার্পেটের টুকরো—'

ছেলের কথা শুনতে-শুনতে আনন্দবাবু যেন এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলেন, এবার আত্মস্থ হলেন। যথোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, 'কত টাকা লাগবে তা কি তোমার ধারণা আছে?'

'হ্যাঁ সে-হিসেব আমরা করেছি।'

'তা তো করেছো, কিন্তু তোমার বাবা যে একজন সামান্য কেরানি মাত্র সে-কথাটা আশা করি ভুলে যাওনি?' কথাটাতে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে মুখে বললেন বটে কিন্তু মনে-মনে ছেলের এই আগ্রহে বেশ প্রসন্নভাব এলো।

মাথা তেমনিই নিচু রেখে বিনীত গলায় অবন্তী বললো, 'জানি। কিন্তু আমরা চারজন আছি. আমি যদি অন্তত হাজার খানেকও দিতে পারি, তা হ'লেও—'

'এক হাজার টাকা!' আনন্দবাবু চোখ বড় করলেন, 'তুমি জেনে রাখো, তোমাদের চাপে এত বড় দীর্ঘ জীবনে সেটুকু সঞ্চয়ও আমি ক'রে উঠতে পারিনি। কষ্টেসৃষ্টে হয়তো পাঁচশো কি ছ'শো—তাও সন্দেহ। একটু সময় চুপ ক'রে থেকে গলার স্বর বদ্‌লে হতাশ ভাবে মাথা নাড়লেন, 'কিছু নেই অবন্তী, কিছু নেই। তোমাকে বকি, দুটো মন্দ কথা বলি, তুমি মনে করো আমি তোমার শত্রু। কিন্তু পেনসন নিলে যে কী ক'রে এতবড় সংসারটি আমি চালাবো, সে-কথা ভাবলে ঘাম ছোটে। তুমি আমার একমাত্র ভরসা, তুমি আশা দিলেই আমি শেষ জীবনটা শান্তিতে কাটাতে পারি।'

বাবার কথার সুরে অবন্তীর মনটা কেমন ক'রে উঠলো, বাবার জন্য সত্যি সে এভাবে কোনোদিন অনুভব করেনি। কিছু বললো না, চুপ ক'রেই দাঁড়িয়ে রইলো।

কয়েক মুহূর্ত দু'জনেই চুপ।

কুর্মিটোলার ট্রেন চ'লে গেলো হুসহুস্ শব্দে বাড়ির পিছন দিয়ে, বাড়িটা যেন ঝড়ের দোলায় কেঁপে উঠলো ক্ষণিকের জন্য। ছ্যাকরা ঘোড়ার গাড়ি গেলো টক-টক শব্দে, দূরে ঢাকার একমাত্র সিনেমাঘর পিক্‌চার হাউসের ইংরিজি কর্ড ভেসে এলো বাতাসে, সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পাওযা গেলো কার। যেন ঘুম ভেঙে কথা বললেন আনন্দবাবু, 'ও, দাঁড়িয়ে আছো? তা বেশ, মনে থাকবে তোমার কথা। যদি ধার-টার পাওয়া যায় কোথাও দেখবো।'

নিঃশব্দ পায়ে অবন্তী চ'লে গেলো আর আনন্দবাবু সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁর প্রিয় পুরোনো ইজিচেয়ারটিতে হেলান দিয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলেন, 'কী করা যায়।' কিছুদিন থেকে তাঁর নিজেরও মনে হচ্ছিলো এটার তো কিছু হ'লো না, একটা দোকান-টোকান দিয়ে দিলে কেমন হয়। ব্যবসা সম্বন্ধে আনন্দবাবুর দারুণ মোহ। অল্প বয়স থেকে অনেকবার ও-কর্ম করে তিনি চুপে-চুপে বহু অর্থ নষ্ট করেছেন, অনেক বড় বড় প্ল্যান ফেঁদে বিশ্বকর্মার পুত্রকে ছুঁচো বানিয়ে ছেড়েছেন। কার পাল্লায় প'ড়ে এই কয়েকবছর আগেও এক সাবানের কারখানার ফাঁদে প্রায় ছ'সাতশো টাকার দেনায় প'ড়ে গিয়েছিলেন। তাই এবার নিজেকে নায়ক না বানিয়ে মনকে ছেলের উন্নতিসাধনের যুক্তি দেখিয়ে প্রায় রাজি করিয়ে এনেছিলেন ব্যাপারটাতে। ভেবেছিলেন আপিশ-ফেরতা তো বাড়িতে ব'সেই কাটাই, না হয় ঐ দোকানে গিয়েই বসবো। হিসেব নিকেশও নিজেই রাখবো, আর ঐ অপদার্থ পুত্ররত্নটিরও হয়তো গতি হবে কিছু। হঠাৎ নিজের নিঃশব্দ চিন্তাধারাটি যখন সশব্দে ছেলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, ছেলের কাছে যতই টাকা নেই বলুন বা রাগের ভাব দেখান মনের মধ্যে একটা আশার ঢেউও বয়ে গেলো। একটা যেন দৈবের ইঙ্গিত পেলেন। কিন্তু টাকাটার কী করা যায়, সেটাই সমস্যা। সত্যি তিনি রিক্তহস্ত। সঞ্চয় তো দূরের কথা, মাসের শেষে প্রত্যেকবার মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে হয়, কী করি! একমাত্র উপায় প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড। সেখান থেকে অবিশ্যি তুলে আনা যায়। কতবারই তো তুলেছেন

সংসারের জন্য। আবার না-হয় একবার তুললেন। এ ছাড়া তো আর কিছু উপায় ভাবতে পারছেন না তিনি। ভাবতে-ভাবতে ক্লান্ত শরীরে দক্ষিণের বারান্দার ইজিচেয়ারের আরামে কখন জানি তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছিলেন একটু, স্ত্রীর আগমনে সচকিত হ'য়ে ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলেন। গলা পরিষ্কার ক'রে অন্যদিকে তাকিয়েই ঈষৎ বিদ্রূপ মেশানো স্বরে বললেন, 'তোমার পুত্র যে এবার বাংলায় ফোর্ডসাহেব হচ্ছেন, সে-খবরটি জানো বোধ হয়?'

অবন্তীর মা একবার স্বামীর দিকে তাকিয়ে হাতের সুপুরির ডালা আর জাঁতি নিয়ে নিঃশব্দে মেঝেতে বসলেন দেয়ালে ঠেস দিয়ে।

আনন্দবাবু একটু চুপ ক'রে থেকে ঘাড় ফেরালেন এবার, 'তিনি বোধ হয় মনে করেন যে তাঁর বাপের কাছে সব লাট-বেলাটের ধনরত্ন গচ্ছিত আছে, কেবল একটু চাইলেই হয়।'

পুত্র-সংপ্রদতি বাপ নিত্যই করছেন, উঠতে-বসতে তার খোঁটা, এবারেও অবন্তীর মা কোনো জবাব না দিয়ে সুপুরি কাটতেই মনোযোগী থাকলেন।

'শুনতে পাচ্ছো?' সোজাসুজি ডাকলেন আনন্দবাবু।

এবার দ্রুত জাঁতি সঞ্চালন করতে-করতে অবন্তীর মা অস্ফুটে জবাব দিলেন, 'অনেক তো শুনেছি।'

'কী শুনেছো?'

'যা রোজ শুনি। ছেলে তো একা আমারই কিনা।'

'রোজ-রোজই আমি এ স-ব বলি, না? আমি কিনা তার শত্রু।'

অবন্তীর মা আবার চুপ ক'রে রইলেন।

আনন্দবাবু ফেটে প'ড়ে বললেন, 'তিনি ব্যবসা করবেন। কী রে আমার ব্যবসাদার। ব্যবসা তো করলেই হ'লো কিনা। টাকা আর লাগে না। আয়াসে খায় মজিদে ঘুমোয় আর আঠারো মাসে বছর যায়। তার আর ভাবনা কী? বাপই তো আছে সাত চোরের এক চোর, দেবেই সে। কেন রে, বাপু, দিতে কি আমি বাধ্য?'

স্ত্রীর কাছে আনন্দবাবুর একেবারে অন্যমূর্তি।

উত্তরে শান্তভাবে স্ত্রী বললেন, 'বেশ তো, দিও না।'

'তারপর তো তিনদিনেই আবার উড়িয়ে-পুড়িয়ে ঘরে এসে বসবেন বাবু, যে-কে সেই।'

'মিছিমিছি চ্যাঁচামেচি ক'রে লাভ কী? বললাম তো দিও না। ফুরিয়ে গেলো।'

'ফুরিয়ে গেলো? ফুরিয়ে অমনিই যায়, না? তোমার আর কী! তুমি তো বলেই খালাস। তারপর? তারপর যে অপদার্থটা ব'সে ব'সে খাবে কেবল, তার বেলা?'

তা হ'লে দাও।'

আনন্দবাবু খিঁচিয়ে উঠলেন, 'দাও! দাও বললেই দেওয়া যায় কিনা? কোথা থেকে দেবো শুনি? কত কষ্টে কত দুঃখে আমি তোমাদের এই গুষ্টির প্রতিপালন করি খোঁজ

রাখো তার? তোমার তো ছেলের পক্ষে কথা বলতে পারলেই হ'লো।'

এবার উত্তপ্ত হ'য়ে উঠলেন অবন্তীর মা, হাতের জাঁতিটা ঠক ক'রে ফেলে রেখে উঁচুগলায় বললেন, 'আমাকে তবে কী করতে বলো তুমি? আমি কি ছেলেকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবো? না মা হ'য়ে খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেবো? দিন আর রাত চোখাচোখি হ'লেই এই খিটিমিটি আর আমার সয় না। থাকো তুমি তোমার সংসার নিয়ে, আমি এক্ষুণি বেরিয়ে যাবো এ-বাড়ির থেকে।'

মুহূর্তে আনন্দবাবুর কণ্ঠস্বর একেবারে কোমল নিখাদে নেমে এলো। ঢোক গিলে বললেন, 'আহা, রাগ করো কেন? কী বললাম আমি?'

'কী বললে আর বললে না তা-ই কি তুমি কখনো খেয়াল ক'রে দ্যাখো? বলবার ভাগ ব'লে যাও।'

'আমি যে কত দুঃখে বলি—' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন আনন্দবাবু, 'দুটো মেয়ে বিয়ের যুগ্যি, ছোট ছেলেটাকে পড়াতে হচ্ছে, অবন্তীকে কত কষ্টে বি.এ. পাস করালাম, তার উপর দিদি আছেন।'

'তাই ব'লে অহোরাত্র আমাকেই কি গঞ্জনা সইতে হবে? সব-কিছুর জন্য কি শুধু আমিই দায়ী?' অন্ধকারে ভদ্রমহিলার চোখ ঝাপসা হ'য়ে উঠলো। এবার আনন্দবাবুর গলাও কোমল হ'য়ে গেলো। ভগ্নকণ্ঠে বললেন, 'কাকে আর বলবো বলো। এই তো মাইনে পাই, চারটি ছেলেমেয়ে, বিধবা বোন, বাপের ঋণ, কোন দিকে সামলাই বলতে পারো? আমি একা-একা যেন আর কূলকিনারা দেখি না। ও যদি বুঝতো—' আনন্দবাবু সামনে বড়ো আমগাছটার ঘন পল্লবের নিবিড়ে চোখ ডুবিয়ে চুপ করলেন। একটু পরে আবার বললেন, 'এর খোশামোদ ক'রে, ওর খোশামোদ ক'রে, এ-দরজা ও-দরজা ঘুরে কত কষ্টে দু-দু'বার চাকরি যোগাড় ক'রে দিলাম, আর ও কিনা তিনদিন না যেতেই সে-সব চাকরি ছেড়ে এসে কানকাটা সেপাই হ'য়ে বাড়িতে বসলো। সে-বার ওকে পুনা পাঠাতে তিনশো টাকা ধার করেছিলাম, আজ পর্যন্ত তা শোধ দিয়ে উঠতে পারলাম না।'

আমি কি তা জানি না? না কি সে দুঃখ আমারও কারো থেকে কিছু কম?' ব্যথিত গলায় বললেন অবন্তীর মা, 'কিন্তু তা নিয়ে রাতদিন কেবল আমাকে ভাজা-ভাজা করলেই কি কোনো কিনারা হবে?'

'জানি হবে না। তবু মনের অশান্তি এভাবেই লাঘব করি।' আড়মোড়া ভেঙে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন আনন্দবাবু।

শেষ পর্যন্ত সত্যি ব্যবসা খুললো অবন্তী। অন্যান্য তিন বন্ধু তিন হাজার আর সে নিজে এক হাজার। আরো কুড়িয়ে-কাচিয়ে এদিক-ওদিক ক'রে এক হাজার যোগাড় হ'লো। সব মিলিয়ে পাঁচ হাজার টাকা সম্বল ক'রে রাসবিহারী এভিনিউতে দক্ষিণ ফুটপাথে চমৎকার ঝক্‌ঝকে নাতিদীর্ঘ একটি ঘর ভাড়া নিলো তারা। যার-যার ঘর থেকে কিছু আর কিছু

বাকিতে সুন্দর-সুন্দর ছোট আর হালকা নতুন ধরনের ফার্নিচারও তৈরি করিয়ে নিলো। তারপর অদম্য উৎসাহে সাজিয়ে ফেললো সেই ঘর। সুন্দর হ'লো। দেখলেই ঢুকতে ইচ্ছে করে আর দক্ষিণমুখো ব'লে এত হাওয়া দেয় যে ঢুকলেও আর সহজে বেরুতে ইচ্ছে করে না। ঝকঝকে ক'রে মোছা বিলিতি কাচের বেঁটে আর লম্বাটে শো-কেশ ধরনের এক নতুন কায়দার আলমারি চারদিকের দেওয়াল ভরে রইলো। মাঝখানে কালো মেহগনি বার্নিশের ক্যাবিনেট ভর্তি সুদৃশ্য চায়ের সেট, মেয়ের নকল গয়না, নেপানি ব্রোচ, আখরোট কাঠের বাক্স—চারপাশে নিচু-নিচু গদি-আঁটা কালো চেয়ার বসবার জন্য। আসলে চার বন্ধু মিলে মাথা খাটিয়ে তাদের সাজাবার ভঙ্গিতে ঘরটিকে এমন মনোরম ক'রে তুললো যাতে সত্যি একটা আমন্ত্রণ আছে, আহ্বান আছে। নানা ধরনের সুন্দর সুন্দর পাড়-সম্বলিত রংবেরঙের শাড়ি সেই সাজানো ঘরকে জমকালো করলো। যুদ্ধ তখনো আসলরূপে দেখা দেয়নি, সাজ-সাজ রব উঠেছে চারিদিকে। থমথম করছে সারা পৃথিবী। ব্যবসায়ীরা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষমান। ঠিক এমনি সময় গোড়াপত্তন হ'লো এই দোকানের।

চার বন্ধুর মধ্যে দু'জন অবন্তীর চেয়ে বয়সেও অনেক বড়, অভিজ্ঞও যথেষ্ট আরেকজন অবন্তীর বয়সী। আসলে সে-ই অবন্তীর বন্ধু। উড়িষ্যানিবাসী। সেই ছেলেটিই ছাপার কাজে ওস্তাদ ছিলো, রং বিষয়ে আশ্চর্য জ্ঞান ছিলো। একসঙ্গে একবছরেই পাস করেছিলো তারা। অবন্তী বি.এ. আর তার বন্ধু বি.এস-সি.। অবন্তী যতদিন ব'সে রইলো ঘরে সে ততদিনে প্রিন্টিং টেক্‌নোলজিতে ডিপ্লোমা নিয়ে পাকা হ'য়ে বেরুলো। মহাসমারোহে একদিন উদ্বোধন হ'য়ে গেলো দোকানের। প্রচুর খাওয়া-দাওয়া আনন্দ উৎসব ক'রে খুললো তারা দোকানের দরজা। আনন্দবাবুও নিয়ন্ত্রণে বাদ পড়লেন না। লালপাড় নতুন তাঁতের শাড়ি প'রে হাসি-হাসি মুখে অবন্তীর মা-ও জলযোগ ক'রে গেলেন রাত্তিরে এসে।

দোকানের নাম হ'লো অপরূপা। নাম নিয়েও অবন্তীরা কম মাথা ঘামালো না। শেষে অবন্তীই বার করলো এই নাম। অবন্তীর 'অ', পরেশের 'প', রূপেন্দ্রর 'রূ', পার্বতীচরণের 'পা'। পরেশ আর পার্বতীই এদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ বুদ্ধিদাতা। তারা পিঠ চাপড়ালো অবন্তীর। কিন্তু নামেই শুধু অপরূপা হ'লে তো হয় না? অপরূপও তো কিছু করতে হয়। পার্বতীচরণ বললো, 'বুঝলি, মেয়েরা আজকাল সব গতানুগতিক শাড়ি জামা আর পছন্দ করছে না, নতুন-নতুন ডিজাইনের জিনিস আনাবার ব্যবস্থা কর।'

রূপেন্দ্র একটু ইতস্তত ক'রে বললো, 'আমাদের দেশের কটকি শাড়িগুলো কিন্তু বেশ, এখানে তো এখনো তেমন চলন হয়নি, সে-সব আনালে কেমন হয়?'

অবন্তী উৎসাহিত হ'য়ে বললো, 'ঠিক বলেছিস, শান্তিনিকেতনে গিয়ে তো সেবার তোদের দেশে নকল শাড়ি তৈরি করতেই দেখলুম। বিশ্বভারতীর দোকানে কী ভিড় দেখিস না?' পরেশ বললো, 'সে তো খুবই ভালো কথা, কিন্তু দাম বেশি প'ড়ে যাবে না

তো?'

'না, না, বেশি আর কী পড়বে? বরং অন্যান্য ডিলারদের চাইতে আমি অনেক সস্তায় আনতে পারবো। শুধু শাড়ি কেন, গ্রামের ভেতরে গিয়ে গিয়ে আমি তাদের হাতের কাজের আরো অনেক সব সুন্দর-সুন্দর জিনিসও আনতে পারবো।' রূপেন্দ্র যেন প্রায় তক্ষুণি যায় এইভাবে দাঁড়িয়ে উঠলো। অনুমোদন করতে দেরি হ'লো না কারো। তারপর দিন-ক্ষণ দেখে মহা উৎসাহে রূপেন্দ্র গেলো উড়িষ্যার গ্রামাঞ্চলে, আর পার্বতীর দেশ যেহেতু সিলেটে, তাই সে গেলো আসামের গ্রামে। দোকানের চার্জে রইলো অবন্তী আর পরেশ। অবিশ্যি পরেশ শহরের নানা জায়গায় ঘোরে, সংগ্রহ করে, স্টক করে, দোকানে বসে অবন্তীই একা।

ক'দিন অবন্তীর যেন নাওয়া-খাওয়া জ্ঞান রইলো না। সেই সাজানো দোকান, দোকানের নতুন গন্ধ, দক্ষিণের হাওয়া, এই তাকে অহোরাত্র টানে। কত রকমের মেয়ে, কত ধরনের কত বয়সের কত সব ছেলে-ছোকরা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, বিশেষ সন্ধ্যার দিকে তো দোকানখানা একখানা প্রদর্শনী হ'য়ে ওঠে। যে তাকায় সেই ঢোকে। মজা লাগে অবন্তীর। ভেবেই পায় না এতদিন সে কী ক'রে সারাদিন বাড়িতে শুতে ব'সে আর ঐ নির্দিষ্ট কয়েকখানা মুখ দেখেই সময় কাটাতো। এদিকে বাড়িতেও জামাই-আদর। যে-পিসিমা সাত জন্মে একটা কথা বলতেন না রোজগার করে না ব'লে তিনি বলা নেই কওনা নেই, খাবার সময়ে ধপ ক'রে একগাদা তরকারি ঢেলে দিয়ে যাবেন পাতে, বলবেন, 'দেখ অন্তু, না খাসতো আমার মাথা খাস।' আনন্দবাবু আপিসে যাবার সময় স্ত্রীকে নীচু গলায় বলেন, 'ওকে একটু ভালো ক'রে খেতে-টেতে দিও; এত খাটুনি।' রাত্তিরে শুতে এসে বলেন, 'ঈশ!' কতরাত অব্দি খাটে ছেলেটা। জানি আগেই জানি, একদিন-না-একদিন ও আমার দুঃখু ঘোচাবেই ঘোচাবে। তোমরাই কেবল—

অবন্তীর মা'র হাসি পায়। চুপ করে থাকেন। কিন্তু ভয়ও করেন মনে-মনে, কী জানি এই সুমতি কদ্দিন থাকে। যুক্ত কর কপালে ঠেকিয়ে নিঃশব্দে বলেন, 'হে মধুসূদন, এই মতিতে ওকে স্থির রাখো।' ছেলেকে তিনি যত চেনেন আর তো কেউ তত চেনে না, তাই তিনি জানেন এত যখন বাড়াবাড়ি, তখন খড়ের আগুনের মতো দপ্ করে একদিন না নিভলে হয়।

তাঁর অনুমান মিথ্যে হ'লো না। মাস দুয়েক এইরকম পূর্ণোদ্যমে কাজ করবার পরেই অবন্তীর দম ফুরিয়ে এলো। একটু ঢিলে দিল সব কিছুতেই। প্রথমে গড়িমসি ক'রে দেরিতে যাওয়া, তারপর কামাই, তারপর কোনোদিনই সকালে না যাওয়া, হ'তে-হ'তে আবার যে কে সেই হ'য়ে উঠলো অবন্তী। মা চুপে-চুপে তাগাদা দিলেন, জোর ক'রে পাঠাতে চেষ্টা করলেন, আড়ালে ভর্ৎসনা করলেন, তারপর দেওয়ালে মাথা খোঁড়া ছাড়া আর গতি

রইলো না। আনন্দবাবুর মুখখানা একটু-একটু ক'রে আবার মলিন হ'য়ে উঠলো, শেষে থমথম করতে লাগলো। পিসির তরকারির অংশও শূন্যে ঠেকতে দেরি হ'লো না। তবু আর গা হ'লো না অবন্তীর। অংশীদাররা বললো, 'বা রে, তুমি যদি কিছুই না করবে তবে আছো কী করতে? খাটবো পিটবো আমরা আর পায়ের উপর পা তুলে আরাম করবে তুমি, এ কেমন কথা?' আর দোকানটা চলছিলোও ভালো। এর মধ্যেই প্রায় খরচ উঠে এসেছে। লাভের মুখ ধরো-ধরো। আর এই সময়ে কিনা এমন করছ অবন্তী। উড়িষ্যা আর আসাম অঞ্চল থেকে ঘুরে-ঘুরে এমন সুন্দর-সুন্দর সব শাড়ি, ব্লাউজপীস, বেডকভার, পর্দা যোগাড় ক'রে এনেছে ওরা যে নিজেদেরই দেখলে লোভ সংবরণ করা দায় হয়। সে-সব সাজিয়ে শো-কেসটা এমন দেখাচ্চে যে আগুন দেখে পতঙ্গ যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ে মহিলারাও তেমনি ঝাঁকে ঝাঁকে এসে ঢুকছেন, দেখছেন, নামাচ্ছেন স্তূপ-স্তূপ, নিয়ে নিচ্ছেন চতুর্গুণ দামে। বিক্রি করতে-করতে ঘায়েল হ'য়ে যাচ্ছে ওরা। তা হোক ; অবন্তীর আর উৎসাহ নেই ওতে। ঐ একঘেয়ে বোকার মতো দোকানে ব'সে থাকা, হিসেব বাখা, কেউ এলেই উঠে দাঁড়িয়ে অকারণে খুশি ভাব দেখিয়ে দাঁত বার ক'বে হাসা, মন-রাখা কথা বলা, দলে-দলে বিশ্রি বিশ্রি স্ত্রীলোক দেখা—বাজে, একদম বাজে। দোকানে যাওয়া সম্পূর্ণভাবেই ছেড়ে দিলো সে। আনন্দবাবু নিজে থেকে একদিন ডেকে অনেক মিষ্টি কথায় বোঝালেন ছেলেকে তারপর আবার বকা-ঝকা আরম্ভ হ'লো, কয়েকদিনের মধ্যে আবার সেই অশান্তি, আবার খিটিমিটি—শেষে কী জানি কেন আনন্দবাবু একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে গেলেন। এক হাজার টাকা যে তিনি কী কষ্ট ক'রে যোগাড় করেছিলেন তা কি অবন্তী জানে না? তার সুদ যে কত তা-ও সে জানে। তবে? তবে এখন কী করবেন? কেমন ক'রে চালাবেন সব? কত আশার স্বপ্ন বুনেছিলেন তিনি। সবই হ'ল। এখন হঠাৎ যদি মারা যান এতগুলো নাবালক নিয়ে অবন্তীর মা কোথায় দাঁড়াবেন তার ঠিক নেই। লাইফ ইনসিওরের পলিসিটা সুদ্ধু বাঁধা কোম্পানীর কাছে। দীর্ঘশ্বাসে বুক ভ'রে ওঠে ভাবতে-ভাবতে। আর অবন্তীর মা-ও চুপ। তাঁর বুকও ফুলে-ফুলে ওঠে কান্নায়।

এদিকে অবন্তীকে বাদ দিয়ে অন্য তিনজন চমৎকার চালাতে লাগলো দোকান। দেখতে-দেখতে রাসবিহারী এভিনিউতে সেই দোকানখানাই শ্রেষ্ঠ হ'য়ে উঠলো। হয়তো খরচা উঠে গেছে, হয়তো কত লাভ হচ্ছে, কিছুই জানতে পারলো না অবন্তী, কিছুই খবর নিলো না। মাঝে-মাঝে আনন্দবাবুর মনে হয় তিনি নিজেই যাতায়াত করেন, ছেলের হ'য়ে নিজেই বসেন গিয়ে দোকানে, অন্তত একটা খবর নিয়ে আসেন কেমন চলছে, কিন্তু লজ্জা করে। দোকান তো তাঁর নামে নয়, তিনি যাবেন কী সুবাদে? তবু সব সংকোচ এড়িয়ে একদিন গেলেন তিনি। ওদের হাতে ধ'রে তাঁর নিজের অবস্থা বুঝিয়ে আসল টাকাটা ফেরৎ চেয়ে এলেন। ওরা বললো, এখনো লোকসানের ঘরে অঙ্ক আছে, খরচ উঠলেই তাঁর টাকা ফেরৎ দেবে। কী আর বলবেন। সেইটুকু আশাতেই বুক বেঁধে ফিরে এলেন। নিঃশব্দেই বহন করতে লাগলেন সংসারের গুরুভার আর ঋণের তাগাদা। আগে স্ত্রীর সঙ্গে

চ্যাঁচামেচি ক'রে তবু লাঘব হ'তো কিছু, এখন সেটাও ছেড়ে দিলেন। ছেড়ে তিনি অনেক কিছুই দিলেন, ভালো করে খাওয়া ছাড়লেন কারো সঙ্গে ভালো ক'রে কথা বলা ছাড়লেন, আর মন থেকে ছেড়ে দিলেন ছেলেকে। কী হয় সন্তান দিয়ে? এই তো? তবে আর মনে করতে বাধা কী যে ও নেই, ও জন্মায়নি। কেবল মাঝখান থেকে একটা শত্রু এসে কিছু লুটে-পুটে নিয়ে চলে গেলো। দুর্ভাবনায় আর আশাভঙ্গে আনন্দবাবুর চুল পেকে গেলো।

একদিন অবন্তীর মা ছেলের কাছে গিয়ে একেবারে ভেঙে পড়লেন কান্নায়, 'তুই কি অন্ধ? দেখছিস না লোকটা মরে যাচ্ছে সংসারের চাপে? ডুবে গেছে ধার-কর্জে? তুই কেমন ক'রে শুয়ে-ব'সে নাটক নভেল প'ড়ে এমন নিশ্চিন্তে দিন কাটাচ্ছিস?'

'কেন, এত ধার-কর্জ কিসের? হয়েছে কী?'

'হয়েছে আমার কপাল।' ছোট মেয়ের মতো তাঁর বুকের ভেতর থেকে ফোঁপানি উঠলো। 'ধার-কর্জ কিসের তা তুই জানিস না?'

মাকে এতটা বিচলিত দেখে অবাক হ'লো অবন্তী। বিরক্ত হ'য়ে বললো, 'তা ধার-কর্জ সংসারে সকলেরই থাকে, তাই নিয়ে এমন হাঁসফাঁস করছো যেন কেউ ম'রে গেছে।'

'এর চেয়ে আমি মরলে যে অনেক ভালো ছিলো।'

'এই অসময়ে যে কী আরম্ভ করেছো! তা বেশ তো, আমাকে কী করতে হবে বলো না?'

'কিছুই করতে হবে না, কিছুই করিস না তুই। শুধু দয়া ক'রে তোর দোকানের আসল টাকাটা ওঁকে ফেরৎ এনে দে। আমি তোর হাতে ধ'রে বলছি, এই বুড়ো বয়সে ঋণের দায়ে মানুষটাকে আর তুই যার-তার হাতে অপমান হ'তে দিসনে।'

'ঠিক আছে। দয়া ক'রে চুপ করো তুমি।' বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে ব্র্যাকেট থেকে এক হ্যাঁচকায় পাঞ্জাবিটা টেনে এতখানি ছিঁড়ে ফেলে রাগ ক'রে চটি পায়ে বেরিয়ে গেলো অবন্তী ঘর থেকে। আর মা কান্না থামিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন ছেলের দিকে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে অবন্তী ট্রামে চেপে সোজা দোকানে এলো। মেজাজটা ছিলে-আঁটা ধনুকের মতো টং হয়ে গেছে। যে করে হোক বাবার টাকাটা সে আজই ফেরৎ দিয়ে এই কথা থেকে মুক্তি পাবে এই তার মনের ভাব। এসে দেখলো রূপেন্দ্র ব'সে আছে একা। খবরের কাগজে যুদ্ধের খবর পড়ছে মন দিয়ে। তখনো বারোটা বাজেনি। অবন্তীকে দেখেই লাফিয়ে উঠলো, 'ঈশ। বাঁচিয়েছিস আমাকে। মনে মনে এই চাইছিলাম।'

'কী চাইছিলি? আমাকে?'

'ধুত্তোর! তোকে কেন? তুই আবার দোকানে আসিস কবে? ভাবছিলাম পার্বতীদা পরেশদা, নিদেন পক্ষে নরহরিটা অন্তত আসুক—'

'নরহরি আবার কে?'

'নরহরিকে দেখিসনি? কর্মচারী রাখা হয়েছে না একজন?'

'ও বাবা, নোকরের আবার চাকর? এই দোকান, তার আবার কর্মচারী?'

'এখন তো আর আর-একজন লোকের কথাও ভাবছেন পার্বতীদা আর পরেশদা, নয়তো চলবেই না।'

'তা হ'লে বেচাকেনা মন্দ হচ্ছে না?'

'খুব ভালো।'

অবন্তী একটা চেয়ার টেনে বসলো, 'আর কি খবর বলো।'

'কিছুই না, দয়া ক'রে তুমি একটু বোসো, আমি পালাই।'

'মানে—'

'মানে, আমার ভীষণ একটা জরুরি কাজ আছে, না গেলেই নয়।'

'আর সব কোথায়?'

'আর সবের মধ্যে কর্মচারীটির দু'দিন জ্বর, আসতে পারছে না, পরেশদা গেছেন বড়বাজারে, আর পার্বতীদার তো আসার কোনো সময় নেই। বলতে গেলে বাইরের কাজ নিয়েই থাকেন। নিয়মিত ভাবে অন্তত সকলের দিকে আমিই প্রায় একা বসি। এ-সময়ে তো ভিড় থাকে না। ভিড় দেখবে বিকেলে চার দুগুণে আটখানা হাতে আমরা ঘেমে উঠি'' পা বাড়ালো রূপেন্দ্র' 'তা হ'লে তুই বোস, আমি চট ক'রে ঘুরে আসি একবার?'

'বসা-বসির কী আছে? দোকান বন্ধ ক'রে দে না।'

'সে কী করে? এখন তো বারোটাও বাজেনি। অনেক মেয়েরা যে এ সময়টাতেই আসে, স্বামীদের আপিস-টাপিস পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে তারপর—'

'তবে যা, শিগ্‌গির আসবি।' কথা কাটাকাটি না ক'রে অবন্তী দোকানে বসলো, রূপেন্দ্র বেরিয়ে গেলো। ফাল্গুন মাস, সামনের ঘূর্ণিফল গাছের পাতাগুলোর মধ্যে ঝিরিঝিরি হাওয়া ব'য়ে যাচ্ছে, ট্রাম চলেছে, বাস যাচ্ছে, ফুটপাত দিয়ে তাকাতে-তাকাতে হেঁটে যাচ্ছে লোকেরা, অনেকদিন পর মন্দ লাগলো না নেহাৎ দৃশ্যটি। মায়ের উপর মেজাজের ঝাঁঝটা কেমন স্তিমিত হ'য়ে এলো। অবুঝ তো নয়, আনন্দবাবুর কষ্ট সে বোঝে। মাঝে মাঝে বাবার জন্য কোথা একটু সমবেদনাও অনুভব করে সে। কিন্তু নিরুপায়। শরীর খাটিয়ে রোজ একঘেয়ে একটা কাজের কথা ভাবতেই তার জ্বর আসে। কিছুতেই পারে না। তা হোক, ক'দিন এসে হিশেব-নিকেশটা দেখে আনন্দবাবুর আসল টাকাটা যাতে ফেরত দিতে পারে তার চেষ্টা নিশ্চয়ই করবে সে। সত্যি, একটু অন্যায়ই হ'য়ে গেছে তার। কত কষ্ট ক'রে ভদ্রলোক যোগাড় করেছিলেন টাকাটা, সবটা না হোক পার্বতীদা পরেশদাকে ব'লে পার্টনারসীপে ইস্তফা দিয়ে অর্ধেকটাও যদি পাওয়া যায়। তাকিয়ে-তাকিয়ে দোকানের চারদিকে দেখতে লাগলো সে, তার মনে হ'লো যে-সব জিনিস সে আগে দেখেছিলো তার মধ্যে কিছুই প্রায় নেই বলতে গেলে। এতগুলো কটকি শাড়ি হ'লো কী? মণিপুরী খাস্‌গুলোও তো নেই দেখছি। বলতে গেলে তার চোখে বেশির ভাগ জিনিসই নতুন

লাগলো। যদি বিক্রি হ'য়ে থাকে আর তারপর এ-সব আনা হ'য়ে থাকে তবে তো ভালোই চলছে বলতে হবে। আসল টাকাটা বার করতে বেশি বেগ পেতে হবে না। তারপর নিশ্চিন্ত। এ-সব ঝামেলার মধ্যে আর থাকে কে?

অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলো অবন্তী। কাউণ্টারেই হাতের উপর মাথা রেখে মুহূর্তের তন্দ্রা। এর মধ্যেই একটি মেয়ে খুট খুট হিলের শব্দে, চুড়ির শব্দে, শাড়ির খসখসে, নাম না জানা কী একটা মৃদু সৌগন্ধে তাকে চমকিত ক'রে দোকানে ঢুকলো। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো অবন্তী। এলোমেলা চুল বাঁ হাতে ঠিক করতে-করতে স্মিতহাস্যে বললো, 'আসুন।'

ছিপছিপে গড়ন মেয়েটির, বরং একটু রোগাই বলতে পারেন। চেয়ে দেখবার মত নয় কিছু, অথচ সারা শরীরে সব মিলিয়ে এমন সুশ্রী যে চোখ পড়লে তা ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে ক'রে না।

'আমার শাড়িটা নিতে এসেছিলাম হয়েছে?' মেয়েটি মৃদু হেসে কাউণ্টারে হেলান দিয়ে ছবি হ'য়ে দাঁড়ালো।

কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হ'লো অবন্তী। ব্যস্ত হ'য়ে বললো শাড়ি? কী শাড়ি বলুন তো?'

'ছাপাতে দিয়েছিলাম।'

'ছাপাতে দিয়েছিলাম।' অবন্তী মাথা চুলকোলো।

'হ্যাঁ। ক'দিন এসে-এসে কেবল ঘুরে যাচ্ছি—'

'তাই তো। ভারি তো অন্যায়।'

'দয়া ক'রে আজ—'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। কিন্তু দেখুন, আমি—মানে আমি—'

'আজও দিতে পারবেন না, এই তো?' অমনি মেয়েটির মুখ ভার হ'লো। কথার সুরেও ঈষৎ উষ্ণতার আভাস। অস্থির অবন্তী ব্যাকুলভাবে এ-আলমারির দিকে একবার গেলো, সে-আলমারির দিকে একবার গেলো। কী শাড়ি, কেমন শাড়ি কিছুই সে জানে না, অথচ দিতে না পারার দুঃখে যেন ভারি ম্রিয়মাণ বোধ করলো সে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আধখানা দৃষ্টি মেয়েটোর মুখের উপর রেখে বিনীত গলায় বললো, 'কবে দিয়েছিলেন? আমি ক'দিন আসিনি কিনা—'

'এই দেখুন না রিসিপ্ট। দেবার কথা উনিশ তারিখ বিকেলে, আর আজ চব্বিশ তারিখেও আপনারা তা দিয়ে উঠতে পারলেন না। নম্বরটা মিলিয়ে দেখুন না, শাড়িটা হয়েছে না কি।'

অবন্তী জানে হাজার নম্বর দেখলেও কোনো ফল হবে না, তবু হাত বাড়িয়ে নিলো, মনোযোগ সহকারে সেই রিসিপ্টের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়েও রইলো অনেকক্ষণ, তারপর যেন ঠিক হদিশ পেলো এই ভঙ্গিতে পুরু ইট রংয়ের পর্দা সরিয়ে তাদের পিছনের 'প্রাইভেট' অংশটুকুতে গিয়ে একটু ব্যস্ত ভাবে সশব্দে ঘোরাঘুরি ক'রে ফিরে এসে

বললো, 'দেখুন আজই যাতে শাড়িটা আপনি পান আমি অবশ্য তার ব্যবস্থা করবো, দয়া ক'রে আপনি—'

মেয়েটি বাধা দিলো, 'দয়ার কথা আর ওঠে কিসে। নিজের গরজেই আসতে হবে। কিন্তু ঠিক ক'রে বলুন কখন আসবো।'

আন্দাজেই অবন্তী বললো, 'এই ধরুন বিকেল ছ'টা-সাতটা নাগাদ?'

'দেখবেন, আবার যেন ঘুরতে না হয়।'

হাতে হাত ঘষতে ঘষতে সহাস্যে দু'পা এগিয়ে এসে অবন্তী বললো, 'না, না, তা কি হয়?'

মেয়েটি নমস্কারের ভঙ্গিতে দুটি হাত যুক্ত ক'রে একটু হেসে নেমে গেলো রাস্তায়। রাস্তায় নেমে লাল ছাতাটা খুলে ধরলো মাথায়, অকারণে নিজের নরম হাতের পাতাটি দিয়ে খোঁপাটি ঠিক করতে-করতে হাঁটতে লাগলো পশ্চিম দিকে, আঙুলে লাল পাথরের আংটি ঝলসে উঠলো। অবন্তী অপলকে নিজের অজান্তেই তাকিয়ে রইলো সেদিকে। যতক্ষণ দেখা গেলো দেখলো. তারপরেও সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো চুপ ক'রে।

মনের এই আশ্চর্য অনুভূতির সঙ্গে এই তার প্রথম পরিচয়। বুকের ভেতরটা কেমন করতে লাগলো। ভালো লাগা না মন্দ লাগা, বিষাদ না বিরহ কিছুই বুঝতে পারোল না. মনটা ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠলো কেবল। হাত-ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলো বারোটা বেজে পাঁচ। যদি দেরি হয় সেজন্যে ডুপ্লিকেট রেখে গেছে রূপেন্দ্র। অবন্তী দোকানে তালাচাবি বন্ধ ক'রে বাড়ি ফেরার ট্রাম ধরলো। বাড়ি ফিরেও অন্যমনস্কতা তাব কাটলো না। সারাটা দুপুর যেন জগদ্দল পাথর হ'য়ে চেপে রইলো. সেই পাথর সরিয়ে সময়-সমুদ্র পার হ'য়ে কখন যে আজ বিকেল এসে ধরা দেবে তা কে জানে। আরাম গেলো, ঘুম গেলো, শুয়ে গড়াবার সুখ গেলো, উপন্যাসের ঔৎসুক্য গেলো, তারপর তিনটে না বাজতেই সে ছুটলো পার্ক সার্কাসে রূপেন্দ্রের কাছে। ছ'টার আগে শাড়িটা যে তাকে যোগাড় করতেই হবে। কী শাড়ী, কী রং, কী ছাপা, কার কাছে দিয়েছিলো কিছুই জানে না। না জানুক, জানতে হবে। দিতে হবে তাকে নিজের হাতে।

রূপেন্দ্র সবে দিবানিদ্রা ত্যাগ ক'রে উঠে বসেছে, অবন্তীর ঘর্মাক্ত ব্যস্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে অবাক হ'য়ে বললো, 'কী ব্যাপার? হঠাৎ এই রোদ্দুদের মধ্যে—'

সহজভাবেই জবাব দিতে গিয়েছিলো অবন্তী, হঠাৎ থমকে গেলো। অকারণেই মুখের ভাব তার সলজ্জ হ'য়ে উঠলো। ইতস্তত ক'রে বললো, 'দোকানে কখন ফিরলে?'

'বড্ড দেরি হ'য়ে গেলো। রাগ করেছিলি নিশ্চয়ই।'

'না, রাগ করবো কেন।' উঠে গিয়ে পাখার স্পীডটা বাড়িয়ে দিলো অবন্তী।

'বোস, চা করি, চা খা।' একজনদের সঙ্গে একখানা ছোট সাব লেটকরা ঘরে থাকে রূপেন্দ্র। দু-বেলা খায় হোটেলে। চায়ের ব্যবস্থা নিজের। খাটের কোণে গিয়ে স্টোভ

ধরাতে বসলো সে। ওখান থেকেই আলাপ করলো, 'কী মনে ক'রে এলিরে আজ?'

'কী আবার! অমনিই। ক'দিন দেখা হয় না, দোকানের খবর-টবরও রাখি না, তাই ভাবলাম—'

'আসিস না কেন? দোকান বেশ ভালো চলছে।'

'আসল টাকাটা তা হ'লে এতদিনে উঠে গেছে নিশ্চয়ই, কী বলিস?'

'উচিত।' সরলভাবে বললো রূপেন্দ্র। তারপর একটু গলা খাটো ক'রে বললে, 'কী জানিস অবন্তী, আমার মনে হয় পরেশদা আর পার্বতীদা যেন একটু কেমন করছেন।'

'কেন?'

'কী জানি! সারাদিন দু-জনে কেবল হিসেব আর হিসেব, আর আমাকে দেখলেই চুপ ক'রে যান।'

'হিসেব আর কী, সে তো সোজা ব্যাপার। কিন্তু কথাটা কী জানিস?' অবন্তী আসল কথায় আসতে চায়। হিসেব-নিকেশের কথা ওর ভালো লাগে না।

'কী কথা?'

'না, বলছিলাম কি মানে—' একটু থেমে, একটু কেশে, 'তুই যাবার পরেই একটি মেয়ে এসেছিলো।'

'কী রকম দেখতে বলতো?'

'সে আমি কি ক'রে বলবো?'

'মোটা মতো ফর্সা মধ্যবয়সী একজন মহিলা তো?'

'মোটেই না।' সবেগে প্রতিবাদ করলো অবন্তী, 'উনিশ কুড়ি বছর বয়েস, রং একেবারে স্নিগ্ধ শ্যামল, চোখ দুটো—'

স্টোভ ধরিয়ে, চায়ের জল চাপিয়ে কাছে এলো রূপেন্দ্র, 'তবে যে বললি দেখিসনি?'

হাসলো অবন্তী, 'চেহারার বর্ণনা দিয়ে কী হবে, কাজের কথা শোন। উনি তোদের কাছে কী-শাড়ী ছাপাতে দিয়েছিলেন, তারিখ-মতো পাচ্ছেন না ব'লে ভীষণ রাগারাগি করলেন।'

'ঐ দ্যাখ!' সোৎসহে রূপেন্দ্র আবার তার আগের কথায় ফিরে এলো, 'ওদের কথা আর বলিসনে আমার কাছে। কাজ নেবে যত খুশি, ওদিকে কথা দিয়ে কথা রাখতে পারবে না।'

'সেই শাড়ি আজ দিতেই হবে।'

'আমি একা মানুষ কী করি বল দেখি? মাত্র দুটো কারিগর দিয়ে এত কাজ করানো সম্ভব কখনো? বললাম পরেশদাকে—আরো একজন লোক দাও। বলে, এর বেশি কারিগর রাখার মতো নাকি দোকানের অবস্থা নয়। কিন্তু তোকে বলবো কী, খরচা টাকা বাদ দিয়ে বরং দোকানে বেশ লাভ দেখা দিয়েছে। চারমাস তো বয়েস, অথচ এর মধ্যেই—'

'কিন্তু ভাই সে-সব কথা এখন থাক, আগে শাড়িটা প্রস্তুত ক'রে দাও।'

'কেন, মেয়েটা বুঝি যাচ্ছে তাই ব'লে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'এক-একটা মেয়ে এমন থাকে—'

ব্যস্ত হ'লো অবন্তী, 'চলো না, এখুনি দোকানে যাই, দেখে রাখি গিয়ে কোন শাড়িটা।'

'কত নম্বর রিসিপ্ট?'

'নম্বর তো জানি না।'

'বাঃ, তোকে রিসিপ্ট দেখালো না?'

'দেখিয়েছিলো, নম্বর রাখিনি।'

'তা হ'লে কী ক'রে জানবো কোন কাপড়?'

'সে আমি জানি না। বার করতে হবে। খদ্দেরদের ওরকম ঘোরানো অত্যন্ত লজ্জার বিষয়।

'দেবার তারিখ কবে ছিলো?'

'উনিশ তারিখ।'

'ও, তা হ'লে মঙ্গলবারের ডেলিভারি। সে-সব কাপড় আজ আসবে।' পরম নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে হাই তুললো রূপেন্দ্র।

অবন্তী বললো, আজ 'আসবে মানে? আমি কথা দিয়েছি ছ'টার মধ্যে দেবোই।'

'ছ'টার আগেই আসবে। তারপর বুঝলি?' রূপেন্দ্র আবার গলা খাটো ক'রে পরেশ আর পার্বতীর নিন্দায় জাঁকিয়ে বসলো।

অনেক দীর্ঘ আর অনেক অবাঞ্ছিত সময় কাটিয়ে সবশেষে অবন্তীর হাত-ঘড়িতে সাড়ে ছ'টা বাজলো সেদিন। ছটফট ক'রে উঠে দাঁড়ালো সে। ভেতরের ঘরে গিয়ে জল খেয়ে এলো এক গ্লাস, বাইরে এসে একবার ফুটপাথে দাঁড়ালো, পকেট থেকে ছোট চিরুনি বার ক'রে মাথাটা আঁচড়ে নিলো একটু, মুখ মুছলো রুমাল বের ক'রে। ঘড়ির কাঁটা অবিশ্যি সাড়ে ছ'টাতেই লেগে রইলো না, এক সেকেণ্ড দু'সেকেণ্ড ক'রে বেশ এগিয়ে চললো মুহুর্মুহুঃ। দোকানে ঢুকে এবার স্থির হ'য়ে বসলো অবন্তী, সোজা রাস্তার দিকে তাকিয়ে কেবল মাঝে-মাঝে রঙিন শাড়ি দেখলেই চমকে উঠতে লাগলো। এই করতে-করতে কত খদ্দেরই এলো, কত খদ্দেরই গেলো। সে তাদের দেখলোই না ভালো ক'রে। বাজলো সাতটা, সাড়ে সাত, আট, নয়, সাড়ে নয়, পরেশদা এলো, পার্বতী এলো, দোকান বন্ধ ক'রে হিসেব নিয়ে বসলো তারা, মূঢ়ের মতো সেই খেরোয় বাঁধা হিসেবের বিশ্রি খাতাটার কালো কালির অক্ষরগুলোর দিকে অর্থহীন ভাবে তাকিয়ে রইলো অবন্তী।

তবুও, অতখানি মন-খারাপ থাকা সত্ত্বেও, ভালোভাবে বুঝুক না বুঝুক এটুকু অন্তত সেদিন আন্দাজ পেলো যে এখন আর দোকানে লোকসানের অঙ্ক নেই। মেয়েটি এলো না, সেই আশাভঙ্গের যন্ত্রণাটি না থাকলে আজ দোকানের এই আর্থিক উন্নতিটা হয়তো

ভালোই লাগতো তার কিন্তু যখন সে শিথিল পায়ে ট্রামে উঠে বাড়ি ফিরে গেলো তখন রাত ফুরোলেই কাল সকাল, আর সকাল হ'লেই দোকানে আসতে পারবে, আব দোকানে এলেই তার দেখা পাবার আশা, এই চিন্তাটুকু ছাড়া আর কোনো চিন্তাই ঠাঁই পেলনা মনে।

বাড়ি ফিরতেই দেখলো মা উদ্বিগ্ন হ'য়ে বারান্দায় ব'সে আছেন রাস্তার দিকে চোখ মেলে। আর তক্ষুনি মনে পড়ে গেলো আজ সে আনন্দবাবুর আসল টাকাটা ফেরৎ আনবাব ব্যবস্থাতেই দোকানে গিয়েছিলো সকালবেলা। নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হলো যেন। কোমল গলায় বললো, 'এত রাত ক'রে তুমি ব'সে আছো মা?'

'এতক্ষণ তুই কী কবলি? দশটা বেজে গেছে। কোথায় গিয়েছিলি?'

'দোকানে'।

'ব'লে যেতে হয় তো? কেউ যে ভাবনা চিন্তা ক'রে কষ্ট পাবে সেটাও কি তোর মনে হয় না কখনো?'

মা'র পিঠের উপর আস্তে হাত রাখলো অবন্তী, আস্তে বললো, 'চলো খেতে দেবে। বাবা ঘুমিয়ে পড়েছেন?'

'এই তো ব'সে থেকে-থেকে শুতে গেলেন।'

'সত্যি আমার ব'লে যাওয়া উচিত ছিলো—'

'হিসেব দেখছিলাম। আমাদের লাভ হচ্ছে মা।'

'লাভ হচ্ছে?' মা'র চোখ আশায় উৎসুক হয়ে উঠলো, 'দেখলি?'

'দেখলাম।'

'আসল টাকাটা তা হলে ফেরৎ পাওয়া যাবে?'

'যাবে বৈ কি।'

'তা হ'লেই হয়। যা দুর্ভোগ চলছে।'

মা আর ছেলে ঘরে এসে খেতে বসলো পাশাপাশি। মা'র মমতা, উদ্বেগ, ভালোবাসা অবন্তীর বুকের মধ্যে যেন আজ ঢেউ বদলে দিলো।

পরের দিন ঘুম ভাঙলো ঠিক ভোর সাড়ে পাঁচটায়, অবন্তীর জীবনে যা হয় না। চট করে উঠে বসলো সে, ঘড়ি দেখলো ব্যস্ত হ'য়ে, তারপর মুখ ধুয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো এক কাপ চায়ের জন্য। মা ওঠেন সকাল সকাল, অবাক হ'য়ে বললেন, 'ও কী রে, আজ যে বড় তাড়াতাড়ি?'

'একটু তাড়াতাড়িই বেরুতে হবে মা। ওরা ওঠেনি, আমাকে আলাদা এক কাপ চা ক'রে দিতে পারবে?'

'দাঁড়া দেখছি।'

চা পেতে দেরি হলো না, দু'খানা বিস্কুটও সঙ্গে আনলেন মা। বললেন, 'এত শিগগির কোথায় যাবি?'

'দরকার আছে।' অবন্তী বৃথা বাক্যব্যয় করলো না। চায়ের পেয়ালাটি দ্রুত চুমুকে শেষ

ক'রে জামা জুতো প'রে বেরিয়ে পড়লো। দোকান খোলা হয় সাতটার সময়ে, অবন্তী যখন সেখানে পৌঁছুলো সাড়ে ছ'টাও বাজেনি। কালকের ডুপ্লিকেট চাবিটি তেমনিই পকেটে রাখা ছিলো, হাতড়াতেই পাওয়া গেলো, তালা খুলে একা-একাই ব'সে রইলো রাস্তার দিকে তাকিয়ে। আস্তে আস্তে বেলা বাড়লো, আস্তে আস্তে অন্য তিন বন্ধুও এসে জুটলো। অবন্তীকে দেখে অবাক হ'লো তারা। রূপেন্দ্র খুশি হ'য়ে পিঠ চাপড়ালো, পরেশ আর পার্বতী নিজেরা নিজেরা কী জানি বলাবলি করলো। অবন্তীর মন একাগ্র, বন্ধুদের বিস্ময় বা হর্ষ বা বিরক্তি কিছুই যেন স্পর্শ করলো না তাকে। বেলা প্রায় ন'টার সময় পার্বতী আর পরেশ যখন বাইরের কাজে বেরুলো আর রূপেন্দ্র ডিটেকটিভ নভেলে মগ্ন হ'লো তখন এলেন অবন্তীর বাঞ্ছিত অতিথিটি। ধীরে আস্তে লাল ছাতাটি বন্ধ ক'রে সে যখন ঘরে ঢুকলো, যেন আবির্ভাব হ'লো তার। তার দিকে তাকাতে পারলো না অবন্তী, বুকটা ভ'রে উঠলো কানায়-কানায়। হয়ত মেয়েটির দেরিতে ঘুম ভেঙেছে আজ, মুখখানা ফোলা ফোলা, ঠিক বৃষ্টিভেজা অপরাজিতার মতো। চোখের পাতা ঈষৎ ভারি।

'আজ পাবো তো?' গলার যন্ত্র তারের মতো বেজে উঠলো। আর সেই অনুরণনে কেঁপে উঠে অবন্তী বললো, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। রূপেন্দ্র—'

রূপেন্দ্র পাশের জানালায় পা তুলে পেছন ফিরে পড়ছিলো, ডাক শুনে চোখ ফেরাতেই অবন্তী অস্থির দ্রুত গলায় বললো, 'এই যে, এঁর শাড়িটা, যেটা—'

'ও আপনি!' যেন কতকালের পরিচয় এমনি ভঙ্গিতে হাতজোড় ক'রে নমস্কার জানাতে জানাতে লাফ দিয়ে উঠলো রূপেন্দ্র, 'অত্যন্ত লজ্জিত, বড় দেরি হ'য়ে গেলো ডেলিভারি দিতে।'

অবন্তী মনে-মনে নিজেকে ধিক্কার দিলো, এটুকু ভদ্রতাও কেন সে শেখেনি যে একজন মহিলাকে দেখলে একটা নমস্কার জানাতে হয়। তাই ব'লে রূপেন্দ্রের অমন লাফ দিয়ে ওঠাও সে পছন্দ করলো না। কেমন হ্যাংলার মতো। কেন, আর কোনো দিন কি কোনো মেয়ে দ্যাখেনি না কি। একটু অভদ্র অভদ্রই ঠেকলো তার। মেয়েটি অবন্তীকে অগ্রাহ্য ক'রে এবার তাড়াতাড়ি রূপেন্দ্রের শরণাপন্ন হলো, 'এই তো আপনি! হয়েছে তো? না কি আজও—'

রূপেন্দ্র একেবারে আকর্ণ হাসলো, (যে হাসিটা ভয়ানক বিশ্রী লাগলো অবন্তীর)' 'না, আজও পাবেন না।' ব'লেই আলমারির সামনে থেকে বার ক'রে দিলো শাড়িখানা। কাপড়টি পেয়ে খুশি হলো মেয়েটি। হাসিমুখে বললো, হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। ঠিক এইরকম কটকি দাঁতের কথাই আমি বলেছিলাম।' কটকি দাঁতের কথা শুনে রূপেন্দ্ররও দাঁত বেরিয়ে গেলো, বিগলিত হ'য়ে বললো, আপনাদের কথামতো কাজ করাই তো আমাদের উদ্দেশ্য। আপনাদের খুশি-করতে পারলেই তো আমাদের সব শ্রম সার্থক। এত বাজে কথাও বলতে পারে, এক কোণে অবান্তর হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে অবন্তী মনে-মনে ভাবলো। ব্যাগ থেকে টাকা বের করতে-করতে মেয়েটি কটকি-কাজের আরো অন্য কোনো নতুন শাড়ি এসেছে

কিনা খোঁজ নিলো সে-বিষয়ে। রূপেন্দ্র তথাস্তু হ'য়ে রাজ্যের শাড়ি এনে স্তূপ করলো তার সামনে। মেয়েটি মনের আনন্দে ঘাঁটতে লাগলো। রূপেন্দ্র সুখের সাগরে ভেসে দেখতে লাগলো আর নিষ্ক্রিয় অবন্তীর মনটা যে কী বিষাদে আর হতাশায় আচ্ছন্ন হ'য়ে গেলো তা আর বলার নয়।

তারপর মেয়েটি চ'লে গেল।

কিনলো কি কিনলো না কে জানে। অবন্তীর পৃথিবীও মুছে গেলো সেই সঙ্গে। এতগুলি ঘণ্টার এত প্রত্যাশা এইভাবে সমাপ্ত হ'লো। কিন্তু ও কে? কোথা থেকে এসেছে? কোথায় গেলো? আবার কবে আসবে? ইচ্ছে করলো ছুটে রাস্তায় নেমে গিয়ে জেনে আসে সব। কিন্তু মন হারালেও বুদ্ধি তো সহজে হারায় না, অতএব অমন একটা অসঙ্গত আচরণ সে করবে কেমন করে? অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মেয়েটির পাকিয়ে পাকিয়ে ফেলতে দেখা রিসিপ্টটাই খুঁজতে লাগলো কাউণ্টারের ওপিঠে গিয়ে। আবার ডিটেকটিভ উপন্যাসের পাতা উল্টোতে উল্টোতে রূপেন্দ্র বললো, 'কী খুঁজছো?'

'কী জানি, রুমালটা যেন কোথায় ফেললাম।'

'ও।' রূপেন্দ্র আবার মন দিলো তার বই পড়ায়। আর অবন্তী চেয়ারের তলা থেকে দুমড়োনো কুঁচকোনো বালি-কাগজের অর্ধছিন্ন রিসিপ্টটি টুপ ক'রে তুলে নিয়ে তার অলক্ষ্যে পকেটে পুরলো। তারপর 'আসছি' বলে তাড়াতাড়ি চোরের মতো বেরিয়ে এলো রাস্তায়।

আশ্চর্য! কত একটা ছোট ব্যাপারে যে কত বড় একটা বিপ্লব ঘ'টে গেলো অবন্তীর মনোরাজ্যে তা বাইরের কেউ জানলো না। কিন্তু তার ধাক্কা সামলাতে যে কী পরিমাণ ব্যাকুলতা বোধ করলো অবন্তী তা একমাত্র সে-ই বুঝতে পারলো। একজন মানুষকে, কোনো একদিন এক পলকের জন্য একবার সামান্য একটু চোখে দেখা, আর তারপর এই অবস্থা হওয়া সেটা অবশ্যই স্বাভাবিক নয়, কিন্তু কী করবে অবন্তী, তার মন থেকে পলকের জন্যও মুছে গেলো না সেই চেহারা, শ্রবণেও লেগে রইলো সেই স্বর। বালি-কাগজের রিসিপ্টে গোটা-গোটা অক্ষরে একটুখানি হাতের লেখা, শুধু সেইটাই সম্বল রইলো কাছে।

সকালে উঠেই সে যেন কিসের আকর্ষণে ছুটে আসে দোকানে, আর একেবারে শেষ খদ্দেরটি পর্যন্ত বসে থাকে। তারপর বাড়ি ফিরে গিয়ে কোনোরকমে দুটি নাকে-মুখে গুঁজেই চলে আসে। আবার অনর্থক সারাটা দুপুর পথের দিকে তাকিয়ে ব'সে থাকে একা-একা। বন্ধুরা সময় মতো এসে দেখে অবন্তী ঠিক তেমনি সমাসীন আর চেয়ারে। তারা বলাবলি করে, ব্যাপার কী? উত্তর পায় না। রাত্রিরে দোকান বন্ধ হ'য়ে গেলে, তবে ফেরে। বুকের মধ্যে কেবল দুরু-দুরু করতে থাকে, কী জানি এখন এসে ফিরে যাবে সে, আর দেখতে পাবে না, তার চেয়ে এখানে থাকাই ভালো।

কিন্তু এই যে একটুখানি আবার দেখার দুর্নিবার পিপাসা, মনে-মনে এত আকর্ষণ-

বিকর্ষণ, আকুলি-বিকুলি, সারাক্ষণ রাস্তাঘাটে ট্রামে বাসে চোখ পেতে রাখা, দিবারাত্রি দোকানঘরেই ব'সে থাকা, কিছুতেই আর কিছু হ'লো না। মেয়েটি আর এলো না দোকানে। সে যেন মুছে গেলো কলকাতা শহর থেকে। অবশেষে ব্যর্থ হ'তে-হ'তে অবন্তীর মন থেকে ও আশার বেগ মুছে এলো ক্রমে। তবুও কেমন অভ্যাস হ'য়ে গেলো নিয়মিত দোকানে এসে বসে থাকা, আর হঠাৎ-হঠাৎ চকিত হয়ে কাউকে দেখা।

সময়ের উপর প্রলেপ ফেলে-ফেলে কাটতে লাগলো দিন, ফাল্গুনের পরে পাতাঝরা চৈত্র এলো, এলো কালবৈশাখীর ঝড়। জ্যৈষ্ঠের দারুণ গুমোট, আষাঢ় শ্রাবণের ঘন বর্ষা, শরতের দাক্ষিণ্য, হেমন্তের নবান্ন। তারপর কখন জানি অবন্তীর হৃদয় থেকে ও-মেয়েটির স্মৃতি ফিকে হ'য়ে-হ'য়ে একটা অস্পষ্ট সৌরভের মতো আচ্ছন্ন ক'রে রইলো চেতনা। যে-ঘরটিতে তাকে দেখেছিলো সে-ঘরটিই প্রিয় হ'য়ে উঠলো, যাকে উপলক্ষ্য ক'রে অবিশ্রান্ত ব'সে থেকেছে এই দোকানে সেই মানুষটি মুছে গিয়েও দোকানটি রইলো জীবন্ত হয়ে। এর লাভ-লোকসান, ভাল-মন্দ, বেচাকেনা সাজানো গুছোনো সব কিছুই ভালো লাগতে লাগলো তার, সব কিছুতেই একটা অস্বাভাবিক মায়া প'ড়ে গেলো। অবন্তী ব্যবসায় মেতে উঠে নেশায় জড়িয়ে গেলো।

এর পর যুদ্ধের আগুন লাগলো বাজারে। যে-দামে জিনিস কিনেছিলো, তার ষোলোগুণ দাম চ'ড়ে গেলো দেখতে-দেখতে, পরেশ আর পার্বতী চারজনের একজন ভাগীদার না হ'য়ে আরো লাভের আশায় বিমান বাসস্থান নির্মানের কাজে চ'লে গেলো দোকান ছেড়ে দিয়ে। রূপেন্দ্র ঘুরে ঘুরে মাল যোগাড়ে মন দিলো, আর দোকান আগলে ব'সে রইলো অবন্তী। কর্মচারী রাখা হ'লো দুজন, শো-কেস বড় হলো, ছোট ঘরে ধবে না ব'লে মাঝখানকার দেওয়াল ভেঙে চারগুণ বেশি ভাড়ায় ভাড়া নেওয়া হলো পাশের দোকান ঘরটি, চললো বিকিকিনি। স্রোতের মতো আসছে মেয়েরা, দেখছে শুনছে, নিচ্ছে, যে কোনো দাম দিচ্ছে শখের জন্য, কর্মচারীরা সারাদিন হাঁসফাঁস ব্যস্ত ব্যাকুল। থাকে থাকে জিনিস সাজানো, আলাদা-আলাদা কাউণ্টার। একদিকে মনোহরণ মনোহারী, একদিনে চোখ-ভোলানো শাড়ি ব্লাউজের স্তূপ, অন্যদিকের শো-কেসে পাথরের গয়না, কিছু কিছু ফার্নিচার, কার্পেট, রঙিন পোশাক, কিছুই বাদ রইলো না।

অবস্থা ফিরে গেলো আনন্দবাবুর। ছোটো বাড়ি ছেড়ে অবন্তী তাঁদের নিয়ে বড় বাড়িতে এলো, বড় বাড়ি কিনে দিলো হাওয়া খাবার জন্য, ঝি চাকরের সংখ্যা প্রায় অগুনতিতে ঠেকলো। ঘরে-ঘরে ইলেকট্রিক পাখার হাওয়ায় দূর হলো দুর্নিবার গরম, রেফ্রিজরেটরের ঠাণ্ডা ফল খেয়ে আর আইসক্রীম খেয়ে বুক ঠাণ্ডা হলো সকলের। পিসিমার মুখের কথা অমৃত হ'লো, বাবার মুখ তৃপ্তিতে ভরে গিয়ে বয়স কম দেখালো, মা এবার সকলের কাছে সগর্বে মাথা উঁচু ক'রে রইলেন, ভাই-বোনেরা দামী জামা প'রে দামী স্কুল কলেজে গিয়ে ফ্যাশানেব্ল হলো।'

একদমে এতখানি ব'লে মৃদু হেসে চুপ করলেন ভদ্রলোক। উৎসুক হয়ে বরুণ বললো, 'তারপর'?

'তারপর?'

'তাবপর?' সমীর রায় আর পূর্ণেন্দুও যোগ দিলো সেই প্রশ্নে। প্রশান্ত চুপ ক'রে অপেক্ষমান রইলো।

ভদ্রলোক বললেন, 'আর তো তারপর নেই কিছু। আমি তো একটা মিজরাবের গল্পই শোনাতে চেয়েছিলাম আপনাদের। তাই হলো। সেই মেয়েটি একদিন এক পলকের জন্য একটুখানি ঝংকার তুলেই অবন্তীর জীবনটা বদলে দিয়ে গেলো একেবারে। তার ভেতরকার দাহিকা শক্তিতে চকমকি ঠুকে গেলো। আর সেই সঙ্গে আমার কথাটিও ফুরোলো, নটেগাছটিও মুড়োলো।'

'না মশাই, ও-সব চলবে না।' চেপে ধরলো পূর্ণেন্দু, 'আমরা এর উপসংহারটুকুও শুনতে চাই।'

উপসংহার তো আজ আপনাদের বন্ধুরই একচেটিয়া ব্যাপার। ট্রেনের এই কামরায় আমি যতক্ষণ ধ'রে উঠেছি, আর মার্জনা করবেন, বাধ্য হ'য়েই আপনাদের চারজনের যতটুকু কথোপকথন শুনে ফেলেছি তাতে মনে হচ্ছে ইনি একজন বিবাহে অনিচ্ছুক পাত্র। মনে মনে আমি হাসছিলাম সব শুনে।'

বরুণ বললো, 'কেন?'

'এই ধরনের অনিচ্ছুক অনেক বিবাহযোগ্য ব্যক্তির পরিণতিই আমার জানা আছে কিনা?'

'কী রকম?'

'নেহাৎ শুনতে চান তো বলতেই হয়।'

'নিশ্চয়। নিশ্চয়।' একযোগে ব'লে উঠলো পূর্ণেন্দু আর সমীর রায়। সহাস্যে প্রশান্ত বললো, 'আমার মনে হচ্ছে অবন্তীর মিজরাবের গল্পটি যদি আপনি শেষ অব্দি ব'লে যান তা থেকেই আমরা সেই পরিণত ভদ্র লোকটির কথা জানতে পারবো।'

হাসলেন ভদ্রলোক, 'তা হ'লে তাই শুনুন। কিন্তু জানেন তো সব ভালো যার শেষ ভালো। এর শেষটুকু যদি ভালো না লাগে তা হ'লে কিন্তু তার দায়িত্ব আপনাদের।'

'স্বচ্ছন্দে। আপনি বলে যান।' ঘাড় কাৎ করলো পূর্ণেন্দু। ভদ্রলোক একবার বাইরের দিকে তাকালেন, তারপর ভেতরে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, বুঝতেই তো পারছেন, মাত্র দু'বছরের ব্যবধানে কী রকম একটা ভোজবাজি হ'য়ে গেলো অবন্তীদের সংসারে। রেয়ন প্যাণ্ট আর লিনেন ব্যুশসার্ট-পরা এই অবন্তীকে দেখলে আর সেই অবন্তীকে মনে আনতে পারে না কেউ। একদণ্ড সে স্থির থাকতে পারে না, কেবল মাথায় ঘুরছে উপার্জনের ফন্দি। সারাদিন অস্থির, সারাদিন ব্যস্ত। একটা-না-একটা ভাবনা তার লেগেই আছে মাথার মধ্যে। রাত্রের ঘুমটুকুও যেন তার উপার্জন অপহরণ করতে চাইছে এই রকমই মনে হ'লো তার।

এবার সবাই বললো—'বিয়ে করো।'

'সময় কই?' মুখে বললো সে কিন্তু মনে যেন অন্যরকম সুর। সে-সুর চেনা যায় না, দূর থেকে ভেসে ভেসে মিশে যায়। মা বললেন, 'বিয়ে করতে হ'লে ঠিক বয়সেই করা উচিত, আর তোমার মতো যোগ্য ছেলে। সাতাশ বছর বয়স হ'লো প্রায়—'

'ও-সব ছাড়ো মা।' ব্যস্তসমস্তভাবে বেরিয়ে যাবার আয়োজন করতে-করতে নির্লিপ্ত গলায় জবাব দেয় অবন্তী। বিয়ের কথা সত্যি তার ভালো লাগে না। কোনো মেয়ে নিয়ে কোনো কল্পনাই আর স্পর্শ করে না তাকে। বুকের ভেতরকার সেই সবুজ রং কেন যে অমন ধুয়ে-মুছে গেছে কে জানে। যে-একজন মেয়ে তার জীবনে এমন আশ্চর্য বিপ্লব এনে দিয়েছিলো সেও যে এখনো হৃদয় জুড়ে ব'সে আছে তা তো নয়। একবার মনেও পড়ে না সে-কথা। আসলে ব্যবসা ছাড়া আর আজকাল কিছুই মনে পড়ে না তার। সব আকর্ষণ, সমস্ত প্রেম ঐ একটি জায়গাতেই নিবদ্ধ। দেখতে দেখতে আরো দুটো বছর ব'য়ে গেলো তার অবিবাহিত জীবনের উপর দিয়ে। একটু মোটা হলো, রং ফর্সা হলো আরো, অসম্ভব ঘন চুল যেন পাতলা হ'যে গেলো একটু। এবার আনন্দবাবু নিজে এসে দাঁড়ালেন ছেলেব কাছে, 'অবন্তী, একটা কথা।' চেয়ার ছেড়ে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে অবন্তী বললো। 'বলো।'

'আমি বুড়ো হয়েছি, সংসারের সব ভার নিয়ে আমাকে তুমি শান্তি দিয়েছো, বিশ্রাম দিয়েছো, কিন্তু তোমার মা'রও এবার একটা বিশ্রাম দরকার।'

'মা'র বিশ্রাম!' অবাক হ'লো অবন্তী, 'কেন মাকে কি এখনো তেমনিই খাটতে হয় সংসারের জন্য?'

'শারীরিক খাটুনির কথা আমি বলছি না, কিন্তু মনেরও তো একটা বিরতি দরকার? আর কত কাল ভাববেন তিনি?'

'কী ভাবেন? আমি তো কিছু বুঝতে পারছিনে বাবা?'

'সংসারের ভাবনাই ভাবেন, আর কী ভাবেন বলো?' লোকজন থাকলেই কী, তাদের চালোনোর দায়িত্ব তো তাঁরই? তোমার-আমার ভাবনাও তাঁর।'

'আমাকে কী করতে বলো?'

'তুমি বিয়ে করো। এ সংসার তোমার স্ত্রীর হাতে দিয়ে তোমার মাকে বিশ্রাম দাও।'

এবার অবন্তী মাথা নিচু করে চুপ করে রইলো।

'আরো একটি অনুরোধ আছে আমার। একটি মেয়েকে আমি মনে মনে পছন্দ করেছি। আশা করি তাকে দেখলে তোমারও ভালো লাগবে। লেখা-পড়া শিখেছে, ব্যবহার শিখেছে, ভদ্রতা, নম্রতা, সৌজন্য সব কিছুই মেয়েটির উল্লেখযোগ্য।'

অবন্তী চুপ।

'কয়েক মাস আগে তোমার মাকে নিয়ে যখন দিল্লী বেড়াতে গিয়েছিলাম, পথে এলাহাবাদে কয়েকদিনের জন্য নেমে ছাত্রজীবনের এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। ওখানে বিশেষ নাম-করা ডাক্তার সে। তারই মেয়ে। ওখানকার স্কুলে পড়ায়।'

অবন্তী চুপ।

'যদি ব'লো তা হ'লে তাকে আসতে লিখতে পারি মেয়েটিকে নিয়ে। পছন্দ হ'লে—'

'কিছু দরকার নেই।'

ছেলের উত্তরে একটু থমকে গেলেন আনন্দবাবু। মৃদু গলায় বললেন, 'তা হ'লে মত নেই তোমার?'

'তোমাদের যা ইচ্ছে, যেমন ইচ্ছে তেমনিই করতে বলছি আমি। এ-বিষয়ে আমার নিজের কোনো মতামত নেই, আর ও-সব মেয়ে দেখা টেখাগুলো আমার ভালো লাগে না।' বলেই অবন্তী দ্রুতপায়ে সে-ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

আসলে বিয়ে-বিয়ে ক'রে গুরুজনদের এই এক চিরাচরিত ঝামেলা মোটেই ভালো লাগছিলো না তার। তাই চুকিয়ে দিতে চেষ্টা করলো। মা খুব খুশি হলেন, বাবা খুশি হলেন, বুড়ি পিসির মুখেও হাসি ফুটলো, বাই-বোনেরাও নেচে উঠলো আসন্ন উৎসবের আনন্দে। কেবল অবন্তীর মনেই কোনো তরঙ্গ উঠলো না। সমস্ত ঠিকঠাক ক'রে বাবা আরো-একবার তাকে মেয়েটিকে দেখতে বলেছিলেন; কিছুতেই রাজি হ'লো না। ভাবতে পর্যন্ত তার বিশ্রি লাগলো। যে মেয়েই হোক, একজনকে বিয়ে করলেই হলো। একদিন সকল সত্তা দিয়ে যাকে সে অনুভব করেছিলো সারা হৃদয়ে যত ক্ষণিকেরই হোক, হয়তো সেই মেয়েই তার জীবন থেকে সমস্ত রং নিংড়ে নিয়েছে। থামিয়ে দিয়ে গেছে সকল স্পন্দন।

বিয়ের দিন সকালবেলা থেকেই যেন মনটা কেমন ভারাক্রান্ত হ'য়ে রইলো অবন্তীর। ভালো লাগলো না কিছু। সমারোহের ত্রুটি করেননি আনন্দবাবু। প্রিয়জন, পরিজন, আত্মীয়-কুটুম্ব সকলকেই ডেকেছেন। লোকে লোকারণ্য বাড়ি। ফুলের গন্ধে, ভিড়ের গন্ধে, আর রান্নার গন্ধে মাখামাখি হওয়া। অবন্তী একা ঘরে মুহ্যমান হয়ে ব'সে রইলো চুপচাপ। কলরব অসহ্য মনে হ'লো। মনের কোণায়, কোনো অভ্যন্তর থেকে যেন একটা অদ্ভুত গ্লানি বারে বারে আঘাত দিলো তাকে।

ওদিকে ভাবী শ্বশুর বরদা চৌধুরি ঘন-ঘন আসছেন এ-বাড়িতে। চমৎকার স্বাস্থ্য, ডাক্তার হবার যোগ্যই বটে। জামাইকে সিগরেট অফার করছেন, পিঠ চাপড়াচ্ছেন, গল্প করছেন সমবয়সীর মতো। আনন্দবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করছেন সব বিষয়ে। ভদ্রলোক চিরপ্রবাসী, বাংলাদেশের জলবায়ু বা হালচাল সব-কিছু থেকেই বহুকাল বিচ্ছিন্ন, কাজেই আনন্দবাবু বা তাঁর স্ত্রীর বুদ্ধিই এখন তাঁর ভরসা। বলতে গেলে চিঠি লিখে যেমন বিয়ে ঠিক করেছেন আনন্দবাবু, তেমনি বন্ধুর কলকাতা এসে উঠবার বাড়িটিও খুঁজে দিয়েছেন। বিয়ের অণুকোটি চৌষট্টি ব্যবস্থাও তাঁরই। বরদাবাবু বিপত্নীক। দুটিমাত্র মেয়ে। বড়টিকে বিয়ে দিতে দিন কয়েকের জন্য সে-বার এসেছিলেন, আর ছোটটির জন্য এই এলেন।

লগ্ন একটু শিগ্‌গিরই ছিলো। সন্ধ্যা না হ'তেই ঝমঝমিয়ে বাদ্য বেজে উঠলো। ঢাকা

পল্টন মাঠের গোরার বাজনা। শাদা-শাদা বেলকুঁড়ি দিয়ে হংসদূত সাজানো মোটর এলো বর নিতে, অতিথি অভ্যাগত, আত্মীয় কুটুম্ব যে যেখানে ছিলো সব ভিড় করলো এসে এক জায়গায়. মেয়েরা শাঁখ বাজালেন, উলু দিলেন, হৈহৈ হুল্লোড়, একরাশ আলো, রাশি-রাশি লোক, অসংখ্য ফুল. মহাসমারোহে যোগ্য জামাইকে বরণ ক'রে নিলেন বরদাবাবু।

বিয়ে চুকোতে রাত দশটা বাজলো, আর বারোটার মধ্যেই নববধূ নিয়ে নিভৃত হ'লো অবন্তী। এতক্ষণ যে কী করেছে আর না করেছে কিছুই মনে পড়লো না তার। শুভদৃষ্টির সময়েও সে কিছু দ্যাখেনি মনে হলো। ঘর নীরব হ'তে এতক্ষণে যেন হারিয়ে ফেলা নিজেকে খুঁজে পেয়ে বাঁচলো। একটুখানি চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে থেকে দরজাটি বন্ধ ক'রে দিলো, তারপর তীব্র বৈদ্যুতিক আলোটি নিবিয়ে দিয়ে শুলো এসে বিছানায়। কী ক্লান্তি, কাতর ব্যাপার। সারাদিন ব্যবসা ক'রেও তো সে কোনোদিন এত ক্লান্ত হয়েছে ব'লে মনে হয় না তার।

এদিকে নতুন বৌ মেঝেতে নতুন চিকন পাটির উপর তেমনি ব'সে রইলো নিঃশব্দে। সরায় ঢাকা-মাটির প্রদীপ একটি আবছা আলো রচনা করলো, দেওয়ালে কাঁপলো তার শিখাটা। সেই আলোয় তাকিয়ে-তাকিয়ে স্বামীর উদাসীন ভাব-ভঙ্গি দেখে বোধ হয় অবাক হ'লো সে। হয়তো বা আত্ম অভিমানেও আঘাত লাগলো। এক সময়ে সেই আলোটুকু এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিয়ে বিছানায় নয়, সোজা রাস্তার দিকের জানালায় এসে দাঁড়ালো। অন্যমনস্ক ছিলো অবন্তী, খানিক পরে ন'ড়ে-চ'ড়ে এদিকে ফিরে অনুভব করলো তার পাশের জায়গাটি শূন্য। নিচে তাকিয়ে দেখলো পাটিটিও শূন্য। একটু চকিত হলো সে, নিজের উদাসীনতাকে কী জানি কেন মনে মনে ধিক্কারও দিলো একটু, আধশোয়া হ'য়ে চারদিক তাকিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই একটি মৃদুস্বর নিক্ষেপ করলো, 'শোবে না?'

জবাব এলো না। হাত বাড়িয়ে বোঝা গেলো সে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে নেই। সম্পূর্ণ উঠে বসলো এবার, জানালার দিকে তাকিয়ে নেমে এলো কাছে।

'এখানে কেন?'

মেয়েটি ঈষৎ হেলে দেয়ালের ঠেসানে নিজের শরীরটাকে ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো, এ-কথার পরে তার শরীরের ভঙ্গিটা ঋজু হ'লো, অনমনীয় হ'লো।

'রাত হয়েছে, তোমার কি ঘুম পায়নি?' আর একটু কাছে এলো অবন্তী।

'না।'

'আমার ঘুম পেয়েছে।'

'আমার জন্যে কি অসুবিধে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'কী।'

কী তা অবন্তী জানে না। আরো অনেক কাছে স'রে এলো সে, প্রায় একান্ত হ'য়ে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরটা যেন কেমন ক'রে উঠলো তার। চুলের ঠিক

এইরকম একটা মিঠে মিঠে গন্ধ কবে যেন পেয়েছিলো সে, কার কাছে দাঁড়িয়ে যেন ঠিক এরকমই লেগেছিলো তার। কার? কার? ব্যাকুল হ'য়ে অবন্তী স্পর্শ করলো স্ত্রীকে। ঠিক। ঠিক। যাকে সে কোনোদিন স্পর্শ করেনি, করবে না, এমনকি সমস্ত জীবনও যাকে দেখতে পাবে না সে, এ যেন ঠিক তার স্পর্শ, তার গন্ধ, ঠিক যেন তারই অস্তিত্ব।

'তুমি কে?'

গলার স্বরে অবন্তীর এমন একটা আকুলতা ফুটলো যে অবাক হ'য়ে মুখ ফেরালো মালতী। অবন্তী আলো জ্বাললো ঘরে, আর আলোর তলার লাল শাড়ি আর লাল আলতা পরা মেয়েটিকে দেখে সে স্তব্ধ হ'য়ে গেলো। এ যে সেই মেয়ে। কতক্ষণের জন্য দুটি চোখ তার পাথরের চোখের মতো স্থির হ'য়ে রইলো সে-মুখের উপর। চার বছর আগেকার সুতীব্র ভালো-লাগা আর ব্যর্থতার মেশামেশি অনুভূতিটা যেন আবার ঢেউয়ের মতো গড়িয়ে-গড়িয়ে যেতে লাগলো তার বুকের উপর দিয়ে। সে স্পর্শমণি একদা তাকে এই সৌভাগ্যের দরজায় হাতে ধ'রে এনে পৌঁছিয়ে দিয়েই লুকিয়েছিলো, সহসা তার আবির্ভব তাকে মুহূর্তের জন্য অচেতন ক'রে ফেললো। আর মেয়েটি তার বিস্মিত চোখের তলায় দাঁড়িয়ে রইলো অত্যন্ত বিব্রত ভঙ্গিতে। তার লাল শাড়ি, চন্দন-আঁকা সাদা কপাল, আধ খোলা কালো খোঁপা, কেবলমাত্র দুটি চোখ দিয়ে এত ঐশ্বর্য অবন্তী দেখবে কেমন ক'রে? সচকিত হ'য়ে তাড়াতাড়ি আলো নিবিয়ে দিলো সে, দু'হাত বাড়িয়ে স্ত্রীকে কাছে টেনে এনে প্রাণ ভ'রে অনুভব করতে লাগলো তার সমস্ত দেহ-মনের অপরূপ অস্তিত্ব।'

'ভারি অদ্ভুত তো!' ট্রেনের কামরাটিতে কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধ থাকার পর মন্তব্য করলো বরুণ। মৃদুহাস্যে ভদ্রলোক বললেন, 'অবিশ্যি এই অদ্ভুত ঘটনাটি না ঘটলেও অবন্তীর মনে ক্ষোভ আসতো না কোনো।'

'কেন? যে-মেয়েকে একদৃষ্টি দেখেই এত ভালোবেসেছিলো, যার জন্য সে চিরকুমার-ব্রতেই অধিষ্ঠিত থাকতে চেয়েছিলো, সে না হ'লে কি এই গল্পের উপসংহার এত জমতো?'

'জমতো।'

'কী ক'রে? আপনি কি মনে করেন বিশেষ একজনও যে-কথা, আর যে-কোনো একজনও তাই?'

'না, না, তা নিশ্চয়ই নয়। তবে কি জানেন, সত্যি-সত্যিই যে কে কার জীবনে বিশেষ সে-কথা একমাত্র আমাদের বিধাতা-পুরুষই জানেন। তা নইলে সেই রাত্রে স্ত্রীকে জানালায় দাঁড় করিয়ে নিরুদ্বেগে ঘুমোতে পারলো না কেন অবন্তী? তার দেখা না দেখায় মেশা, কল্পনার সেই প্রাক্তন প্রিয়াকে ভেবেই কেন বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করলো না?'

'খুব ঠিক কথা!' প্রশান্ত তার বড়-বড় কালো চোখের তারায় মিষ্টি ক'রে হাসলো, 'একটু আগে আমার গল্পেও আমি এদের সে-কথাই বলতে চেয়েছিলুম। আপনার মতো

এত সুন্দর ক'রে, পরিষ্কার ক'রে বোঝাতে পারিনি. তাই—'

'খুব ভালো করে বুঝেছি।' বরুণ প্রায় অট্টহাস্যে ভেঙে পড়লো. 'কিন্তু সে-কথা বুঝিয়ে আমাকেও তোমরা একটি নীলবর্ণ শৃগালে পরিণত করতে চাও, অত্যন্ত দুঃখিত, সে-ইচ্ছে আমি তোমাদের পূরণ করতে পারবো না।'

হাত পা নেড়ে পূর্ণেন্দু বললো. 'তবে তবে কী করবে তুমি? সামান্য একটা বিয়ের ভয়ে ট্রেন থেকে লাফিয়ে প'ড়ে আত্মহত্যা করবে? করো, করো, তোমার মতো কাপুরুষের তাই করা উচিত।'

'না, তা করবো না।' হাসি থামিয়ে মুখের ভাব কঠিন করলো বরুণ, 'তোমাদের সকলকে আমি উচিত শিক্ষা দেবো। আমার মা যাতে সমস্ত জীবন ছেলের উপর তাঁর এই কর্তৃত্বের অহংকারে যন্ত্রণা পান, তা-ই করবো।'

'জেদ রক্ষা করা ভালোই।' স্মিত মুখে হাসলেন ভদ্রলোক, 'তবে সেটা একটু কঠিন হবে ব'লেই মনে হচ্ছে আমার। এ-ও মনে হচ্ছে সেই কঠিন কার্যটি করতে আপনি অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিরত হবেন।' শ্লেষাত্মক হাসিতে মুখ ভরিয়ে বরুণ জবাব দিলো, 'আপনার অনুমান যদি সত্য হয় নিজেকে তবে নেহাৎ অপদার্থ ছাড়া আর কিছু ভাববো না।'

'এখনো যে খুব পদার্থ আছো সে-বিষয়েও আমাদের সন্দেহ আছে।' সমীর দু'হাত উঁচুতে তুলে হাই তুললো একটি, 'নাও. আর বাড়াবাড়ি না ক'রে একটু মাথাটাথা আঁচড়ে ঠিক হ'য়ে নাও। এলাম ব'লে।'

প্রশান্ত টোকা দিয়ে ছাই ঝাড়লো সিগারেটের, 'তা একটু উস্কোখুস্কো থাকাই ভালো। বেশ উদ্‌ভ্রান্ত দেখায়, চেহারাটা ফোটে।'

'বিছানা গুটোও, বিছানা গুটোও, স্টেশন দেখা যাচ্ছে।' গলা বার ক'রে মন্তব্য ছেড়ে পূর্ণেন্দু ভীষণ ব্যস্তবাগীশের মতো উঠে দাঁড়িয়ে এটা টেনে ওটা ফেলে গুছোনো জিনিস এলোপাথাড়ি ক'রে দারুণ কাজ করতে লেগে গেলো।

'ভীষণ লোভ হচ্ছে।' ভদ্রলোক বললেন, 'আপনাদের সঙ্গী হ'তে, চারটি বন্ধুর যা দশা দেখছি—'

'হ্যাঁ চতুর্ভুজেরা সর্বদাই এরকম হয়।' প্রশান্ত হাসলো, 'আপনি আসুন না, কী আর এমন ক্ষতি হবে একটা রাত এদিক-ওদিক হ'লে।'

টিকিট কাটা আছে কাশী পর্যন্ত।'

'কয়েকটা টাকা না হয় গেলই—' পূর্ণেন্দু কাজকর্ম সেরে স্যুটকেস বিছানা টেনে কপালের ঘাম ঝেড়ে ব'সে একেবারে সনির্বন্ধ হ'লো, 'সত্যি চলুন।'

সমীর রায় তার বেশভূষা ঠিক করছিলো। পাঞ্জাবিটা দু'হাতের চেটোতে আরেকটু পালিশ করলো, ময়লা রুমাল দিয়ে জুতোটা ঘষলো, কোঁচাটা ঝাড়া দিলো ফট-ফট শব্দে, তারপর বরুণের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে বললো, 'চুপ ক'রে রয়েছো কেন? কিছু বলো?'

'কী বলবো?'

'তোমার বিয়ে আর নিমন্ত্রণ করবো আমরা?'

'তোমাদেরই তো গরজ। কাজেই ওটাও তোমাদের।'

ভদ্রলোক হাসলেন, সেটা ঠিক। গরজটা এই মুহূর্তে আমারও মন্দ হচ্ছে না, কিন্তু তার আগে আমাদের পরস্পরের নাম ধামগুলো জেনে নেওয়া ভালো। আজ সঙ্গী না হ'তে পারলেও কলকাতা গিয়ে যাতে মহিলাটিকে দেখতে পাই, আর আপনাদের সঙ্গও—'

'নিশ্চয়ই।' প্রশান্ত পকেট থেকে নোট বুক বার ক'রে সকলের নাম-ধাম আর ঠিকানা লেখায় নিবিষ্ট হ'লো।

দেখতে-দেখতে ট্রেন থামলো এসে স্টেশনে। ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো সব, বরুণ সহসা ভারি গরম বোধ করলো, অস্থির হ'য়ে উঠলো। আবার আষাঢ়ের মেঘ নামলো তার মুখে। এতক্ষণে গল্পে-গল্পে মনের বিরক্তি যতটুকু বা হালকা হয়েছিলো, তা আবার চারগুণ হ'য়ে থমথম করলো সারা চেহারায়। ভদ্রলোক তাঁর শুভেচ্ছা জানিয়ে একটু চাপ দিলেন হাতে, তারপর তাঁকে নিয়ে দৈত্যের মতো বেরিয়ে গেলো ট্রেন।

ছোট্ট স্টেশন। নান্দীগ্রাম নাম। একেবারে গণ্ডগ্রাম। দেখা গেলো প্রিয়রঞ্জনবাবু দারুণ সমারোহে জামাই নিতে এসেছেন। আলোর মিছিল দাঁড়িয়ে আছে সমস্ত স্টেশনটুকু জুড়ে, বাজনা এনেছেন দু'রকম। ব্যাণ্ড আর ঢাক-ঢোল। ফুলের মালার ছড়াছড়ি। বোধহয় সারাগ্রামের লোক ভেঙে পড়েছে সেখানে। এইসব দেখে বরুণের কুঞ্চিত ভুরু আরো দু'ভাঁজ কুঁচকোলো। লোকগুলোকে তার এক-একটি আস্ত বর্বর ব'লে মনে হ'লো কী অসহ্য গেঁয়ো। আর নিজেকে মনে হ'লো পুরোদস্তুর একটি সং। ছি ছি।

কানের কাছে পূর্ণেন্দু ফিসফিস করলো, 'ও-রকম ক'রে আছো কেন? বিশ্রী দেখাচ্ছে।'

প্রশান্ত পিঠের উপর আস্তে হাত রেখে হাসলো শুধু। সমীর তার কাপড়-চোপড় ফিটফাট করতে করতে বললো, 'ও-রকম হয় কিন্তু পরে ব্যাপারটা বেশ রোমাণ্টিক।' বরুণ জবাব দিলো না।

বিয়ে-বাড়িতেও দেখা গেলো স্টেশনের চেয়েও বেশি ভিড়। হৈ-হল্লা লোকজন, ঠাকুর-চাকর, গ্যাসঝাড়—এক এলাহি কাণ্ড। জামাই এলো তো ঝমঝম ক'রে বেজে উঠলো বিলিতি বাজনা, তাদের সব সাদা পোশাক, লাল পটি, জরির পাগড়ি। বরণ করতে ছুটে এলেন প্রায় পঞ্চাশ জন মহিলা, দেখতে এলো বুঝি এক-পৃথিবী মানুষ। বরুণ চারিদিক তাকিয়ে বোধ করি বন্ধুদের খুঁজলো, তারপর নিজেকে ভাসিয়ে দিলো এই স্রোতের আবর্তে। যা হয় হোক।

রাত সাড়ে-আটটার সময় লগ্ন ছিলো, বিয়ে হ'য়ে গেলো। আচার-অনুষ্ঠান সারতে-

সারতে প্রায় একটা বাজলো। প্রিয়রঞ্জনবাবু বললেন, 'ব্যস। আর না। একবার ঘর ফাঁকা ক'রে দাও, ওরা ঘুমোক। নইলে শরীর খারাপ হবে।'

তিনি রাশভারি মানুষ। সকলেই ভয় পায় তাঁকে। দু'একজন রসিক মহিলা বাসর জাগাবার তালে ছিলেন, ক্ষুণ্ন মনে উঠে দাঁড়ালেন। ফিসফিস ক'রে নিন্দেও করলেন একটু। তারপর সব ঠাণ্ডা।

এতক্ষণের একটানা একটা দুরন্ত কলরোলের পরে সহসা নিঝুম হ'য়ে গেলো ঘরটি। বরুণ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। খাটের উপরকার যুগলশয্যায় গা এগিয়ে প্রথমেই সিগারেট ধরালো একটি।

বাতাসে অদ্ভুত সুগন্ধ। ঘরের পরিবেশে এক নাম-না-জানা অনুভূতি। যার সঙ্গে শুভদৃষ্টির সময়েও চোখেচোখি করেনি, কী ভেবে ঈষৎ কৌতূহলী চোখে তার দিকে তাকালো একবার। নতমুখে খাটের ঐ প্রান্তে ব'সে আছে স্থির হ'য়ে চন্দন-আঁকা জ্যোৎস্না-রং কপাল আর ঘন চুলের মাঝখানকার সরু সিঁথিটিই নজরে পড়লো শুধু।

'আপনি শুয়ে পড়ুন না।' আপরিচিত ভদ্রমহিলাটির সঙ্গে একটু ভদ্রতা করা কর্তব্য মনে করলো বরুণ।

মল্লিকার লাল বেনারসির জরিতে একটি ঝিলিক উঠলো শুধু।

'আমি না-হয় ঐ চেয়ারটায় গিয়ে বসি অসুবিধে হলে।

বরুণ আবার বললো, মেয়েটি জবাব দিলো না।

'আলোটা কি নিবিয়ে দেবো?'

তবু চুপ।

বরুণ ভুরু কুঁচকালো মনে-মনে। ভারি তো ইয়ে মেয়েটি। কোনো সৌজন্যবোধই নেই একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে। জবাবই দেয় না। যাক, আমার কর্তব্য তো আমি করেছি। আর কিসের দরকার।

কিন্তু একটু পরে :

'খুব গরম, না?'

চুপ।

বরুণ উঠে গিয়ে মল্লিকার ঠিক পিছন দিককার জানালাটা খুলে দিলো। ধোঁয়ার রিং শিকের ফাঁকে বার ক'রে দিতে-দিতে বললো, 'সিগারেট খাচ্ছি ব'লে অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'হচ্ছে।' পরিষ্কার স্পষ্ট গলা মল্লিকার।

'অ্যাঁ!' বরুণ এই অপ্রত্যাশিত হঠাৎ জবাবে কেমন একটু অপ্রস্তুতভাবে ফিরে দাঁড়ালো।

'কিন্তু সিগারেটের জন্য নয়।'

'তবে? আমার জন্যে?' বরুণ রীতিমতো চকিত।

'আপনাদের বাড়ি আমি অনেকদিন গিয়েছি, তখনো আপনাকে আমার ভালো লাগেনি। আর এখন তো—'

'ভালো লাগেনি?'

'না। আমি জানতাম না কী উদ্দেশ্যে আমাকে ঘন-ঘন নিয়ে যাওয়া হয় ওখানে, জানলে যেতাম না।'

'এ-সব আপনি—মানে আমি—'

'তারপর কারণটা যখন জানলাম রীতিমতো অপমানিত বোধ করেছিলাম।'

'অপমান?'

'আমি আমার অমতও জানিয়েছিলাম এদের, শোনেননি?'

'খুব ক্ষতি হয়েছে তাতে, না?'

'হয়নি? শুনলে আজ রাত্তিরের এই প্রহসন থেকে তো অন্তত রেহাই পাওয়া যেতো। আমার বাবা মা'র ধারণা বাংলা দেশে তো দূরে থাক, বুঝি বা ত্রিভুবনেই এ-রকম একখানা পাত্র মেলা ভার।'

'আর আপনার ধারণা?'

'পথে-ঘাটে ছড়ানো।'

বরুণের গরমবোধ বেড়ে গেলো। ঘন-ঘন সিগারেটে টান দিয়ে বললো, 'তাহ'লে কৃপা ক'রে এ-অযোগ্যের গলায় মালা দিলেন কেন?'

'উপায় কী?'

'কিন্তু উপায়হীন মেয়ে ব'লে তো মনে হচ্ছে না আপনাকে।'

'আপনাকেও তো খুব নিরুপায় পুরুষ বলে ভাবতে পারছি না।'

'আমার কথা তো আর উঠছে না।'

'কেন উঠবে না? দয়া ক'রে মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা না হ'লেই তো সব গোল চুকে যেতো।'

সিগারেটের লাল গোল আগুন-টিপটির দিকে তাকালো বরুণ, 'ও' সবই শোনা হয়েছে?'

'আশা করি তথ্যটা ভুল বলিনি।'

'স্বরচিত তথ্য নাকি?'

'রচনা যারই হোক, অস্বীকার করবেন না নিশ্চয়ই।'

'ধরে নিন-না করছি।'

'এই কপট বিনয়ের জন্যে ধন্যবাদ।'

'আপনাকেও ধন্যবাদ।'

'আমাকে আর ধন্যবাদ জানাবার কী আছে?'

'আপনার অকপট সত্যভাষণ।'

'মানে?'

'মানে, এই আমাকে যে পছন্দ হয়নি সে-কথাটি—'

'ও।'

'তা কী আর করবেন।'

মল্লিকা এবার চুপ।

'কিছু বলছেন না কেন?'

'কী বলবো?'

'দুর্ভাগ্যক্রমে এই অভাজনটির সঙ্গে যখন একটা রাত কাটাতেই হচ্ছে তখন একটু না-হয়—'

'এবার ঘুমোন।' মল্লিকা খাট থেকে নেমে মেঝেতে পাতা নতুন পাটির উপর গুটিয়ে শুলো। 'মনে করুন ওয়েটিংরুম। একটা রাত কেটেই যাবে।'

আর তারপর?'

'তারপর সকাল হ'তে-হ'তে একটা ব্যবস্থা হবেই।'

'কিন্তু একটা কৌতূহল চরিতার্থ করবেন?'

'বলুন।'

'আমার মতো মানুষ তো পথে-ঘাটে ছড়ানো, কিন্তু আপনার যোগ্যতরের নামটি কী?'

'কী দরকার জেনে?'

'চোখ দুটি সার্থক করা যেত?'

'আহা! যা চোখ!'

'চোখের খুব দুর্নাম নেই আমার।'

'আমি তো সুনামের কিছু দেখিনি।'

'ক'দিন দেখেছেন আমাকে?'

'মন্দ কী। তিন বছর তো?'

'তিন বছর?'

'রোজ! দু'বেলা।'

'রোজ? দু'বেলা?'

'কলেজ থেকে তো আমাদের বারান্দার তলা দিয়েই আপনার ফেরবার পথ।'

'সেই আশায় ব'সে থাকতেন বুঝি?'

'ঈশ্!'

'তবে?'

'তবে আর কিচ্ছু না।' মল্লিকা পাশ ফিরলো।

কয়েক মুহূর্তের অখণ্ড বিরতি।

গ্রামের রাত। বাইরে অশ্রান্ত ঝিঁঝির ডাক। রাত ঘন হ'য়ে উঠলো। প্রথম রাত্তিরের আধখানা চাঁদ ডুবে গিয়ে অন্ধকার গাঢ় হ'লো। আর উত্তর দিকের জানালা দিয়ে বড় গাব গাছটার ছায়া ভুতুড়ে হ'লো।

'আপনাদের এখানে চোর আছে?'

'অ্যাঁ?' এটা মল্লিকার ভয়ার্ত জবাব!

'দেওয়ালে একটা ছায়া পড়েছে না?'

'অ্যাঁ?'

'কী রকম শব্দ হচ্ছে একটা?'

'না কী?'

'বোধহয় বাতাস। কী বলেন?'

'বাতাস!'

'যাক গে, ঘুমোন।' এবার বরুণ পাশ ফিরলো।

আবার চুপচাপ।

একঝাঁক পাখি ডানা ঝাপটালো। গাব গাছে বোধ হয় শকুনে বাচ্চা পেড়েছে, কঁকিয়ে কেঁদে উঠলো তারা।

'শুনছেন?' এটা মল্লিকার গলা।

'উঁ।' বরুণের জবাব।

'ঘুমুলেন?'

'হুঁ।'

'কেন?'

'ঘুম পায় না?'

'কিন্তু—কিন্তু—জানালাটা বন্ধ ক'রে দিন না।'

'কেন?'

'আমার ঠাণ্ডা লাগে।'

'সে কী! এই বৈশাখ মাসে আবার ঠাণ্ডা কী!'

'সে কী? আমার যে টনসিল।'

'তাতে কিছু হবে না।'

'হবে।'

'না।'

'আমি বলছি হবে।'

'আমি বলছি না।'

আবার চুপ।

একটা জোনাকি এলো ঘরে। টিপটিপ সবুজ আলো আর দিঘি-দিঘি ঘন অন্ধকার। জোর ক'রে বুজে-থাকা চোখের তলায় লাল নীল সবুজ হলদে। রোগা মোটা ঢ্যাঙা বেঁটে। আরশোলা টিকটিকি গিরগিটি সাপ। আর চোর ডাকাত ভূত প্রেত। দূরে কোথায় হরিধ্বনি ভাসলো বাতাসে।

'এই।' এবার ফিসফিস। প্রায় বরুণের কান ছুঁয়ে।

'কী?' বরুণের নরম গলা অন্ধকারে মল্লিকার হাত ছুঁয়ে।

'আমি সারারাত মাটিতে শুয়ে থাকবো নাকি?'

'আমি সারারাত না-ঘুমিয়ে পাহারা দেবো নাকি?'

'তবে?'

'ওয়েটিংরুম ছেড়ে এবার ট্রেনে উঠে এলেই হয়।'

'কী?'

'ধরা যাক না, এই খাটখানা আমাদের ট্রেনের কামরা, আর আপনি আর আমি—এসো।'

'ধ্যেৎ।'

এর পরে কিছুক্ষণ চুড়ি-বালার টুংটাং, বেনারসির খসখস, পৃথিবীর স্বর্গ, বসন্তের সোনা, চোদ্দ অক্ষর পয়ারের ঠাসবুনোন কবিতা। বোঝা গেলো সহযাত্রী হিসেবে জীবনে বরুণ কিছু মন্দ লোক নয়, আর মল্লিকা তো মল্লিকা ফুলই। তার তুল্য আর কী আছে জগতে?